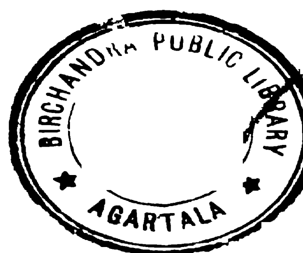
প্রতীক্ষা

সুশীল আচার্য



মেঘদূতম্ ॥ ১০৩, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

॥ প্রকাশক
রবীন্দ্রনাথ সিংহ
মেঘদূতম্
১০৩, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৯

॥ প্রথম প্রকাশ ॥
॥ জ্যৈষ্ঠ ১৩৫০ ॥

॥ প্রচ্ছদ-শিল্পী ॥
অর্ধেন্দু রায়

॥ গ্রন্থন ॥
ওরিয়েন্টাল বাইণ্ডার্স

॥ মুদ্রক ॥
নিতাই চরন মণ্ডল
ভারতশ্রী প্রেস
৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট্
কলিকাতা-৬

॥ চার টাকা মাত্র ॥

॥ উৎসর্গ ॥

মা ও বাবাকে

প্রতীক্ষা

সুখ-দুঃখ আর নানা বৈচিত্র্যের মধ্যে আমাদের জীবন। সেই সুখ-দুঃখের প্রতিচ্ছবি ফোটাবার প্রয়াস পেয়েছি এই উপন্যাসে। সার্থকতার মূল্যায়ন করবেন দরদী পাঠক।

আমার সবকিছু সাফল্য পরম পূজনীয় প্রখ্যাত সাহিত্যিক তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিশ্ব-বরেন্য চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায়-এর আশীর্বাদে। তাঁদের কাছে আমি চিরঋণী।, অন্যদিকে যাঁদের আশীষবাণী ও সহানুভূতি আমাকে প্রেরণা দিয়েছে তাঁরা হলেন পূজনীয়া শিপ্রা চৌধুরী ও শীলা চৌধুরী এবং বন্ধুবর রমণী কর্ম্মকার। আর সব দিক থেকে এই বই-এর সবকিছুর মূলে যিনি তিনি শ্রদ্ধেয় রবীন্দ্রনাথ সিংহ। তাঁকে কালির আঁচড়ে কৃতজ্ঞতা জানালে তাঁর মহত্বকে ছোট করা হবে।

মুদ্রণ বিষয়ে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা সত্বেও কিছু কিছু ভুল থেকে গেছে, আশাকরি অনিচ্ছাকৃত এই ভুলের ক্ষমা রসজ্ঞ পাঠকের কাছে নিশ্চয়ই পাব। এই উপন্যাসের সব কয়টি চরিত্র কাল্পনিক। কিন্তু তবুও যদি কেউ নিজের রূপ খুঁজে পান তা হলে তা নেহাৎ কাকতালীয়।

সুশীল আচার্য

PRATIKSHA.

(A Bengali Novel)

By SUSHIL ACHARYA

ভবানীপুর অঞ্চলের এই পীচ্ ঢালা কালো ফিতের মত মসৃণ রাস্তাটা যেখানে হঠাৎ বেঁকে ডান দিকে চলে গেছে ঠিক সেখানে বহু বছরের পুরানো স্মৃতি বারবার স্মরণ করে আপন গর্বে উদ্ধত এবং সদ্য-উঠা হাল-ফ্যাসানের নতুন নতুন বাড়ীগুলোর দিকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তাকিয়ে নিজের কৌলিন্য প্রচার করছে যে বাড়ীটি—যার অত্যন্ত কাছে গিয়ে অনেক সাধ্য-সাধনা করে রং-উঠা সাদা মার্বেল পাথরটায় নাম পড়া যায় 'নিখিল প্রাসাদ'—তারই নানা স্তরে বিভিন্ন জাতির লোক বাঁচবার আর বেঁচে থাকবার তাগাদায় মাথা গুঁজবার আশ্রয় নিয়েছে। হঠাৎ দেখলে মনে হয় বুঝিবা কোন সর্বভারতীয় প্রদর্শনীতে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকেরা তাদের প্রতিনিধি পাঠিয়েছে আপন সমাজ ও জাতির বৈশিষ্ট্য প্রচারকল্পে। অবশ্য বাঙালী পরিবারই বেশী কিন্তু তবুও সর্বভারতীয় সম্মেলনের একটি চমৎকার নমুনা এই বাড়ীটা। বারান্দার রেলিং-এ বাঙালী মেয়ের তাঁতের শাড়ীর কাছেই পাঞ্জাবী নারীর ওড়না-সালোয়ার বা অসমীয়া রমণীর মেখলা শুকায় সেই একই রৌদ্রে—কোথাও বাধে না কোন বিরোধ, নেই কোন প্রাদেশিকতার মূর্খ দম্ভ। পাড়ার লোকে তাই এ বাড়ীর নামকরণ করেছে 'বিশ্বদর্শন'! কথাটা বেশ একটু বাড়াবাড়িই। কিন্তু শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের এমন চমকপ্রদ নমুনা আর একটা খুঁজে পাওয়া মুস্কিল। অবশ্য বাসিন্দারা সকলেই নিজের নিজের কাজ নিয়েই ব্যস্ত, আর সেই কাজের তাগিদে

অন্যের খোঁজ-খবর নেবার চেষ্টাও কেউ তেমন করে না। বোধ হয় সেজন্যই বিরোধ বাধবার সুযোগ হয় না। ভাষার বিভিন্নতায় বাড়ীর গিন্নিরা পাশের লোকজনের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে পারেন না, আর কর্তারা কখন-সখন সিঁড়ির মুখে অপর কোন কর্তাকে দেখলে 'হাউ আর ইউ,' বলেই নিশ্চেষ্ট হন।

দীনেশবাবু এই বাড়ীরই এক বাসিন্দা। হাইকোর্টে প্র্যাকটিশ্ করেন। পুরা দোতলাটায় নিজের আধিপত্য বজায় রাখতে মাসের মোট উপার্জনের প্রায় অর্দ্ধেক টাকা দিতে হয় বাড়ীওয়ালাকে। এত টাকা বাড়ীভাড়া দিয়ে দীনেশবাবুর মনটা বেশ মুষড়ে পড়তো। সপ্তাহে একটা দিন তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করার ও গল্প করার জন্য নির্দিষ্ট। প্রতি রবিবার নিজের বাড়ীতে বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করে কাটান। এই রবিবার তাঁর অনেকদিনের বিশিষ্ট বন্ধু অমলেশ বাবু এসেছেন। তাঁরা ছোটবেলায় একসঙ্গে পড়াশুনা করেছেন, একসঙ্গে খেলা করেছেন। সেই গল্পে দুজনেই মশগুল। টাকার অভাবে অমলেশবাবু পড়া ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন। বহু চেষ্টায় মাত্র পঞ্চাশ টাকা মাইনেতে এক চাকরী পেয়েছিলেন। তারপর বহু কষ্টে, বহু দুঃখে দিন কাটিয়ে আজ তাঁর মাইনে হয়েছে তিনশো টাকা। পৈত্রিকসূত্রে পাওয়া একটা জীর্ণ বাড়ী তাঁকে আশ্রয় দেবার জন্য কোনরকমে দাঁড়িয়ে আছে। তাই বর্তমানে মোটামুটি স্বচ্ছন্দভাবেই তিন চারটে ছেলেমেয়ে নিয়ে সংসার করছেন। অনেকদিন পর দেখা হওয়াতে দেশজোড়া সুখদুঃখের আলোচনা চলছিল।

দীনেশবাবু বললেন—দেখ অমলেশ, এই বাজারে তোমার একটা নিজস্ব বাড়ী আছে, কিন্তু এই শহরের অর্দ্ধেকের বেশী লোকের তা নেই। এ বাজারে যাদের অল্প আয়, তারা পেটে খাবে, না বাড়ীভাড়া দেবে বলতো? তাই খেয়ে-না-খেয়ে কোন রকমে বাড়ীভাড়া দিতে হচ্ছে। আমাদের সব ভরসা পরের হাতে। কিন্তু ভাই

মক্কেল দিন দিন সে ভাবে কমছে, আর খরচ যে ভাবে বেড়ে চলেছে তাতে মানসম্মান নিয়ে আর বাস করতে হবে না।

অমলেশবাবু উত্তর দিলেন—তা ঠিকই ভাই। আমার ঐ ভাঙা বাড়ীটুকু না থাকলে কি যে করতাম! এই বাজারে তুমি খরচ কমাতে চেষ্টা কর দীনেশ। শুধু শুধু একটা তলা তোমার একা রাখার কোন প্রয়োজন নেই। লোক তো তোমরা দুজন, আর ছেলে সুখেন। তার জন্য তোমাব এতঘব রাখবার প্রয়োজন কি?

দীনেশবাবু আক্ষেপের স্বরে বললেন—আর ভাই সাধে কি এতগুলো টাকা নষ্ট করি? আজকাল লোকে আর বিদ্যাবুদ্ধি বিচার কবে না। বিচাব করে কার ব্যাঙ্ক-ব্যালান্স কত, বাড়ীটা কত বড়, আব কটা গাড়ী আছে এই দিয়ে। মানুষের মানদণ্ড দিয়ে মানুষকে বিচার করার দিন আর নেই—আমরা সবাই তা ভুলে গেছি বা ভুলবার চেষ্টা কবছি। আজ আমরা সকলেই সভ্যতার গর্ব করি আব লোককে নিজের ঐশ্বর্য দেখাবার চেষ্টা কবি। চাকরীব বাজারে যেমন ডিগ্রীর আদর, তেমনি কদর ব্যাঙ্ক-ব্যালান্স, প্রাসাদতুল্য বাড়ী আর দামী গাড়ী এই সমাজজীবনে। আমরা সকলেই ভ্রষ্ট, আদর্শচ্যুত।

অমলেশবাবু একটু চুপ করে থেকে বললেন—সত্যি তাই। আচ্ছা, তোমার জানাশোনা একজন কাউকে দু' একখানা ঘর ভাড়া দিলে হয় না? তাহলে খরচ কিছুটা কমে, আর বাড়ীটাও না ছেড়ে থাকতে পার, নয় কি?

দীনেশবাবু বললেন—তেমন লোক কোথায় পাব বল? তাছাড়া ভাড়া দিলেই ঠিকমত ভাড়া পাওয়া যাবে এমন কোন মানে নেই। আর তুমি জান, আমি কসাইয়ের মত টাকা আদায় করতে পারব না। সেদিন একটা ঘটনা আমাদের চোখের সামনে ঘটে গেল।

অমলেশবাবু কৌতূহল দমন করতে পারলেন না। তাড়াতাড়ি বললেন—কি রকম?

দীনেশবাবু বললেন—আমাদের এই বাড়ীর তেতলায় একজন

বাঙালী ভদ্রলোক থাকতেন। বছর চারেক ছিলেন এই বাড়ীতে ভদ্রলোক একটা ভাল কলেজেরই প্রফেসর ছিলেন। বাড়ীতে তিন চারটে ছেলেমেয়ে। ভদ্রলোক হঠাৎ অসুখে পড়ে প্রায় পাঁচ-ছয় মাস শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন। তাই চার-পাঁচ মাসের বাড়ীভাড়া বাকী পড়ে ˙গেল। বাড়ীওয়ালা নোটিশ দিয়ে হঠাৎ একদিন এসে তাঁর সব জিনিসপত্র বার কবে দিচ্ছিলেন। তখন অসুস্থ শরীরে সেই অধ্যাপক যেই উঠতে গেলেন অমনি মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন। চীৎকার শুনে ছুটে গেলাম। তাড়াতাড়ি ডাক্তার ডেকে আনলাম কিন্তু তাঁর জ্ঞান আর ফিরলো না। দু-তিন দিন পর মারা গেলেন।

অমলেশবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—তারপর ?

দীনেশবাবু বললেন—কি আর হবে ? আমরা কিছু টাকা দিয়ে তাঁর স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের দেশে পাঠাবার ব্যবস্থা করে দিলাম।

এমন সময় সুখেন এসে বললো—'বাবা, বেলা হয়েছে, তাই মা কাকুকে আজ এখানে খেতে বললেন।' বলেই সুখেন অমলেশবাবুর হাত ধরে বললো—কাকু, আজ আমাদের বাড়ীতে খাবেন, না করতে পাবেন না।

সুখেনকে অমলেশবাবু খুবই ভালবাসেন। সুন্দর ফুটফুটে ছেলেটিকে দেখলেই ভালবাসতে হয়, আর তার ব্যবহারে মুগ্ধ না হয়ে উপায় নেই। সুখেনকে আদর করে কাছে টেনে নিয়ে অমলেশবাবু বললেন—এখানে আসবার কথা যে বাড়ীতে বলে আসিনি। ফিরতে দেরী হলে সবাই ভাববে—আমি আর একদিন খেয়ে যাব, কেমন ?

যাবার জন্য উঠে দাঁড়িয়ে দীনেশবাবুকে অমলেশবাবু বললেন—আমার জানাশোনা একজন ভালো লোক আছেন। স্বামী-স্ত্রী, আর সুখেনের বয়সী একটি মেয়ে। ছোট্ট পরিবার, সুতরাং তোমার কোন অসুবিধে হবে না, আর লোকও ভাল তাঁরা। তুমি রাজী থাকলে তাঁকে নিয়ে আসব।

দীনেশবাবু বললেন—আচ্ছা, ভেবে দেখি। কয়েকদিন পর তোমায় জানাব।

অমলেশবাবু বললেন—আমি তাঁকে সঙ্গে করে একদিন নিয়ে আসব। তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলে যদি ভাল লাগে তাহলে ভাড়া দিও।

দীনেশবাবু তাঁর কথায় নীরব সম্মতি জানালেন।

অমলেশবাবু চলে যাবার পর দীনেশবাবুর স্ত্রী নমিতাদেবী ঘরে ঢুকে বললেন—অমলেশবাবু এখন খেয়ে যেতে রাজী হবেন না জানতাম। সত্যি উনি আমাদের থেকে বেশী সুখী। শান্তির সংসার আর নিজের বাড়ীতে থাকলে সকলেই খুসী হয়। আমাদের একটা ভাঙা বাড়ীও যদি থাকত তা হলে আমি তৃপ্তি পেতাম। ভাড়া বাড়ীতে কেমন যেন পর পর মনে হয় সব সময়।

দীনেশবাবু উত্তর দিলেন—শুধু শুধু আক্ষেপ করে কি করবে বল? আর আমাদের বাড়ী থাকলে এতবড় প্রাসাদতুল্য বাড়ীতে তো বাস করা যেত না। সুতরাং আক্ষেপ না করে একটু অপেক্ষা করে থাক।

॥ ২ ॥

সেদিন দীনেশবাবু সবে কোর্ট থেকে ফিরে পোষাক ছেড়ে বাইরের ঘরে বসেছেন এমন সময় অমলেশবাবু এক ভদ্রলোককে নিয়ে এলেন।

অমলেশবাবু বললেন—তোমাকে যে ভদ্রলোকের কথা বলেছিলাম ইনিই সেই শৈলেশবাবু।

দীনেশবাবু তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে উঠে ভদ্রলোককে নমস্কার করে বললেন—বসুন শৈলেশবাবু। দেখুন দোতলার সবটাই আমি ভাড়া নিয়েছি। কিন্তু শুধু শুধু কয়েকটি ঘর পড়ে আছে, ব্যবহার করা হয় না। তাই আমি কাউকে ঐ ঘরগুলি ভাড়া দেব মনে করেছি। কিন্তু সাব-লেট্ করতে বাড়ীওয়ালা দেবে বলে মনে হয় না। আমাদের এ ব্যবস্থা মৌখিক থাকবে, কোন রসিদ আমি দিতে পারব না। তবে আশা করি আপনি এতে অসম্মত হবেন না। অমলেশ নিজে যখন আপনাকে নিয়ে এসেছে এবং আপনাকে ভাড়া দেবার জন্য বলছে, তখন আমি আপনাকেই ভাড়া দেব।

শৈলেশবাবু বললেন—না, না, রসিদ দরকার নেই। আর তা' ছাড়া একসঙ্গে যখন থাকতে হবে তখন কি আর পর বলে মনে হবে?

দীনেশবাবু এ কথা শুনে খুব খুসী হয়ে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে আনন্দে বলে উঠলেন—চমৎকার বলেছেন আপনি। সত্যি ভাড়া আছেন বলে কিছু মনে না করে যদি নিজের মত মনে করেন তবে আমি খুবই খুসী হব। আমাকে বন্ধু বলে মনে করবেন।

অমলেশবাবু বললেন—নিশ্চয়ই। এক বাড়ীতে থেকে কি আর পর বলে মনে করা যায় ? দু'জনেই যখন রাজী তখন ভাড়াটা ঠিক করে ফেল।

দীনেশবাবু বললেন—ভাড়া পঞ্চাশ টাকা ঠিক করেছি। আপনি রাজী আছেন তো শৈলেশবাবু ?

শৈলেশবাবু বললেন—হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমার কোন আপত্তি নেই।

তারপর অনেক কথাবার্তার পর ঠিক হ'ল এই সপ্তাহেই তাঁরা এখানে আসবেন।

অমলেশবাবুরা বিদায় নেবার পর দীনেশবাবুর স্ত্রী ঘরে প্রবেশ করে বললেন—এই সপ্তাহেই ওঁরা আসবেন বুঝি ? আমার মনে হয় ভদ্রলোক বেশ ভাল।

দীনেশবাবু সায় দিয়ে বললেন—হ্যাঁ, ভদ্রলোককে আমার খুব ভাল লাগল।

কয়েকদিনের মধ্যে শৈলেশবাবু সপরিবারে এখানে চলে এলেন। দু'দিনের মধ্যে এই দুই পরিবারে বন্ধুত্ব গড়ে উঠল। শৈলেশবাবুর স্ত্রী কুমুদ অত্যন্ত নিরীহ প্রকৃতির। শান্তস্বভাবা, শাসন-সঙ্কুচিতা পল্লীবধূ, শ্বশুরবাড়ীর বয়োজ্যেষ্ঠদের অকারণ উৎপীড়নের আবেষ্টন হতে সদ্যমুক্ত এই মেয়েটি নমিতাদেবীর স্নিগ্ধ স্নেহের উৎসে স্নান করে একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। যে শিক্ষায় কুমুদ এতটা বয়স কাটিয়েছে সে অভিজ্ঞতায় সে জানে—মানুষ এক সংসারে একই পরিবারে বাস করে অতি নিকট-সম্পর্কে আবদ্ধ থাকলেও তুচ্ছ স্বার্থ নিয়ে সংগ্রাম করতে এতটুকুও কুণ্ঠাবোধ করে না—স্বার্থের খাতিরে অতি নগণ্য আচরণ করতে, অতি নির্লজ্জ আক্রমণ করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে না। কিন্তু এখানে এসে কুমুদ তার সেই সীমাবদ্ধ শিক্ষায় নমিতাদেবীর আচরণ দেখে মুগ্ধ হয়ে পড়ল। নমিতাদেবীর অসীম মমতার নিঃস্বার্থ বিতরণে সে বুঝল তার এতদিনের শিক্ষা ভুল। সে শ্রদ্ধায় ভক্তিতে মনে মনে নমিতাদেবীর চরণে প্রণাম জানিয়ে নিজেও তাঁর মত মহীয়সী হয়ে উঠবার জন্য দীক্ষা নিল। তাঁদের একমাত্র মেয়ে কল্পনা যেন সদ্য ফোটা একগুচ্ছ রজনীগন্ধা।

ক'দিনের মধ্যেই কল্পনা নমিতা দেবীর নয়নের মণি হয়ে উঠল। কুমুদ কল্পনাকে অসঙ্কোচে নমিতা দেবীর হাতে ছেড়ে দিল। সে বুঝেছিল এমন মনের প্রভাবে কন্যাকে গড়ে তুলতে পারলে কল্পনার জীবন সার্থক হবে, সুন্দর হবে।

সেদিন অপরাহ্নে দীনেশবাবু আরামকেদারায় বসে বিশ্রাম করছিলেন, এমন সময় নমিতা দেবী এক পেয়ালা চা নিয়ে তাঁর কাছে এলেন। তিনি আসতেই দীনেশবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—কি ব্যাপার! আজ সুখেন, কল্পনা কাউকে দেখছি না যে?

নমিতা প্রসন্নমুখে উত্তর দিলেন—আজ তারা শৈলেশবাবুর সাথে মাঠে খেলা দেখতে গেছে। শৈলেশবাবু কল্পনাকে নিয়ে যেতে রাজী ছিলেন না। বললেন—মেয়েমানুষ আবার খেলা দেখবে কি?

সুখেনও ছাড়বার ছেলে নয়। সে বলে—তাকে নিয়ে যেতে হবে। মেয়েমানুষ বুঝি মানুষ নয়? তাই তাদের অর্ধেক জিনিস দেখতে নেই! দুষ্টু ছেলে বললে—আচ্ছা কাকু, মেয়েরা যদি অর্ধেক মানুষ হয় তাহলে তো তাদের অর্ধেক কাজ করতে নেই, তাই না? কিন্তু মেয়েমানুষ খুন করলে জজ তাকে অর্ধেক ফাঁসি দেন না কেন?

শৈলেশবাবু সুখেনের সঙ্গে কোনমতেই না পেরে শেষে বাধ্য হয়ে কল্পনাকেও সঙ্গে নিলেন।

দীনেশবাবু বললেন—তাহলে শৈলেশ আজ বড় জব্দ হয়েছে তো? সত্যি মেয়েটি বেশ শান্ত। কল্পনাকে সাথে পেয়ে সুখেন খুব খুসী হয়েছে। আগে একা একা ঘুরে বেড়াতো; সব ফাঁকা ফাঁকা লাগতো। এখন একটি খেলার সাথী পাওয়ায় সবসময় হাসিখুসী।

নমিতা বললেন—কল্পনাকে পেয়ে সুখেন ভারী মাতব্বর হয়ে গেছে। সারাদিন ভারিক্কী চালে এটা ওটা দেখাচ্ছে, যেন কত না পণ্ডিত!

কল্পনা যখন মাঝে মাঝে বলে—সুখেনদা, তুমি ভাই এত শিখলে কি করে?

তখন সে ভারিক্কী গলায় বলে—ওরে ওসব বুদ্ধির কাজ, সবাই কি পারে?

আড়াল থেকে আমি আর কুমুদ হেসে বাঁচিনে। যাই বল, ওরা আসার পর থেকে হেসে আর কথা বলে দিনগুলো বেশ কাটছে। ওরা আবার এখান থেকে বাড়ী যাবে একথা ভাবতেও ভয় লাগে। কুমুদ তো বলে নেহাৎ দরকার না হলে ওরা বাড়ী যাবে না। হাজার হলেও ওদের দেশ আছে, চিরদিন কি এখানে থাকবে ?

দীনেশবাবু বললেন—ভবিষ্যতের ভাবনা তখন ভেবো। এত আগে থেকে ভাবনার কোন সার্থকতা দেখি না। তোমরা মেয়েমানুষ যে কি রকম সব আজেবাজে ভাবনা ভাব—যতসব আবোল-তাবোল চিন্তা। আর ওরা যদি যায়ই কল্পনাকে কেড়ে রাখব। যদি জোর করে নিয়ে যেতে চায় মামলা ঠুকে দেব। ব্যস্, তাহলে হয় কল্পনাকে রেখে যেতে হবে, না হয় ওদেরও যাওয়া হবে না।

নমিতা বললেন—ওরা দুজনেই এত ভাল লোক যে ওদের পর মনে করতে লজ্জা লাগে। মাস মাস ভাড়া দিয়ে আছে এটা আমার মোটেই ভাল লাগে না। আমার মনে হয় ওদের ভাড়া দিতে বেশ কষ্ট হচ্ছে। শৈলেশবাবু সামান্য বেতনের কেরানী, মাসে পঞ্চাশ টাকা বাড়ীভাড়া দিয়ে ওদের কি বা থাকে ?

দীনেশবাবু বললেন—তা আমি জানি নমিতা। কিন্তু ভাড়া না নিলে ওদের ছোট করা হয়। সব সময় ভাববে আমরা দয়ার উপর আছি। তাতে সর্বদা নিজেকে খুব হেয় মনে হবে। অন্যের মুখের দিকে তাকিয়ে কোন মানুষ নিজেকে উদারভাবে চিন্তা করতে পারে না নমিতা। আর সত্যি কথাটা কি জানো—ওরা আসার পর থেকে আমার রোজগারও বেড়ে গেছে। তাই ভাবছি ভাড়া হিসাবে যে টাকাটা শৈলেশ দেবে আমি তার থেকে কিছু টাকা কল্পনার নামে পোস্ট অফিসে জমা রেখে দেব। শৈলেশ যা রোজগার করে তাতে টাকা জমানো তার পক্ষে সম্ভব নয়, সুতরাং এ টাকাটা জমা থাকলে অসময়ে কাজে লাগবে।

নমিতা খুবই খুশী হয়ে বললেন—তা হলে খুব ভাল হয়! আহা, ওরা ভাল-মন্দ না খেয়ে ভাড়ার টাকা জোগাচ্ছে, কত কষ্ট করে

সংসার চালায়। এভাবে কিছু টাকা জমাতে পারলে পরে ওদের বেশ কাজে লাগবে।

দীনেশবাবু কি একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিলেন এমন সময় সুখেনের গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। সে বলছে—জানো কাকীমা, কল্পনাটা কোন কাজের নয়। এত লোক দেখে আর ভয়ে বাঁচে না। কাঁদতে শুরু করল। এত করে নিয়ে গিয়ে শেষটায় মরি কাকুর বকুনি খেয়ে।

কল্পনারা আসার পর নিরবচ্ছিন্নভাবে ছয় সাতটি বছর কেটে গেল। সেই দশ বছরের সুখেন আজ ষোড়শ বর্ষীয় কোমলকান্ত কিশোর। আর কল্পনা এখন পরিস্ফুট পদ্মকলির মত সঞ্চিত সৌন্দর্যের পূর্বভাসে মধুময়ী বালিকা। সুখেনের পিতা-মাতার স্নেহে সে ধনীর দুলালীর মতই শিক্ষা-দীক্ষায়, সৌন্দর্যে মনোহারিণী হয়ে উঠেছে।

বৈশাখের উত্তপ্ত বেলা। কল্পনা একটি ঘরের জানালার কাছে দাঁড়িয়ে জলভরা চোখে বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিল। মনের অভিব্যক্তির সমস্ত কিছু যেন চোখের দৃষ্টিতে প্রতিফলিত হচ্ছিল। এমন সময় সুখেনের গলার আওয়াজ কানে গেল। সুখেন ছুটতে ছুটতে এসে মাকে প্রণাম করে বললো—মা, আমি ইউনির্ভাসিটিতে প্রথম হয়েছি।

নমিতাদেবী সাদরে সুখেনকে জড়িয়ে ধরতেই সুখেন বললো—কাকীমাকে প্রণাম করে আসি মা। বলেই ছুটে চলে গেল কুমুদ দেবীর কাছে। তাঁকে প্রণাম করেই বললো—কল্পনা কোথায় কাকীমা? কিন্তু উত্তরের অপেক্ষা না করে নিজেই খুঁজে বেড়াতে লাগল।

আনন্দের খবরটা দেবার জন্য খুঁজতে গিয়ে দেখল কল্পনা জানালার কাছে বসে কাঁদছে।

সুখেনের মনটা কেমন যেন দমে গেল। স্বতঃস্ফুর্ত আনন্দের মাঝে কে যেন বিরাট পূর্ণচ্ছেদ টেনে দিল। তারপর একটু আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করল—তুই কাঁদছিস কল্পনা? শোন, শোন, তোকে এমন একটা খবর দেব যে কান্নাটান্না কোথায় পালাবে। বুঝলি,

আমি ইউনির্ভাসিটিতে প্রথম হয়েছি। মাস মাস কত টাকা পাব, কত পুরস্কার পাব। তোকে কত জিনিস কিনে দেব।

কল্পনার জলভরা চোখে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। আনন্দে আত্মহারা হয়ে বলে উঠল—তুমি প্রথম হয়েছ সুখেনদা—তুমি প্রথম হয়েছ ?

সুখেন বলে—হ্যাঁ, আমি প্রথম হয়েছি। কিন্তু তুই এমন করে কাঁদছিলি কেন বলতো ?

কল্পনার চোখ মুখ যেন ভরা আষাঢ়ের মেঘের মত হয়ে উঠল। অস্ফুট গলায় বললো—আজ বাবার অফিসে জ্যেঠামশায় টেলিগ্রাম করেছেন আমার ঠাকুমা নাকি মর মর। আমাদের তাই আজই চলে যেতে হবে। তোমাদের ছেড়ে কেমন করে যাবো সুখেনদা ? তোমার এই আনন্দের দিনে আমার মন একটা অজানা বিচ্ছেদের বেদনায় ভরে উঠেছে। না জানি তোমাদের কত আঘাত দিয়ে গেলাম। তোমাদের এই অপূর্ব স্নেহের পাশে আবার কি ফিরে আসতে পারব ?

কথাটা শুনেই সুখেন দিশেহারা হয়ে বসে পড়ল। একটু পরেই বলে উঠল—'তোরা চলে যাবি ? আজ তোরা চলে যাচ্ছিস্ ? কিন্তু, কিন্তু তুই আর আসবি না, কোনদিন দেখা হবে না ?' আর কিছু বলতে পারল না, তার দুচোখ তখন জলে ভরে গিয়েছে।

এদিকে স্কুলের ছেলেরা, পা 'র লোকেরা এসে সারা বাড়ী ভরিয়ে তুলেছে। তাদের আনন্দের উচ্ছ্বাস যেন সারাবাড়ী আপ্লুত করে দিয়েছে। কিন্তু সব থেকে বেশী যার আনন্দ, যার কৃতিত্বে স্কুলে বন্ধুরা, পাড়ার প্রতিবেশীরা আনন্দিত সেই আজ বিষণ্ন। সবাই সুখেনকে খুঁজছে, কিন্তু সেদিকে তার খেয়াল নেই। তার সমস্ত আনন্দ যেন আজ মরুভূমির তপ্ত বালুচরে শুকিয়ে গিয়েছে। অভিমানের সুরে সুখেন কল্পনাকে বলল—উঃ, এমনি দিনে তোর ঠাকুমা মর মর !

এই দুই ভাই-বোনের অন্তর বেদনার করুণ রেশ যেন আকাশ বাতাস ভরিয়ে তুলেছে। সুখেন আবার বলল—না, না, তুই যেতে

পাবি না। কোনমতেই তোকে আমি যেতে দেব না। তুই গেলে আমি আর কোন দিন তোর সঙ্গে কথা বলব না। তা হলে এমন প্রতিশোধ নেব যা তুই কোনদিন ভুলতে পারবি না। আজ যদি আমার এতবড় আনন্দের দিনে তুই চলে যাস তাহলে আমিও একদিন অতিবড় প্রতিশোধ নেব—নিশ্চয়ই নেব।

কল্পনা কুণ্ঠিত স্বরে বলল—রাগ করছো কেন সুখেনদা? আমি বুঝি যেতে চাচ্ছি? বড়মা বাবাকে কত করে বললেন, কিন্তু বাবা কিছুতেই রাজী হলেন না। বললেন,—আমি এখানে থাকলে জ্যেঠামশায়, জ্যেঠিমা ভয়ানক রাগ করবেন। তা ছাড়া তাঁরা নাকি আমায় নিয়ে যাবার কথাও লিখেছেন।

সুখেন রাগ করে উঠল—বুঝেছি। ওখানে যাবার জন্য তুই অস্থির হয়ে উঠেছিস। বেশ যা তুই যেখানে খুসী—বলেই ছুটে চলে গেল নিজের ঘরে।

নমিতা দেবী যেন একেবারে পাথর হয়ে গেছেন। এই ক'বছর কল্পনাকে তিনি সুখেনের সঙ্গে একসাথে মানুষ করে তুলেছেন। তাঁর অন্তরের স্নেহ উজাড় করে তিনি কল্পনাকে বড় করে তুলেছেন। কোন দিন তাকে ছেড়ে থাকতে হবে এই ভেবেই তিনি আকুল হতেন। সে বিচ্ছেদ তিনি কোনমতেই সহ্য করতে পারবেন না ভেবে অস্থির হয়ে উঠতেন। কিন্তু আজ যখন সত্যি সত্যি কল্পনা চলে যাবে জানলেন, তখন একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেলেন। আজ যে তাঁর ছেলে সুখেন মস্তবড় আনন্দের সংবাদ নিয়ে এসেছে, তাকে তার এই গৌরবে আশীর্বাদ করা উচিত সে কথা তার মনেও পড়ল না। দীনেশবাবুও কল্পনারা চলে যাবে জেনে একেবারে মুষড়ে পড়লেন। স্নেহের মোহ এমনি যে, আনন্দের মাঝেও বিচ্ছেদের শোক-ছায়ায় দুঃখের ভাগই বেশী হয়ে দেখা দেয়।

সুখেন বিচ্ছেদে কাতর হয়ে নিজেই বিভ্রান্ত। সে কেমন করে অপরকে সান্ত্বনা দেবে? মাকে দেখে সুখেন বলে উঠল—মা, কল্পনা এখানে থাক। কাকু কাকীমা যান।

নমিতাদেবী বললেন—তাই কি হয় বাবা? ওকে নিয়ে যাবার জন্য ওর জ্যেঠামশায় লিখেছেন। তাই, ও না গেলে তিনি খুব রাগ করবেন। আমি কি করি বল?

সুখেন রেগে বলে উঠল—তাহলে তুমিও কল্পনাকে চলে যেতে বলছ? তুমি তাকে এখানে রাখতে চাও না?

নমিতাদেবী আকুল হয়ে বলে উঠলেন—তাই কি হয় সুখেন? আমি তাকে এখানে রাখতে চাই না? তুই বললি? কিন্তু কল্পনা এখানে থাকলে সব থেকে বেশী খুসী হব আমি, তা কি তুই জানিস না? কে ওকে এই ক'বছর মানুষ করেছে? কল্পনার অসুখে কে রাত জেগে সেবা করেছে? নিজের মেয়ের মত যাকে বুকে করে মানুষ করলাম তাকে যেতে দিতে চাই আমি? কিন্তু কি কবব, উপায় নেই, কোন উপায় নেই—বলেই সাশ্রুনয়নে কল্পনাকে একেবারে বুকের মধ্যে টেনে নিলেন। আদর করে বললেন—চল্ মা, তোর চুলটা বেঁধে দি গে। আব কোন দিন পাবো কিনা জানি না? গোপনে দু ফোঁটা তপ্ত জল কল্পনার মাথাব উপর পড়ল।

কল্পনা তাঁকে জড়িয়ে ধরে বললো—তুমি কেঁদ না বড়মা। আমি নিশ্চয়ই আবার ফিরে আসব। তোমাকে ছেড়ে আমি থাকতে পারব না।

যাবার সময় কুমুদ নমিতা দেবীকে প্রণাম কবে বললেন—চলি দিদি। আর যদি দেখা না হয় তবুও আপনাকে ভুলব না।

সেদিন রাত্রি নামার সাথে সাথে ওঁরা চলে গেলেন। নমিতাদেবীর মনে হল তাঁদের সব সুখ, সব আনন্দ যেন ওরা ছেঁকে নিয়ে চলে গেল। সাথীহীন সুখেন আজ ছয় সাত বছর ধরে অকস্মাৎ পাওয়া বোনকে অন্তরের অনাবিল ভ্রাতৃস্নেহের অবারিত ধারায় অভিষিক্ত করে দিয়েছিল। ছয় বছরের প্রতিটি দিন কল্পনার হাসি-কান্নায় ভরে ছিল তাদের ছোট সংসার। সুখেনের জীবনের গৌরবময় দিনটির সব আনন্দ বিচ্ছেদের নিঃশ্বাস দিয়ে উড়িয়ে দিল। সুখেনের প্রথম বেদনাতুর মন আপনার অন্তর দিয়ে মায়ের ব্যথা অনুভব করে ব্যাকুল হয়ে উঠল।

সে বার বার ভাবতে লাগল মাকে শান্ত করবার উপায় কি ? কল্পনা যে সত্যিই পর ! মানুষ কেন মানুষের মায়ায় এমন করে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে ? কেনই বা সে আঘাত পায় ?—তার উত্তর কিশোর সুখেন খুঁজে পেল না।

কল্পনাকে কেন্দ্র করে হাসির যে উৎস তৃপ্ত উজ্জ্বল ধারায় সকলকে আপ্লুত করে দিয়েছিল তার রেশ যেন কোথায় চলে গেল। যে কল্পনাকে ঘিরে এত হাসির এত আনন্দের সমাবেশ, তা কোথায় হারিয়ে গেল। সমস্ত বাড়ীটার মধ্যে যেন একটা বিরাট বিষাদের ছায়া নেমে এল। কাল প্রবহমান, সে চলেছে তার নিজের গতিতে। কত বিচিত্র ঘটনাই না ঘটে যাচ্ছে এই সময়ের অক্লান্ত গতির মাঝে। আনন্দ, বেদনার কত প্রতিচ্ছবি হয়ত পড়ছে তার চলার পথে, কিন্তু কোন পরিপ্রেক্ষিতেই তার চলার পথ থামছে না—সেই সমানতালে সমানভঙ্গি নিয়ে সে চলেছে যুগ যুগ ধরে—সহস্র, লক্ষ বছর ধরে। বাস্তবের সব ঘটনায় সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ করে চলেছে। কিন্তু তার প্রতি এই সময়ের কোন বিচার বা সমালোচনার ছাপ নেই। রূঢ় বাস্তবের পটভূমিকার প্রতিচ্ছবি বা আনন্দ পরিপূর্ণ জীবনপ্রবাহের মাঝে দুঃখের করুণ আর্তি হয়ত হৃদয়-বিদারক, কিন্তু কোন উপায় নেই, তার কর্তব্য তাকে করতেই হবে, তাকে চলতেই হবে তার সময়ের রথে, থামবার সময় নেই।

কি করবে তা ছাড়া ? তাকেও বাঁচতে হবে !—সুখেনদের বাড়ীরও তাই অবস্থা। সব করতে হচ্ছে কিন্তু কোন প্রাণ নেই, নেই আগের মত আনন্দ লহরীর একটা অপূর্ব সুরমূর্ছনা। নূতন কলেজ-জীবন সকল ছাত্রের মনেই দোলা দেয়—থাকে একটা আনন্দের শিহরন। একটা নূতন দৃষ্টিভঙ্গির দিক সকলেই দেখতে পায়। কত বিচিত্র অভিজ্ঞতার পাহাড় এসে মনের দ্বারে রচনা করে কত বিচিত্র রূপায়ণ। মন আর বিবেকের পরিধিও বেড়ে যায় নূতন রূপায়ণের দৃষ্টিতে। এখানে এসে একটা একঘেয়ে জীবনের পরিসমাপ্তি হয়। পায় মুক্তির, স্বাধীনতার প্রথম আস্বাদ।

কিন্তু সুখেনের মধ্যে তার এতটুকু দেখা যায় না। এমনকি আগে কল্পনার মধুর আচরণে তার সাড়া দেহমন সর্বদা আনন্দের লহরীতে ভরে থাকত। এখন সর্বদা মনমরা হয়ে বসে থাকে। কলেজে যায়; সেখানে চুপচাপ বসে থাকে, কারো সাথে কোন কথা বলে না। অনেকে সুখেনের এই ব্যবহারে তার প্রতি একটা অহেতুক সমালোচনা করে। অনেকে বলে—ভাল ছেলে, তাই আমাদের সাথে মেশে না। আরো কত জল্পনা-কল্পনা চলে নিজেদের মধ্যে। তিক্ত সমালোচনার দু'চারটে উপঢৌকন সুখেনকে শুনতে হয়। ভীষন ব্যথা পায় সুখেন এই সমালোচনায়, কিন্তু কিছুই বলতে পারে না। ভাষা সে যেন হারিয়ে ফেলেছে। কি বলবে সে এই পরিপ্রেক্ষিতে? অন্তর তার শিশুর মত কোমল—পৃথিবীর এই বাস্তব সীমারেখার সঙ্গে সে সন্ত্রস্ত। কোমল শিশুর মত মন—কল্পনার এই হঠাৎ চলে যাওয়ার জন্য হাহাকার করে কাঁদে। কিন্তু উপায় নেই, কাকে বলবে সে তার এই অব্যক্ত বেদনার কথা? অনেক সময় একলা বসে থাকিতে থাকিতে চোখে জল এসে যায়। সে বোঝে না যে সে বড় হয়েছে, আর ছোট্টটি নেই। লোকে তাকে কাঁদতে দেখলে হয়ত হাসবে। কি করবে সে—একটা বিরাট ব্যথা হৃদয়ের মধ্যে আঘাত দেবে আর নীরবে তা সহ্য করতে হবে? সহ্য করা ছাড়া তার যে আর কোন উপায় নেই। তার মনের এই দুঃসহ বেদনার কথা কেবল বুঝতেন স্নেহপ্রবণ মা। কিন্তু সুখেনকে সান্ত্বনা দিতে এসে তিনি নিজেই অনেকসময় শিশুর মত কেঁদে ফেলতেন। বিরহের দারুণ শেল তাঁর হৃদয়কে ছিন্নভিন্ন করে দিত। মনের সমস্ত অভিব্যক্তি তো ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, নমিতাদেবীর চোখমুখে প্রতিপন্ন করত সে বেদনার চিত্রপট।

দীনেশবাবু নমিতাদেবীকে বলতেন—দেখ নমিতা, সমাজে এটা অতি সাধারণ ঘটনা। কেউ আসবে আর কেউ যাবে—এই তো জগতের নিয়ম। এ নিয়ম সকলকেই মেনে নিতে হয়—বিরুদ্ধাচরণ করলে দুঃখ শুধু বাড়ে বই কমে না। দেখো, কত কৃতিমান পুত্র

বৃদ্ধ পিতা-মাতা রেখে চিরতরে চলে যাচ্ছে অকালে। বৃদ্ধ পিতামাতার বুকে সেটা শেলের থেকেও বেশী বাজে, কিন্তু তবুও তাঁরা কোনক্রমে তা সহ্য করে বেঁচে আছেন। তাছাড়া কল্পনা তো পরের মেয়ে, ওরা তো চিরদিন এখানে থাকতে আসেনি নমিতা। তুমি এ কথা বুঝেও এমন ছেলেমানুষী করছ কেন? অকারণে পরের মেয়ের প্রতি এমন করে মায়া বাড়িয়ে লাভ আছে কিছু? তা ছাড়া সুখেনও আজকাল একেবারে মনমরা হয়ে থাকে, তুমি যদি শক্ত না হও তবে সে বেচারা সান্ত্বনা পাবে কোথায়? তুমি দৃঢ় হও নমিতা—সত্য যত বড় কঠিন হোক্, তবু অন্ততঃ সুখেনের দিকে তাকিয়ে শক্ত হও।

নমিতাদেবীও বুঝতেন সব কিন্তু কোথা থেকে যেন সব উলট-পালট হয়ে যেত। কল্পনাকে পর বলে মনে করতে মন-বিবেক যেন বিদ্রোহী হয়ে উঠে। তিনি যে ছ-সাত বছব ধরে তাকে নিজের মেয়ের মত মানুষ করেছেন! কল্পনা দিন-রাত তাঁব কাছেই থাকত, তাঁর কাছেই খেত, তাঁর কাছেই ঘুমোত। কি করে ভুলবেন তাকে? অথচ ভুলতে না পারলে সুখেনকেও সান্ত্বনা দেওয়া সম্ভব নয়। দারুণ অশান্তিতে তাঁর মন দুর্বল হয়ে গেল।

দীনেশবাবু কখনও সান্ত্বনা দিয়ে বলেন—কল্পনা তো আবার আসবে। ও নিজেই বলে গেছে—আমি আবার আসব। কল্পনা আবার তোমার কাছে ফিরে আসবেই; সেও তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারবে না।

অনেকদিনপর কুমুদের একখানা চিঠি এল নমিতাদেবীর নামে। কুমুদ লিখেছে—

শ্রীচরণকমলেষু,

দিদি, আজ অনেকদিন আমরা এসেছি, কিন্তু এসে অবধি একটা চিঠিও দিতে পারিনি, কারণ আমি এসেই দেখলাম শাশুড়ী প্রায় মৃত্যুশয্যায়। প্রায় একমাস যমে-মানুষে টানাটানিতে শেষে জিতলাম আমরা। কিন্তু খুব দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, প্রথমটা একটু জিতলেও শেষরক্ষা হল না, শাশুড়ী আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। আমি একা,

সব কিছু আমাকে দেখা-শোনা করতে হয়। শাশুড়ী মারা যাবার পর ওঁরা দু' ভাইয়ে পৃথক হয়ে গেলেন। এদিকে ওঁকে অন্য জায়গায় বদলী করেছে। এ সব নানা ঝামেলায় চিঠি দিতে পারিনি। তারজন্য অবশ্য আমি ক্ষমা চাচ্ছি। সব সময় আপনাদের কথা মনে হয়। সুখেনের জন্য মন এত খারাপ করে যে চিঠিতে লিখে তা জানাতে পারব না। আপনার স্নেহ-ভালবাসা জীবনে কোনদিন ভুলতে পারব না, আপনার ঋণ এ জীবনে কোন কিছুর বিনিময়ে শোধ করতে পারব না। কল্পনা প্রায়ই আপনাদের জন্য কাঁদে। তার শরীর খুব খারাপ হয়ে গিয়েছে। সে প্রায়ই আপনাদের কাছে যাবার জন্য কাঁদে। আপনাদেব কাছে আর যেতে পারব কিনা ভগবান জানেন। কি করে সব ফেলে যাই! তাই বাধ্য হয়ে এ দুঃখ মেনে নিতে হচ্ছে। সুখেনবাবা আমার নাম করে কি? আপনি, দাদা আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম নেবেন। সুখেনবাবাকে আমার প্রাণভরা ভালবাসা দেবেন। পত্রোত্তরে সুখী করবেন।

ইতি

আপনার স্নেহের কুমুদ

চিঠিটা পড়ে নমিতাদেবী খুব কাঁদলেন নিজের মনে। সুখেন মাকে সান্ত্বনা দিতে এসে কল্পনার উপর অভিমানে, দুঃখে সে নিজেই কেঁদে ফেলল। মাতা ও পুত্রের এ করুণ দৃশ্যে সকলের মনে ব্যথার উদ্রেক হয়। কালের চক্রে ঘুরতে ঘুরতে মানুষের কত কষ্ট, কত দুঃখের সম্মুখীন হতে হয় তার ঠিকানা নেই। দুঃখের সঙ্গে নমিতাদেবীর তেমন কোন পরিচয় না থাকায় এই অল্প ব্যথা বিরাট বলে মনে হল। কল্পনার চিন্তায় তাঁকে যেন পাগল করে দিয়েছিল। তাই চিঠি পাওয়ার পর নমিতাদেবী কুমুদকে অনেকবার লিখেছেন তারা যেন একবার আসে। শৈলেশবাবুর সাথে কল্পনাকে পাঠাবার কথাও লিখেছেন কিন্তু কোন উত্তর পান নাই। ভাবেন হয়তো তারা শৈলেশবাবু যেখানে বদলী হয়ে গেছেন সেখানে গেছে। কল্পনাকে

ভুলবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা তিনি করেছেন, কিন্তু সেই সুন্দর সরল মুখখানি বারবার মনে পড়ত। তিনি চিন্তায় একেবারে শীর্ণ হয়ে গেলেন। কল্পনা চলে যাবার পর নমিতাদেবী পূণ্য প্রবাহিণী নির্ঝরণী যেমন দারুণ গ্রীষ্মে শুকিয়ে যায় তেমনি শুকিয়ে গেলেন। মর্মকাতরা নমিতা নানাচিন্তায় আর মনের অশান্তিতে কঠিন অসুখে পড়লেন। রক্তের উষ্ণ স্রোত শিরায় শিরায় প্রবাহিত হতে থাকল। মাঝে বিকারের ঘোরে কল্পনার নাম ধরে ডাকতে থাকেন। এ বুঝি তাঁর অন্তরের ডাক। মাত্র সাতদিনের অসুখে স্বামী ও একমাত্র পুত্রকে রেখে সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে চিরদিনের জন্য ঘুমিয়ে পড়লেন। শোকের অন্ধকারে সুখেনদের বাড়ী ছেয়ে গেল। অকস্মাৎ বজ্রাঘাতে পিতা-পুত্র ভাষাহীন হয়ে পড়ল। ভাগ্য এক দারুণ আঘাতে সকলকে পরাজিত করল।

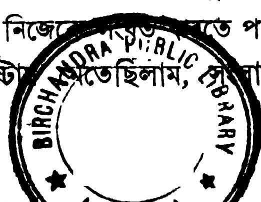
॥ ৩ ॥

দীনেশবাবু প্রথম যৌবনে আত্মীয়-সহায়শূন্য অবস্থায় যাকে বাড়ীতে এনেছিলেন, এই দীর্ঘ দিন ধরে যার সুমধুর সেবা ও সুধা স্নিগ্ধ সহানুভূতিতে সংসার সংগ্রামের সকল ক্লান্তি দূর হয়েছে, যার উৎসাহে শক্তিতে অর্থ উপার্জনের প্রথম সোপানে প্রেরণা পেয়েছেন সেই কল্যাণময়ী নমিতার মৃত্যু তাঁকে একেবারে শক্তিহীন করে দিল। নিজের সহজবুদ্ধিও তিনি যেন আর আপনার মধ্যে ধরে রাখতে পারছিলেন না। অথচ তিনি বুঝতেন, সুখেনকে সান্ত্বনা দেবার ভার তাঁর উপর। মাতৃহারা সুখেন এখন যে শুধু তাঁরই স্নেহাকাঙ্ক্ষী। তাই প্রকাশ্যে তিনি দেখাতেন যে তিনি এ আঘাত সামলে নিয়েছেন। সুখেনকে তার খাওয়া-দাওয়া, পড়াশোনার কথা জিজ্ঞাসা করতেন, তার সঙ্গে নানা গল্প করে অবসর সময় কাটাতে চাইতেন। আর সুখেন চাইত আপনার ব্যথা আবৃত রেখে চিরদিন কর্মপাগল, আত্মভোলা পিতাকে মায়ের সতর্ক সেবার অনুকরণে শান্তি দিতে। দুজনেই বুঝতেন দুজনের মনের ভাব কিন্তু দুজনে একে অপরের কাছে অভিনয় করে, বোঝাতে চাইতেন যে দৃঢ় আছেন। এই কিশোর বয়সে নিজেকে সংযত রেখে আপনজনকে আশ্রয় দেবার এ মমতাময় প্রকৃতি সুখেন তার মায়ের কাছে শিক্ষা পেয়েছে ভেবে দীনেশবাবু মৃতার উদ্দেশ্যে অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানিয়ে মনে মনে বলতেন—'নমিতা, তুমি তোমার সেবা, তোমার মায়া আমার জন্য এবং সংসারের সকলের জন্য

যার মধ্যে রেখে গেছ সে তোমার এই সুখেন। তোমার শিক্ষা বিফল হয়নি। আজ সে দেশের একজন কৃতী ছাত্র—তার স্কুল, তার কলেজ তার জন্য গর্ব অনুভব করে। আর তুমি! তুমি তার এই কিশোর বয়সেই তাকে ছেড়ে চলে গেলে! তুমি এত নিষ্ঠুর কি করে হতে পারলে?' বলতে বলতে তাঁর চোখে জল এসে যায়। অনেক সময় সুখেন এসে দেখত তাঁর এই কান্না। কাছে এসে বলতো—'বাবা, কাঁদছ কেন? আমি তো আছি। যদিও মায়ের কথা না ভেবে থাকতে পারা যায় না কিন্তু তাঁর কথা ভেবে তাঁর যাত্রাপথের সীমাকে ব্যাহত করা ঠিক নয়। দেখবে বাবা, মা স্বর্গ থেকে আশীর্বাদ করবেন। তাঁর সে আশীর্বাদে আমি বড় হব, অনেক বড় হব। তোমার সব দুঃখ তখন নিশ্চয়ই দূর হবে।' বলতে বলতে তার চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠত। আর দীনেশবাবু তাকে জড়িয়ে ধরে বলতেন—হ্যাঁ, সুখেন তোকে বড় হতে হবে, মানুষ হতে হবে। তোর মায়ের ইচ্ছা তোকে পূরণ করতেই হবে, তবে তার আত্মা শান্তি পাবে।

এ বাড়ীর তেতলায় থাকতেন একজন ডাক্তার। তিনি মাঝেমাঝে এসে তাদের সান্ত্বনা দিতেন। বলতেন—দীনেশবাবু, আপনি বিচক্ষণ লোক হয়ে এমন করেন কেন? আপনাকে এখন ধৈর্য ধরতে হবে, সুখেনের মুখ চেয়ে দৃঢ় হতে হবে। আপনি যদি অস্থির হন তাহলে সুখেনের জীবন সার্থক হবে না। ওর মন যদি শান্ত না হয় তাহলে ও বড় হতে পারবে না।

দীনেশবাবু অনেক সময় বুঝতেন, আবার অনেক সময় শিশুর মত অবুঝ হয়ে আবেগবিহ্বল ভাবে বলে উঠতেন—আপনি বুঝবেন না ডাক্তার, নমিতাকে ছেড়ে থাকা কি শক্ত, কি কঠিন! তার সেবা, তার মমতা যে প্রতি মুহূর্তে অনুভব করি। আমি জানি আমাকে দৃঢ় হতে হবে, সুখেনকে বড় করে তুলতে হবে। নমিতা যে দায়িত্ব আমাকে দিয়ে গেছে তা পালন করতে হবেই। কিন্তু কিছুতেই ভরসা পাই না ডাক্তারবাবু, কিছুতেই সহজে নিজেকে [illegible] তে পারি না। আমি চিরকাল শুধু অর্থ উপার্জনের চেষ্টায় [illegible] তেছিলাম, [illegible] রের সব



দায়িত্ব সে একা বহন করেছে। কোনদিন কখনও সামান্যমাত্র অভিযোগও করেনি। আমি যদি কোনদিন জানতে চেষ্টা করতাম তাহলে ও হাসিমুখে বলতো—তোমাকে ও সব ভাবতে হবে না। সংসারের হাল ধরে সে একাই চালিয়েছে এতদিন। তাই আজ আমি অবাক হয়ে ভাবি কি করে ও এই বিরাট দায়িত্ব হাসিমুখে পালন করেছে! আর আমি চেষ্টা করেও এই বিরাট দায়িত্বের সামান্যটুকুও পালন করতে আজ অক্ষম। সত্যিই ডাক্তারবাবু, আমি অসহায়, আমি নিরুপায় হয়ে গেছি।

সেদিনও দীনেশবাবু ডাক্তারবাবুর কথার উত্তরে আক্ষেপ করছিলেন। তখন ডাক্তারবাবু বলে উঠলেন—দেখুন, শুধু কি আপনার এই অবস্থা? আমার সব কথা যদি শোনেন তাহলে আপনি অবাক হয়ে যাবেন, স্তম্ভিত হয়ে যাবেন। কিন্তু তবুও ধৈর্য ধরে থাকতে হয়েছে, আমাকে সব কিছু ভুলে দৃঢ় হতে হয়েছে কৃষ্ণার জন্য। কত বড় আঘাত সহ্য করেছি তারজন্য শুনবেন দীনেশবাবু? তবে শুনুন আমার জীবনী। দেখবেন আমার আঘাত কত বড়।

আমি যখন M. B. B. S. পাশ করলাম তার দুবছর পরেই আমার পিতা আমাদের দুভাইকে রেখে চলে গেলেন। আমার ভাই সেবার ইণ্টারমিডি:য়ট্ পরীক্ষা দিয়েছে। পরীক্ষার ফল বের হল। দেখা গেল আমার ভাই সুধীর পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। আনন্দে বুক ভরে উঠল। তখন আমার আত্মীয়-স্বজনরা বললেন—তুমি বিয়ে কর। তাদের অনুরোধে বিয়েও করলাম। সেদিনের আনন্দের কথা আমার আজও মনে আছে। আমাদের ছোট সংসারে অঞ্জনা এসে সংসারের সব দায়িত্ব নিল। আমাদের আনন্দের পরিধি যেন আরও বাড়িয়ে দিল। মা আমাদের ছোট বয়সেই মারা গিয়েছিলেন, বাবাই ছিলেন একাধারে মা ও বাবা দুইই। সুধীরের বৌদি তাই অতি অল্প সময়েই তার মায়ের স্থান দখল করল। সুধীরকে ভর্তি করলাম শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে। কলেজের মধ্যে সে একজন সেরা ছাত্র বলে সকলেই তাকে খুব ভালবাসত। আমি পাশ

করার পরই চাকুরী নিয়েছিলাম। অল্পদিনে সুনামও অর্জন করে ফেললাম। আমি তখন মেদিনীপুরের সদর হসপিটালে। আমাদের আনন্দের সংসার তখন পূর্ণ—আনন্দের আর শান্তির তৃপ্তিতে। কিন্তু এত আনন্দ সহ্য হল না। সুধীর তখন তৃতীয় বৎসরের ছাত্র। বন্ধুদের সঙ্গে এক ছুটির দিনে গঙ্গায় স্নান করতে গেল। সুধীর ভাল সাঁতার জানত না। কিন্তু বন্ধুদের অনুরোধে সেদিন স্নান করতে গিয়েছিল। উৎসাহে সাঁতার কাটতে কাটতে সকলেই বেশ একটু দূরে চলে গিয়েছিল, এমন সময় একটা চিৎকার শুনে সকলে দেখল সুধীর ভেসে যাচ্ছে, চেষ্টা করেও এদিকে আসতে পারছে না। সকলে তৎক্ষণাৎ ওকে বাঁচাবার জন্য তাড়াতাড়ি ওর কাছে যাবার চেষ্টা করল। কিন্তু প্রবল স্রোতে কেউ ওর কাছে যেতে পারল না। সুধীর তখন ভেসে চলে গেছে অনেকদূর। কলেজ কর্তৃপক্ষ সঙ্গে সঙ্গে জল-পুলিশকে জানিয়ে খোঁজ নেবার চেষ্টা করলেন কিন্তু কেউ খোঁজ পেল না। তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে আমাকে টেলিগ্রাম করে সব জানিয়ে ওখানে যাবার জন্য জানালেন। খবর পেয়েই পাগলের মত ছুটে গেলাম। গিয়ে দেখলাম অনেক চেষ্টায় প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা পর সুধীরের মৃতদেহটা খুঁজে পাওয়া গেছে। কলেজের প্রাঙ্গণে তার মৃতদেহটা ঘিরে সব প্রফেসর আর ছাত্ররা দাঁড়িয়ে আছেন। ফুলের মালায় সমস্ত দেহটা ঢাকা পড়ে গেছে। আমি পাগলের মত গিয়ে সুধীরের দেহটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম। তারপর আর কোন জ্ঞান ছিল না। যখন জ্ঞান ফিরল তখন দেখি আমি মেডিকেল কলেজের একটা কেবিনে, আর আমার পাশে অঞ্জনা, ছেলে অপূর্ব আর মেয়ে কবি।

ফিরে এলাম মেদিনীপুরে, কিন্তু আর ওখানে থাকতে পারছিলাম না। সুধীরের স্মৃতি প্রায় প্রতিটি ঘরেই, যেদিকে তাকাই ওর স্মৃতির দু' একটা অংশ চোখে পড়ে। বদলির জন্য দরখাস্ত করলাম। কিছুদিন পর সরকার D. M. O. করে পাঠালেন বীরভূমের সদর হাসপাতালে। সেখানে বেশ ভালও লাগল। উদার আকাশের গায়ে দূরের পাহাড়গুলো দেখতে দেখতে বেশ

তন্ময় হয়ে যেতাম। একটু একটু করে শোকের তীব্রতা কমে গেল। আবার স্বাভাবিক হঁয়ে উঠলাম। অপূর্ব ওখান থেকেই স্কুলের সর্বশেষ পরীক্ষা দিল। খুব ভাল ভাবেই ম্যাট্রিক পাশ করল। ও বলল—'বাবা, আমি সাধারণ লাইনেই থাকব, তাহলে একদিন হয়ত আই, এ, এস হতে পারব।' তার কথাতে আমিও মত দিলাম, যদিও আমার ইচ্ছা ছিল ওকে ডাক্তারী পড়াব। কিন্তু ওর মা বললে—'অপূর্বর ইচ্ছায় তুমি বাধা দিও না, তাতে ফল ভাল হবে না। জোর করে নিজের ইচ্ছা ওর উপর চাপিয়ে দিলে ও কিছুতেই ভাল ফল করতে পারবে না, তাতে ওর জীবন নষ্ট হয়ে যাবে।' আমিও তাই মত দিলাম। প্রেসিডেন্সি কলেজে অপূর্ব ভর্তি হল। কবি তখন ক্লাস নাইনের ছাত্রী। বেশ আনন্দেই দিনগুলি কাটতে লাগল। কৃষ্ণা তখন খুব ছোট। আই, এ, পরীক্ষায় অপূর্ব চতুর্থস্থান দখল করল। কবিও খুব ভালভাবেই ম্যাট্রিক পাশ করল। তাদের উন্নতি এবং সার্থকতায় সুধীরের কথা একটু একটু করে ভুলতে লাগলাম। মাঝে মাঝে তার কথা মনে পড়লে চোখের জল বাধা মানত না। সুধীর ভাল ভাল খাবার খেতে খুবই ভালবাসত। তাই যেদিন বাড়ীতে ভাল রান্না হত, অঞ্জনা তখন বলত—'আজ ঠাকুরপো থাকলে কত না আনন্দ হত!' অঞ্জনা কিছুতেই ভাল খাবার মুখে দিতে পারত না। বলত—'না, আমাকে আর ওসব খেতে বলে লজ্জা দিও না। আমি কিছুতেই ওসব খেতে পারব না।' তাই আমি ইচ্ছা করে বাড়ীর ভাল রান্না যাতে খুব কম হয় তার ব্যবস্থা করেছিলাম। কবিকে আমি স্থানীয় কলেজেই ভর্তি করেছিলাম। অপূর্বও প্রেসিডেন্সীতে বি. এতে ইংরাজী অনার্স নিয়ে ভর্তি হল। অপূর্ব শুধু পড়াশোনা নয়, খেলাধুলা থিয়েটার, আবৃত্তি সব কিছুতেই সুনাম অর্জন করেছিল। ছুটিতে প্রায় নানাকাজে ব্যস্ত থাকত। ওর বন্ধুরা ওকে ছাড়তে চাইত না। তাকে সঙ্গে করে কেউ কেউ তাদের গ্রামে নিয়ে যেত, আর অপূর্ব ঐ সব খুব ভালবাসত বলে আমরাও তাকে কিছু বলতাম না। এ ভাবে বি. এ পরীক্ষা পর্যন্ত প্রায়

বাইরে বাইরেই থাকত। পরীক্ষা দিয়ে ও চলে এল আমাদের কাছে। বাড়ীতে আনন্দের সাড়া পড়ে গেল। ভাই-বোনে হৈ হৈ করে বাড়ী সরগরম করে রাখত। আমার ভাগ্য দেখে আমার বন্ধু এবং স্থানীয় লোকজনরা আমায় বলত—'আপনার সৌভাগ্য দেখে হিংসা হয় ডাক্তারবাবু। আপনার ছেলে-মেয়েরা হীরের টুকরো—দেখলেও বুক ভরে যায়।' অঞ্জনা এ কথা শুনে উৎফুল্ল হয়ে উঠত। আমাকে বলত—'দেখো, অপু নিশ্চয়ই ম্যাজিষ্ট্রেট্ হবে, আমাদের মুখ উজ্জ্বল করবে।' অপূর্বকে দেখে অনেকেই তার বিয়ের জন্য আমাকে বলত। আমি বলতাম—'দেখুন, ও ভাল কিছু একটা না করা পর্যন্ত ওর বিয়ে দেব না।' ওর মাও অল্প বয়সে বিয়ে দেবার পক্ষপাতী ছিল না।

ঠিক সময়ে ফল বার হল। কাগজে অপূর্বর ছবি দেখে আমি আনন্দে আত্মহারা হয়ে চিৎকার করে উঠেছিলাম। অঞ্জনার কাছে গিয়ে বললাম—দেখ, দেখ আমাদের অপূর ছবি বার হয়েছে। পরীক্ষায় ও প্রথম হয়েছে। দেখে অঞ্জনা ও কবির সেকি আনন্দ! সেদিনের কথা ভোলা যায় না। আজও তার প্রতিটি কথা আমার মনে গাঁথা আছে। সেই আনন্দের ঢেউয়ে বাড়ীর সকলেই, আমার বন্ধুরা এবং প্রতিবেশীরা সকলেই মেতে উঠেছিল। সেদিনের সে আনন্দের কথা মনে পড়লেই আজও আমি স্থির থাকতে পারি না। কিন্তু দীনেশবাবু সুখেরও সীমা আছে। আর বোধ হয়, আমার ভাগ্যে বেশী সুখ সহ্য হয় না।

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বলতে লাগলেন—অপু কিছুদিন পর বি, সি, এস, পরীক্ষা দিল এবং সসম্মানে পাশ করল। পাশ করার সঙ্গে সঙ্গে একটা ভাল চাকরীও পেল। কিন্তু ওর মা ওকে চাকরী নিতে দিলেন না। বললেন—'অপু, তোমাকে আই, এ, এস পরীক্ষা দিতে হবে। আর এত তাড়াতাড়ি চাকরীর কোন দরকার নেই। তুমি ভাল করে এই পরীক্ষায় পাশ কর, তারপর ত চাকরী করতেই হবে।' তার ইচ্ছা না থাকায় অপূর্ব চাকরী নিল না,—আই এ, এস, পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে লাগল। যথা সময়ে ভালভাবেই

পরীক্ষা দিল। এদিকে আমি কলকাতায় বদলি হয়ে গেলাম। ভাবলাম এবার কলকাতায় একটা বাড়ী করে রাখব। কিন্তু কলকাতায় আসবার জন্য যখন তৈরী হচ্ছি ঠিক সেই সময় পেলাম দারুণ আঘাত। আমার সব আশা, সব ইচ্ছা যেন একেবারে তাসের ঘরের মত এক আঘাতেই ভেঙ্গে গেল। একদিন রাত্রে অপুর হঠাৎ জ্বর এল। তার পরের দিন দেখা গেল তার সারা গায়ে বসন্তর গুটি বার হয়েছে। আমরা খুবই ভয় পেয়ে গেলাম। আমি নিজে ডাক্তার, তার উপর এ খবর পেয়ে হাসপাতালের এবং স্থানীয় সব ডাক্তার তাকে দেখলেন। কিন্তু ওর যন্ত্রণা কিছুতেই কমল না। সারারাত আমি অঞ্জনার সঙ্গে অপূর্বর কাছে বসে রইলাম। কিন্তু কিছুই হল না। পারলাম না দীনেশবাবু ভাগ্যের সঙ্গে যুদ্ধে। হার স্বীকার করতেই হল। অপুকে বাঁচাতে পারলাম না। তাকে ধরে রাখতে কিছুতেই পারলাম না। নিষ্ঠুর নিয়তি তাকে আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নিল। ওর মা অপূর্বর দেহের উপর আছড়ে পড়ল। কেউ তাকে সরাতে পারল না। শেষে সকলে আমাকেই বলল তাকে সরিয়ে নিতে। আমিই তাকে সরিয়ে নিয়ে এলাম। তার অজ্ঞান দেহটা অন্য ঘরে নিয়ে গেলাম আর অপূর্বর শবদেহটা সৎকার করতেও যেতে হল আমাকেই। সে চিতার আগুন আজও আমার বকে জ্বলছে দীনেশবাবু। কিন্তু এই শেষ নয়। দুদিনের মধ্যে অঞ্জনাও এই কালরোগে বিদায় নিল। সব ভার আমার উপর দিয়ে নিজে চলে গেল। আর আজও আমি দৃঢ় আছি শুধু কৃষ্ণার মুখ চেয়ে।

বদলী হয়েই ছিলাম। তাড়াতাড়ি চলে এলাম কলকাতায়। কবি এই দুঃখে বি, এ, পরীক্ষা দিতে পারল না, আমিও সরকারী চাকরী ছেড়ে চেম্বার করলাম। তারপর একদিন ভাল ছেলে দেখে কবির বিয়ে দিলাম। কবি এখন একটু সুখী। আর আমি আজও সংগ্রাম করছি—একটুও বিশ্রাম করবার, দুঃখ করবার অবকাশ নাই। কৃষ্ণার বিয়ে দিয়ে তবে মুক্তি পাব এ সংগ্রাম থেকে। দেখুন দীনেশবাবু, আপনার থেকে কত বড় আঘাত আমি সহ্য করেছি। আর

আজও শক্ত আছি। কিন্তু আপনি নিজের শোককে বড় করে দেখে উতলা হচ্ছেন। আমি আবার বলছি দীনেশবাবু, দৃঢ় হন, শক্ত হন, মানুষ করে তুলুন সুখেনকে। দেখবেন যেদিন সুখেন নিজের পায়ে দাঁড়াবে, দেশের একজন কৃতী পুরুষ হবে, সেদিন কি আনন্দ পাবেন। আজ আমি উঠি দীনেশবাবু—বলে ডাক্তারবাবু চোখ মুছতে মুছতে চলে গেলেন। আর দীনেশবাবু স্তম্ভিত বিস্ময়ে শুধু তাঁর চলার পথে চেয়ে রইলেন।

ডাক্তারবাবুর জীবনকথা শুনে, তাঁর দুঃখের বিশালতার কথা চিন্তা করে, তাঁর দৃঢ়তা দেখে কথা বলবার মত শক্তিও দীনেশবাবু হারিয়ে ফেললেন। মনে মনে ভাবতে লাগলেন—হ্যাঁ, আমাকে শক্তি সঞ্চয় করতে হবে। মানুষ করতে হবে সুখেনকে। তার সুখের পথে, উন্নতির পথে নিজের শোক-দুঃখ বড় করে তার চলার পথ রুদ্ধ করে দেবেন না। সুখেন যদি মানুষ না হয়, যদি তাকে বড় করতে, দেশের ও দশের একজন করতে না পারি, তাহলে উপর থেকে নমিতার অভিসম্পাত পাবো। ডাক্তারবাবু কত বড় দুঃখেও মেরুদণ্ড সোজা রেখেছেন, এত আঘাতেও আঘাতের কাছে হার স্বীকার করেননি, আর আমি স্বার্থপরের মত নিজের শোককে বড় করে সুখেনের সর্বনাশ করতে বসেছি। না, আজ থেকে আমি দৃঢ় হবই, ডাক্তারবাবুর মন্ত্রে দীক্ষা নেব।

দীনেশবাবু সুখেনের ঘরে গিয়ে দেখলেন সুখেন তখনও একমনে পড়ে চলেছে। অনেক দিন পর তিনি সুখেনের ঘরে প্রবেশ করলেন। দেখলেন, দেওয়ালে নমিতাদেবীর একটা এনলার্জ করা ফটো টাঙানো, আর তাকে ঘিরে একটা মালা দুলছে। কাছেই একটা টেবিলে ধূপদানিতে ধূপের গন্ধে ঘরটি ভরে গেছে। মনে হল ধূপশিখায় সুখেন তার মায়ের আরতি করছে। একদৃষ্টিতে অনেকক্ষণ নমিতাদেবীর ফটোর দিকে তাকিয়ে থেকে সুখেনের দিকে চাইলেন। দেখলেন সুখেন একমনে পড়ে চলেছে—তাঁর আসার কথা জানতে পারেনি। তিনি আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে সুখেনের গায়ে হাত দিয়ে

বললেন—সুখেন, অনেক রাত হয়েছে। আমিও ডাক্তারবাবুর সঙ্গে গল্প করছিলাম, কিছু টের পাইনি। এখন :চল আমরা খেয়েনি গে। কিন্তু খাওয়ার পর আর দেরী করিস না। তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়বি, কেমন ?

আচ্ছা বাবা, আপনি ভাববেন না,—বলে সুখেন তাঁর সঙ্গে গেল।

খাবার পর দীনেশবাবু তাঁর ঘরে গেলেন, আর সুখেন নিজের ঘরে চলে এল। সেদিন ছিল পূর্ণিমা। ঘরে ঢুকেই সুখেন দেখল চাঁদের আলো জানলা দিয়ে ঘরে ঢুকে তার বিছানায় যেন একখানা সাদা চাদর বিছিয়ে দিয়েছে। জানলার কাছে গিয়ে দেখল সামনের বাড়ীর বাগানের 'ফুলগুলো যেন চাঁদের সঙ্গে মিতালী পাতিয়ে লুকোচুরি খেলছে। দেখে চমকিত হয়ে গেল সুখেন। ভাবল, আজ যদি মা থাকতেন তাহলে তাঁকে দেখাত এ দৃশ্য—দেখে তিনি নিশ্চয়ই খুসী হতেন। একটু বোধ হয় রাগও করতেন তার এতরাত পর্যন্ত জেগে থাকা দেখলে। তিনি কিছুতেই তাকে বেশী রাত জাগতে দিতেন না। নানা চিন্তায় তার মন চঞ্চল হয়ে উঠে। ভাবে, আমার জীবনও কি আলোময় হবে না ? কয়েকদিন আগেও এ রকম ভাবে জানলায় এসে সে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু সেদিন দেখেছিল চারদিক অন্ধকার, ঝিঁ ঝিঁ পোকার একটানা ডাক আর কি একটা পাখীর কর্কশ স্বর মনের মধ্যে একটা আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু আজ সে আলোড়ন নেই। সমস্ত ধুয়ে-মুছে গেছে। প্রকৃতি যেন আজ তাকে ডাকছে তার আনন্দের ভাগে অংশ গ্রহণ করবার জন্য। মন তার এক অনির্বচনীয় আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠল। মুখ ফিরিয়ে ঘরের দিকে তাকাতেই দেখলো তার বিছানা চাঁদের আলোয় ভরা। হঠাৎ তার মনে হল নিশ্চয়ই মা তার এই রাত জাগা দেখে চাঁদের আলো হয়ে তার বিছানা ঢেকে ফেলেছেন আর যেন বলছেন ঃ সুখেন, রাত হয়েছে, আমি তোমায় রাত জাগতে নিষেধ করেছি না ?—সে এগিয়ে এল বিছানার দিকে। বলল—'বুঝেছি মা তোমার কথা। না, আর রাত করব না। এবার তোমার সুখেন ঘুমোবে তোমার কোলে মাথা রেখে।' কিন্তু সুখেন

যেই বিছানায় বসে শোবার উদ্যোগ করছে ঠিক তখনই ভেসে এল সেই পাগল ছেলেটার গান। গান না বলে একে তার আকুল-করা কান্না ভেজা ডাক বলা যায়। সে যেন তার গানের মধ্যে সকলকে ডেকে বলছে—ওগো, ঘুমিয়ে থেক না : আমার কথা ভেবে একবার জাগো। পৃথিবীর তোমরা সবাই সুখে ঘুমাচ্ছ, আর আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি একা একা। তোমরা একটু আমায় সঙ্গ দাও, অন্ততঃ কিছুক্ষণও তোমরা আমার কাছে এস। তার গানের সুরে যেন এক মরুময় জীবনের সুর প্রতিধ্বনিত হচ্ছে সুরের প্রতিটি ছন্দে।

চেনে ওকে সুখেন। খুব ভাল গান গায়। আগে ও কোন সভাতে গান গাইলে লোকে আর অন্যের গান শুনতে চাইত না। এখন কিন্তু ও একবারে পাগল হয়ে গিয়েছে। অন্ততঃ লোকে তাই ভাবে। কিন্তু সুখেন জানে, সে আসলে পাগল নয়। দিনরাত মদ খেয়ে খেয়ে নিজেকে এরকম পাগলের মত করে রাখতে চায়। ছেলেটির নাম সমীর। সুখেন জানে সমীরের কাহিনী, জানে কেন ও এই রকম করে থাকতে চায়। সমীরের বাড়ী ছিল পাকিস্তানে। দাঙ্গায় স্থানীয় দাঙ্গাবাজরা ওর বাবা, দাদা ও দিদিকে কেটে ফেলে। শুধু বেঁচে ছিল সমীরের মা, সমীর নিজে, আর ওর ছোট্ট বোন নীলিমা। কোন রকমে প্রায় মূর্ছিতা মা আর ছোট্ট বোনকে নিয়ে সে কলকাতায় চলে আসে। আসবার সময় সামান্য কিছু টাকা আর তার মায়ের গয়না আনতে পেরেছিল। তাই শিয়ালদার আশ্রমে উঠতে হয়নি। কোনরকমে একটা বস্তিতে সামান্য ভাড়ায় একখানা ঘর নিয়ে আরম্ভ করল তার নূতন জীবন। তার মা লোকের বাড়ীতে কাজ করতেন, আর সমীর ভোরে বাড়ী থেকে বেড়িয়ে বাড়ী বাড়ী খবরের কাগজ বিক্রি করত। সুখেনদের বাড়ীতেও সমীর কাগজ দিত আর তখনই আলাপ হয়। সারাদিন খবরের কাগজ বিক্রি করে রাতে পড়াশুনা করত। একদিন অনেক চেষ্টা করেও পরীক্ষার ফীয়ের টাকা ও যখন যোগাড় করতে পারল না তখন সুখেনের কাছে চুপি চুপি এসে বলেছিল—'ছোটবাবু, আমায় কয়েকটা টাকা দিতে পারেন? আমি যত তাড়াতাড়ি

পারি শোধ করে দেব।' সুখেন জিজ্ঞাসা করেছিল, হঠাৎ তার টাকার দরকার হল কেন? তখন সমীর তাকে বলল—'আমি এবার ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিতে চাই। কিন্তু বাবু পরীক্ষার ফী যোগাড় করতে পারছি না। তাই আপনাদের কাছে চাইছি কিছু টাকা।' কিশোর সুখেন জিজ্ঞাসা করেছিল—'তুমি পরীক্ষা দেবে? সে তো খুব ভাল কথা। আচ্ছা, কত টাকা তোমার চাই বল, আমি টাকা এনে দিচ্ছি।' সমীর বলেছিল, প্রায় ত্রিশ টাকা তার দরকার, কিন্তু সে যা পারে তাই দিতে। বাকিটা সে অন্য কোথাও দেখবে। সুখেন তখন কল্পনাকে এসে বলেছিল—'জানিস কল্পনা, যে আমাদের বাড়ীতে রোজ কাগজ দেয়, সে এবার ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিতে চায়। কিন্তু ফীয়ের টাকা জোগাড় করতে পারেনি। আমার কাছে কিছু টাকা ধার চাচ্ছে, কিন্তু এখন তো আমার কাছে কিছু নেই, তুই কিছু টাকা দিতে পারবি? ফী জমা না দিলে ও পরীক্ষা দিতে পারবে না। দেখ, আমাদের দেশে কত বড়লোক তাঁর ছেলের পাশের জন্য প্রচুর টাকা খরচ করছেন, তবুও সে পাশ করতে পারছে না, আর এদিকে একজন মাত্র পরীক্ষার ফীয়ের টাকার অভাবে পরীক্ষা দিতে পারছে না। এ ভাবে যে কত শত জীবন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে কে জানে!' উত্তরে কল্পনা চিৎকার করে বলেছিল—'এই নাও সুখেনদা, আমার গলার হার। আমার কাছে একটাও টাকা নেই, কিন্তু এ হার আছে। এটা বিক্রি করে ওকে টাকা দাও সুখেনদা।' কিন্তু সুখেন পারেনি সে হার নিতে। বলেছিল—'না, ওটা থাক্। দেখি একবার মাকে বলে। তবে তিনি যদি টাকা না দেন তাহলে তোর হারটা নেব, নিশ্চয়ই নেব। এ ভাবে একটা জীবন নষ্ট হতে দেব না।' কিন্তু নিতে হয়নি সে হার। মাকে সব কথা বলতেই তিনি খুব খুশী হয়েই ত্রিশ টাকা সুখেনকে দিয়ে বললেন—'এই নে টাকা, যদি আরও দরকার লাগে তাহলে সমীরকে বলতে বলিস্। সে যেন কোন লজ্জা না করে। আর আমি তোদের এই পরের দুঃখে দুঃখী হতে দেখে খুব খুশী হয়েছি সুখেন। আমার একথাটা তুই সব সময় মনে রাখিস সুখেন—অপরের দুঃখে কোনদিন যদি দুঃখী না হতে পারিস,

যদি তার কোন উপকার করতে নাও পারিস, তবে তার দুঃখকে ছোট করে দেখে তাকে উপহাস করিস না। তুই তোর সাধ্যমত তোর দ্বারা যতটুকু সম্ভব ঠিক ততটুকু উপকার করবি।' মায়ের কথা মনে হতেই সুখেন তাকালো মায়ের ছবির দিকে। দুচোখ ভরে এল জলে, দুহাত তুলে প্রণাম করল মায়ের ছবির দিকে তাকিয়ে। বলল—'তোমার আদেশ আজীবন রাখব মা।' সেদিন সুখেন সমীরের হাতে তুলে দিয়েছিল সেই ক'টা টাকা, বলেছিল আম্মার মা দিয়েছেন এ টাকা তোমাকে, আর বলেছেন যদি আরও দরকার হয় তবে তাঁকে জানাতে। কল্পনা বলেছিল সমীরকে—তোমাকে মানুষ হতে হবে দাদা। ভাল করে পাশ করে এ দুঃখের জীবন দূর করে বড় হতেই হবে। তোমার যখন যা প্রয়োজন হবে আমাকে বা সুখেনদাকে জানাবে, আমরা সাধ্যমত সে প্রয়োজন পুরণ করতে চেষ্টা করব কিন্তু ভাল ভাবে পাশ তোমাকে করতেই হবে।

সমীরের জীবন যেন ধন্য হয়ে যায়। এই দুটি কিশোর প্রাণের মমতা আর সহানুভূতি দেখে সে অভিভূত হয়ে যায়। যেখানে আজকাল সামান্য চারটে মাত্র পয়সা দিতে লোকে বিমুখ হয় সেখানে এক কথাতেই এই অপরিচিত কিশোর তাকে এতগুলো টাকা দিল দেখে সে অবাক হয়ে গেছিল। বলেছিল—দিদিভাই, তোমার কথা রাখতে নিশ্চয়ই চেষ্টা করব। আর সুখেনকে বলেছিল—আপনাকে ধন্যবাদ দিয়ে ছোট করব না, তবে মাকে আমার প্রণাম জানাবেন। সুখেন বলেছিল —আজ থেকে আমরা বন্ধু হলাম, সুতরাং আমাকে আর আপনি বলবে না তুমি।

স্বীকার করেছিল সমীর সে কথা। তারপর বিদায় নিয়েছিল সেদিন। তারপর প্রতিদিনই সে যখন কাগজ দিয়ে যেত তখন সুখেনের সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করে যেত। সত্যি, কি অপূর্ব এ ছেলেটি! কি ভদ্র আর বিনয়ী—সেকথা সুখেন আজও ভাবে। সমীর শত কষ্টের মধ্যেও অনলস ভাবে তার পড়াশোনা চালিয়ে গেল। সুখেন তার সঙ্গে তাদের বাড়ীতেও গেছে। সুখেন তাদের বাড়ীতে গেলে সমীরের

আনন্দের আর সীমা থাকত না। তাকে কোথায় বসাবে, কি করে তাকে তার অন্তরের প্রীতি জানাবে তা খুঁজে পেত না। তার ছোট বোন নীলি সুখেনকে দেখলেই ছুটে আসত। সমীরের মা সুখেনকে বলতেন—তোমার কথা সমীরের মুখে প্রায়ই শুনি। তোমার কথা বলতে গেলে ওর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠে। সমীর কি বলে জান বাবা, সমীর বলে—এরকম বন্ধু কজন পায় ? ওর মত এতবড় হৃদয় দেশের প্রতিটি লোকের হওয়া উচিত ; আর তা হলেই সকলের মনে আসবে শান্তি।

সেদিনের কথাটা আজও পরিষ্কার মনে আছে সুখেনের। সেদিন সকালে কাগজ দিতে এসে সমীর চিৎকার করে সুখেনকে ডাকল। সুখেন এলেই তাকে জড়িয়ে ধরে বলল—জান সুখেন, আমি পরীক্ষায় তৃতীয় হয়েছি। সকালের কাগজে এখবর দেখেই ছুটে চলে এসেছি এখানে। ডাক দিদিভাইকে, তাকে বল তোমার দাদা তোমার কথা রেখেছে। খবর শুনেই ছুটে এসেছিল কল্পনা। কল্পনা আনন্দে বলেছিল—আমি জানতাম দাদা, তুমি ভাল ফল করবেই। প্রণাম করেছিল সুখেনের মা-বাবাকে। নমিতাদেবী তাকে ওখানে জল খাবার কথা বলতেই সে বলেছিল—না মাসীমা, আজ নয় পরে একদিন খেয়ে যাব। এখনও কাউকে কাগজ দেওয়া হয়নি আর তাছাড়া মাকে এখনও এ খবর দেওয়া হয়নি। খবরটা দেখেই প্রথমেই ছুটে এসেছি এখানে। আপনাদের আশীর্বাদেই আজ আমার এ সাফল্য।

পাশ করে সমীর ভর্তি হল স্কটিশচার্চ কলেজে। স্কলারশিপের প্রথম মাসের টাকাটা পেয়েই সে সুখেনকে দিতে এসেছিল সে টাকা। বলেছিল—তোমার কাছে টাকা ধার নিয়ে পরীক্ষার ফী দিয়েছিলাম। সেদিন যখন অনেকটা নিরুপায় হয়ে তোমার কাছে টাকা চেয়েছিলাম, তখন ভাবিনি সত্যিই তুমি টাকা দেবে। আর দিলেও সমস্ত টাকাটা তুমি দেবে একথা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। লোকের দ্বারে দ্বারে ঘুরেও সামান্য টাকা জোগাড় করতে না পেরে, সকলের কাছেই প্রত্যাখ্যাত হয়ে ভেবেছিলাম তুমিও আমাকে প্রত্যাখ্যান করবে। কিন্তু তার

বললে তুমি যখন ফীয়ের সব টাকা দিলে তখন আমি স্তম্ভিত হয়ে গেছলাম। তাই আজ স্কলারশিপের প্রথম টাকা পেয়েই এসেছি সে টাকা শোধ দিতে। তবে আমি কোনদিনই তোমার সে উপকার ভুলব না, আর তোমার কাছে যে ভাবে আমি ঋণী সে ঋণ আমি কোনদিন কোনকিছুর বিনিময়ে শোধ করতে পারব না।

সুখেন নিতে চায়নি সে টাকা, কিন্তু কল্পনা নিয়েছিল। কল্পনা বলেছিল—না. সুখেনদা এটাকা না নিলে দাদাকে অপমান করা হবে। দাদা মনে করবে তার দুরবস্থার সুযোগ নিয়ে সামান্য কটা টাকা দিয়ে তার অবস্থার প্রতি বিদ্রূপ করেছি সেদিন। দাও দাদা, তোমার টাকা আমি নিলাম।

সমীরের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। কল্পনাকে বলেছিল—তুমি ঠিক বলেছ দিদিভাই। টাকা না নিলে সত্যি আমি দুঃখ পাব। টাকা নিয়ে তুমি আমাকে সম্মান দিলে দিদিভাই। তোমরা যেমন সেদিন আমাকে আমার জীবন গড়ে তুলতে সাহায্য করেছ তেমনি আজ আমার জয়গৌরবের প্রথম টাকা তোমাদের হাতে তুলে না দিলে শান্তি পাব না। এ শুধু ঋণশোধ নয় দিদিভাই, এ আমার অন্তরের পূজা—তোমাদের সেদিনের কিশোর সুন্দরতম মনের পূজা। আজ যদি আমি সেদিনের টাকা শোধ না করি, সেদিন ধার বলে যে টাকা নিয়েছিলাম সে টাকা যদি পরিশোধ না করি, তাহলে তোমাদের মনে সন্দেহ জাগবে। আর কোনদিন কোন দুঃস্থ যদি তোমাদের কাছে ঋণ চায় তাহলে আমার কথা স্মরণ করে তাকে সন্দেহ করবে, আর সেই সন্দেহ তোমাদের মন দুর্বল করে তুলবে, হয়তো সেই দুঃস্থকে ঋণ দিতে অস্বীকার করবে। আমি তোমাদের সরল, সুন্দর মনে সন্দেহের বীজ বপন করে দিতে চাই না—তা আমি দিতে পারব না। তাই এসেছি আমার কথা রাখতে। সেদিন দুঃখের জগতে তোমরা যখন আমায় আলো দেখালে, সেদিন যে কথা দিয়েছিলাম আজ আমার জয়গৌরবে সেকথা সত্য বলে প্রমাণিত করতে হবেই। আজ আমি যদি সেকথা না রাখি তা হলে তোমরা বিশ্বাস হারাবে আর তাতে ক্ষতি হবে দুঃস্থ ব্যক্তির। লোকের

দুঃখ দূর করবার ইচ্ছা থাকলেও টাকা দিয়ে দুঃখ দূর করতে আমি অপারগ। তাই আজ আমি আমার সেদিনের কথার দাম না রাখলে পরোক্ষে ঐ দুঃস্থদের ক্ষতি করব—তাদের আশার পথ বন্ধ করে দেব। সেজন্যই এসেছি এই টাকা নিয়ে—তোমাদের সেই পবিত্র মন বাঁচিয়ে রাখতে।

সুখেন আবেগে বলেছিল—বুঝেছি ভাই, আর বলতে হবেনা। তারপর সমীর বিদায় নেবার পর কল্পনাকে বলেছিল—আজ ওর মধ্যে প্রাণের ছবি দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি। ওর বুদ্ধি আর বিচার করবার ক্ষমতা আমাকে তৃপ্তি দিয়েছে।

কল্পনা সে টাকা গ্রহণ করলেও পরে ঐ টাকায় কয়েকটা বই কিনে সমীরকে দিয়েছিল। বলেছিল—'দাদা, এ তোমার দিদিভাইয়ের ছোট্ট উপহার। যদি না নাও আমি দুঃখ পাব।' সমীর গ্রহণ করেছিল সে উপহার।

আই, এ, পাশ করার পর সমীর পড়া ছেড়ে দিয়েছিল। সুখেন, কল্পনা, সুখেনের মা-বাবার শত অনুরোধেও আর পড়াশোনা করল না। সমীরের গান বাজনার ঝোঁক ছিল খুব বেশী। তার অনুপম কণ্ঠের গান সুখেনকে অনেক শুনিয়েছে। সেই গানের জন্যই পড়াশোনা ছেড়ে দিনরাত শুধু গানের চর্চা করতে লাগল। কলেজে পড়ার সময়ই ওর নাম হয়েছিল, রেডিওতে মাঝে মাঝে সিটিং পেত। সুতরাং খবরের কাগজের হকারি ছেড়ে গানের মাঝে বেশ কিছু টাকা রোজগার করছিল। সেই রোজগারের নেশায় পড়াশোনা ছেড়ে দিল। বলল—বেশী পড়ে আর কি হবে? তার থেকে এই ভাল। গানটা ভাল করে রেওয়াজ করে যদি সত্যকার শিখতে পারি তখন নামও হবে, টাকাও প্রচুর রোজগার করা যাবে।

কল্পনারা চলে গেছে শুনে সমীর কান্না চাপতে পারেনি, আর কল্পনারা চলে যাবার পর একমাত্র সেই ছিল সুখেনের প্রিয় বন্ধু। সমীরের তখন খুব নাম-ডাক, প্রায় সব জায়গা থেকে তার ডাক আসে। সেই ছোট্ট বস্তির ঘর ছেড়ে সে তখন একটা বেশ ভাল ফ্ল্যাট্ ভাড়া নিয়েছে

সমীর তার আদরের বোন নীলিকেও গান শেখাত, আর বলত—'দেখবি সুখেন, একদিন ও অনেক বড় শিল্পী হবে।' সুখেন ভাবে, আশার গতির বিরাম নেই, বিরামহীন ভাবে চলেছে যুগ হতে কত যুগান্তর, তার কোন পরিসমাপ্তি নেই। চির-চঞ্চল মনের মাঝে আশার রথ মানুষকে যেন আরো একটু গতিময় করে তোলে। মুমূর্ষু সন্তানের শেষ হাসির রেখাটির কাছেও পিতার বিরাট আশা তার ছেলে ভাল হয়ে যাবে। তার ছেলে বড় হবে—অনেক বড়! দ্বিধা, দ্বন্দ্বময় জগতে যদি আশার আলো না থাকত তাহলে মানুষ বেঁচে থাকতে পারত না। জীবনের চরমতম পরিণতির পরও মানুষ এই পৃথিবী ছেড়ে যায় না শুধু আশার প্রেরণায়। আলো-আঁধারি পথে মানুষ যেমন দিক্ হারিয়ে বুদ্ধি হারায়, আশাও তেমনি মানুষের জীবনের গতিকে বেগবান করে তাকে উন্মাদ করে তোলে। সমীর তার থেকে স্বতন্ত্র হতে পারে না। সমীরের আশা ছিল নীলিমাকে বড় করে তুলবে—অনেক বড় শিল্পী হবে সে। কিন্তু তার আশার পথে বিরাট পূর্ণচ্ছেদ এল। একদিন সুখেন সবে পড়তে বসেছে এমন সময় সমীর ঝড়ের মত তার ঘরে ঢুকেই বলল—সুখেন, তুমি শিগ্‌গির চল একবার আমাদের বাড়ী। মা আর নীলির খুব অসুখ।

তৎক্ষণাৎ সুখেন তার সঙ্গে তাদের বাড়ী গেল। দেখল অনেক ডাক্তার আর নার্স বাড়ীতে বসে রয়েছেন। সুখেন পৌঁছেই জিজ্ঞাসা করল—'কি অসুখ সমীর?' একজন ডাক্তার বললেন—পক্স্, স্মল পক্স্। আপনি টিকে নিয়েছেন ত?

তাঁর কথার উত্তর না দিয়েই সুখেন তাড়াতাড়ি যে ঘরে সমীরের মা আর নীলি শুয়েছিল সেঘরে ঢুকে পড়ল। নীলিমা তাকে দেখেই বলে উঠল—'তুমি এসেছ সুখেনদা, এবার আমি নিশ্চয়ই ভাল হয়ে যাব।' কিন্তু বৃথা তাকে আশ্বাস দিয়েছিল সুখেন। দুদিন রোগ ভোগ করার পর সমীরের মা ও নীলি কিছুক্ষণ আগে-পিছু চলে গেলেন তাদের সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে। মনে আছে সমীর প্রায় পাগলের মত কাঁদতে কাঁদতে ডাক্তারদের বলেছিল—'আপনারা বাঁচিয়ে দিন ডাক্তারবাবু।

যত টাকা লাগে আমি দেব, আমার সমস্ত কিছুর বিনিময়ে ওদের বাঁচান।' কিন্তু না, ভাগ্য চিরকালই জিতে এসেছে।

মা আর নীলিমার চিতার দিকে তাকিয়ে সেদিনের সমীরের মুখ সুখেন কোনদিন ভুলবে না। সবশেষ হয়ে যাবার পর সুখেন তার গায়ে হাত দিয়ে বলেছিল—'বাড়ী চল সমীর।' সমীর তখন তারদিকে এক বোবা দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল, যেন কিছুই সে বুঝতে পারছে না। সুখেন অনেক চেষ্টা করেও সমীরকে তাদের বাড়ী আনতে পারেনি। বলেছিল—না সুখেন, যেখানে আমার মা, আমার নীলির আত্মা আছে সেখান ছেড়ে আমি কোথাও যেতে পারব না। এ বাড়ীর বাতাসে আছে তাদের স্মৃতি। এ ছেড়ে আমি কোথাও যেতে পারব না—আমায় ও কথা বলো না সুখেন।

তারপর কিছুদিন সুখেন ওকে বাড়ীতে গিয়েও দেখতে পায়নি। একদিন অনেক রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করার পর দেখা হল। দেখল মদ খেয়ে টলতে টলতে সমীর বাড়ী এল। সুখেনকে দেখে বলল—'তুই ?' কিছুক্ষন পর বলল—সুখেন, আমি মদ ধরেছি। গান বাজনা একদম ছেড়ে দিয়েছি রে। মদ খেয়ে খেয়ে ওদের আমি ভুলতে চাই।

তারপরেও কয়েকদিন সমীরের সঙ্গে দেখা হয়েছে। সেদিন রাস্তায় হঠাৎ দেখা হয়ে গেল। দেখল প্রায় পাগলের মত জামা-কাপড় পরে রাস্তা দিয়ে টলতে টলতে আসছে সে। সুখেনকে দেখেই থমকে দাঁড়াল। বলল—আট আনা পয়সা দিবি সুখেন, মদ খাবো। দেখ সবাই আমাকে ছেড়ে গেল কিন্তু মদ আমাকে ছাড়বে না।

সুখেন তাকে অনুরোধ করেছিল মদ ছেড়ে দেবার জন্য, আবার গানের মাধ্যমে বড় হবার জন্য। উত্তরে বিচিত্র হাসি হেসে সমীর বলেছিল—বড় হবো ? না সুখেন না, সে আশা আমার ওদের সঙ্গে সঙ্গে সেদিন চিতার আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। আমার আর কি আছে ? কেইবা আছে ? কেউ না, কেউ না। শুধু মাঝে মাঝে তোর আর দিদিভাইয়ের কথা মনে করে দুঃখ হয়। ভাবি, ভাগ্যে দিদিভাই চলে

গেছে, না হলে সে খুব আঘাত পেত। বোধ হয় সে বুঝতে পেরেছিল, বোধ হয় সে জানত।

মানুষের দুঃখ যখন বাঁধ মানতে চায় না, দুঃখ যখন মানুষের শিরায় শিরায় অনুরোণিত হয় তখন সে নিজেকে কোন অবলম্বনের মধ্যে রেখে ভুলিয়ে রাখতে চায়। কত বিচিত্রতার মধ্যে মানুষের হাসি কান্নার পাল্লা! একদিকে হয়ত একজনের আনন্দের সুর লহরীতে তার প্রাণ-মন পূর্ণ, আর অন্যদিকে আর একজনের জীবন দুঃখের করুণ রেখায় জীবনের পথকে করে বিধ্বস্ত। এই হয়, এই জগতের নীতি। যেখানে আনন্দের অবর্ণনীয় শিহরণ আবার তারই পাশে করুণ জীবনের প্রতিচ্ছবি। সংসারের রঙ্গালয়ে কত বিচিত্র নাটকই না অভিনয় হচ্ছে। সমীরের এই জীবন সুখেনকে ব্যথা দেয়, কিন্তু সে নিরুপায়। সমীরকে বাঁচাবার কোন পথই সে জানে না।

ভাবতে ভাবতে সুখেন তন্ময় হয়েছিল তাই হঠাৎ ঘড়ির শব্দে তার সে ধ্যান ভাঙ্গল। দেখল রাত দুটো বাজে। চমকে উঠল সুখেন। এতরাত হয়ে গেল! বাবা যদি জানতে পারেন তাহলে খুব রাগ করবেন। তাড়াতাড়ি চোখ মুছে শুয়ে পড়ে সুখেন। কিন্তু তখনও তার কানে ভেসে আসে রাস্তার বোধ হয় কোন এক ফুটপাতে বসে সমীর গাইছে—'দুঃখ দিয়ে কেন বেদনার অবসান করলে না, হে নিঠুর দেবতা?'

জীবন যাত্রার পিচ্ছিলপথে সমীর দ্রুত চলেছে নীচের দিকে, হয়ত আর কোন দিন সে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না, পৌঁছাবে না লক্ষ্য নিশানায়।

॥ ৪ ॥

সেদিন কলেজ থেকে ফিরবার পথে ঝিপ্ ঝিপ্ বৃষ্টি পড়ছিল। ইচ্ছা করেই সুখেন সেদিন হেঁটে বাড়ী ফিরছিল। বৃষ্টির মধ্যে বেড়াতে তার খুব ভাল লাগে। তাই অনেক দিন পর বৃষ্টি পড়তে দেখে সে খুব খুসী মনে হেঁটে বাড়ী আসছিল। রাস্তাটা বৃষ্টির জন্য ফাঁকা হয়ে গেছে, মাত্র দুচারজন লোক হেঁটে চলেছে। এমন সময় সুখেনের কানে ভেসে এল একটা আর্তনাদ। তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে দেখল একজন লোক রাস্তায় পড়ে চিৎকার করছে। বোধ হল তার পাশ দিয়ে একটু আগেই যে গাড়ীটা তীরবেগে ছুটে চলে গেল সেটাই বোধ হয় একে ধাক্কা দিয়ে চলে গেল। মোটরের আরোহী—যুগের অগ্রগতিতে বিশ্বাসী. তার দাঁড়াবার, ফিরে তাকাবার সময় কোথায়? তাই কেউ চাপা পড়ল কিনা, একটা অবহেলিত প্রাণ নষ্ট হল কিনা, তা দেখবার মত অবকাশ তার নেই। ধন্য তাদের পন্থা, তাদের অগ্রগতি! সুখেন তাড়াতাড়ি তাকে কোলে তুলে নিল। ইতিমধ্যে আরও দু'একজন যাঁরা যাচ্ছিলেন তাঁরাও ওর কাছে দাঁড়িয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করলেন—কি হয়েছে? কিন্তু উত্তর দেবার সময় নেই, আর তারাও জানে এ প্রশ্নের উত্তর তখন দেওয়া সম্ভব নয়। তাড়াতাড়ি তাকে কাছের ডিসপেনসারীতে নিয়ে গেল সুখেন। ডাক্তারবাবু পরীক্ষা করে দেখলেন আঘাত খুব বেশী নয়, তবে কপালের কাছে আর হাতের কয়েকটা স্থান থেকে রক্ত পড়ছে। তাড়াতাড়ি ব্যাণ্ডেজ করে দিলেন তিনি। লোকটি তখনও ভয় কাটিয়ে

উঠতে পারেনি। ইতিমধ্যে বাইরে বেশ ভীড় জমেছে। তারা উত্তেজিত স্বরে নানা কথাবার্তা বলছে শোনা গেল। একজন বললেন—উঃ, কি ভদ্রলোক! দামী গাড়ী চড়ে এরা মানুষকে কুকুরেরও অধম মনে করে। কোন দাম নেই মানুষের জীবনের এদের কাছে। গরীব হওয়া যেন মহাপাপ!

সুখেন ভদ্রলোকটিকে তাঁর বাড়ীর কথা জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন—দূরে নয়, কাছেই বাড়ী। আমি বুঝতে পারিনি পিছনে গাড়ী আসছে।

সুখেন বলল—আপনি এখন একটু সুস্থবোধ [redacted] তো? ভদ্রলোক মাথা নেড়ে জানালেন-হাঁ। সুখেন তখ[redacted]ছা, আপনি একটু বসুন আমি ট্যাক্সি নিয়ে আসছি। বাড়ী পয[redacted] সঙ্গে থাকব।

ভদ্রলোক ট্যাক্সির কথা শুনেই বললেন—না, না, ট্যাক্সি ডাকতে হবে না। আমি এখন বেশ ভাল বোধ করছি, হেঁটেই যেতে পারব।

কিন্তু সুখেন তাঁর কথায় কর্ণপাত না করে নিজে একটা ট্যাক্সি ডেকে আনল। তারপর ভদ্রলোকের আপত্তি সত্ত্বেও তাঁকে একরকম জোর করে ট্যাক্সিতে উঠিয়ে নিজেও উঠে বসল। তিনি যে ঠিকানা দিয়েছিলেন সেখানে গিয়ে দেখা গেল সরু রাস্তায় ট্যাক্সি ঢুকবে না। বস্তি অঞ্চলের গলিতে কোনদিন ট্যাক্সি ঢুকতে পারে না, কারণ মোটর চড়া সেখানকার বাসিন্দাদের কাছে স্বপ্ন! সুখেন বড় রাস্তা থেকেই ট্যাক্সি ছেড়ে দিল। ভাড়াটা সেই মিটিয়ে দিল। ভদ্রলোক কুণ্ঠিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। সুখেন বুঝল ভাড়া দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তাঁর সঙ্গে তাঁদের বাড়ীতে এসে দেখল মূর্তিমান দারিদ্র্য তার সব চিহ্ন নিয়ে সেখানে বর্তমান। দেখলেই বোঝা যায় তাঁরা কি অবস্থার মধ্যে আছেন। ভদ্রলোক বাড়ী ঢুকেই উদ্বিগ্ন হয়ে একটা ঘরে গেলেন। সুখেনও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে গেল। দেখল একজন ষোড়শী বিছানায় শুয়ে ছট্‌ফট্ করেছে আর মাঝে মাঝে যন্ত্রণা-কাতর স্বরে তার অসহ্য কষ্টের কথা জানাচ্ছে। সুখেন জিজ্ঞাসা করে কি

হয়েছে তার? ভদ্রলোক করুণকণ্ঠে বললেন,—কি আর বলব বাবা, আজ মাসখানেক অসুখ করেছে। প্রথম প্রথম সামান্য জ্বর মনে করেছিলাম, কিন্তু আজও জ্বর ছাড়ল না। অদৃষ্টে কি আছে কে জানে!

সুখেন জিজ্ঞাসা করল—ডাক্তার দেখিয়েছেন? কি বলেন তাঁরা?

—'ডাক্তার?' বিচিত্র হাসি হেসে বললেন ভদ্রলোক। সুখেনের মনে হল এই একটি কথায় ভদ্রলোক যেন তাঁর অন্তরের অভিযোগ জানা[redacted]াজকের সভ্য জগৎকে। একটু থেমে তিনি বললেন [redacted]া, আজকের দুনিয়ায় মানুষের মানদণ্ড অর্থ। যার [redacted] নেই সে মানুষ নয়, হতে পারে না বা হওয়া উচিত নয়। আমার একমাত্র মেয়ে, এ জীবনের একমাত্র সম্বল ঐ অপর্ণা। প্রথম প্রথম সামান্য জ্বর মনে করে নিজেও অবহেলা করেছি আর গরীব পিতার সামর্থ্যের দিকে তাকিয়ে মেয়েও আপত্তি করেছে ডাক্তার দেখাতে। কিন্তু দু'সপ্তাহ পরেও যখন জ্বর ছাড়ল না তখন আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না। তোমাকে লজ্জার কিছু নাই, তুমি আজ আমার জন্য যা করেছ অতি বড় আত্মীয়ও তা করে না। সভ্যজগতে সে নিয়ম শুধু লিখিত বইএর মধ্যে বা লোকের মুখেই থাকে। আমার অবস্থা তুমি বুঝতেই পারছ। তাই সামান্য যা কিছু ছিল তা দিয়ে ডাক্তারের ফী আর ওষুধ জোগালাম। যখন তাও গেল তখন থালাবাটি বিক্রী করেও চিকিৎসা করালাম। কিন্তু অসুখ সারল না, ডাক্তার বলল, সময় নেবে। তারপর হাতে একটা পয়সা না থাকায় ডাক্তারের ফী জোগাতে পারলাম না। অনুনয় করে তাঁর পায়ে ধরে বললাম—ডাক্তারবাবু যতদিন সামর্থ্য ছিল ফীয়ের টাকা দিয়েছি, আজ আমি নিরুপায়। একমাত্র মেয়েকে কোনরকমে সারিয়ে দিন, আপনার ফী পরে যেমন করে পারি শোধ করব। কিন্তু তার উত্তরে কি বলল জান? বলল,—'ধারে ডাক্তার পাওয়া যায় না, টাকা না

থাকে হাসপাতালে যাও। আমি দাতব্য প্রতিষ্ঠান খুলিনি।' তাই আজ বার হয়েছিলুম বাবা কয়েকটা টাকার জন্য ভিক্ষা করতে। মেয়েকে আজ দু'দিন সামান্য বার্লিও দিতে পারিনি। তাই পাগলের মত লোকের কাছে হাত পেতেছি, কিন্তু কেউ শোনেনি। বড়লোকের বাড়ীর দ্বারোয়ান চোখ রাঙিয়ে রাস্তা দেখিয়েছে, সাধারণ লোক উপদেশ দিয়েছে। কিন্তু একটা পয়সাও দেয়নি কেউ। চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে ভদ্রলোকের। একটু সামলে নিয়ে বললেন—বাবা, লোকে বলে গরীবের কেউ না থাকলেও ভগবান আছেন। কিন্তু আমার মনে হয়—না তাও নেই। ভগবানও গরীবের দুঃখে বিদ্রূপ করেন। আর তাই বোধ হয় আজ গাড়ীর ধাক্কা দিয়ে আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন আমার স্থান কোথায়! না হলে আজ যাদের বাড়ীর দ্বারোয়ান চোখ রাঙিয়ে তাড়িয়ে দিল সেই তাদেরই একজনের গাড়ীর ধাক্কায় রাস্তায় পড়ে থাকব কেন? সত্যি যদি বিচার থাকত............

সুখেন তাঁকে থামিয়ে দিল। বলল,—'বুঝেছি। কিন্তু এখনই এঁকে ডাক্তার দেখান প্রয়োজন। আপনি ততক্ষণ ওঁর কাছে বসুন, আমি ডাক্তার নিয়ে এখনই আসছি।' রাস্তায় বেড়িয়ে সুখেনের মনে পড়ে তার হাতে আর বেশী পয়সা নেই। বাড়ীও এ অবস্থায় যাওয়া সম্ভব নয়। হঠাৎ চোখে পড়ল তার হাতের আংটির দিকে। মা তার জন্মদিনে দিয়েছিলেন এই আংটি। হাত থেকে খুলে নিল আংটি, কিন্তু দ্বিধা জাগল। মায়ের স্মৃতি এভাবে নষ্ট করে ফেলবে? কিন্তু তখনই তার মনে পড়ে যায় মায়ের উপদেশ—দুঃখীর দুঃখে সাধ্যমত চেষ্টা সে যেন অতি-অবশ্য কর্তব্য মনে করে। আংটিটি মাথায় ঠেকিয়ে মায়ের উদ্দেশে বলল—'মা, আজ আশীর্বাদ কর। তোমার সুখেন যেন এই আংটির স্মৃতি থেকে আরও বড় স্মৃতি রাখবার মত কিছু করতে পারে। আমার সাফল্যই হবে তোমার আশীর্বাদ।' আংটি বিক্রী করে ডাক্তার নিয়ে আসতে কিছু সময় লাগল। রোগী দেখে ডাক্তার বললেন,

—'উপযুক্ত সেবার প্রয়োজন। আরও আগে ডাক্তার দেখান উচিত ছিল।' সুখেনের দিকে তাকিয়ে বললেন,—'আপনাদের কেউ সে দায়িত্ব নিতে পারবেন কি? যদি তা নিতে না পারেন তাহলে অবিলম্বে এঁকে হাসপাতালে নিয়ে যান।'

ভদ্রলোক ব্যগ্রস্বরে বললেন—বাড়ীতে আমি একা। ঠিক ভরসা রাখতে পারছি না। কিন্তু হাসপাতালে কি ভর্তি করবে? সেখানে সিট্ পাওয়া যে খুবই মুস্কিল!

ডাক্তারবাবু বয়সে তরুণ। তিনি বললেন,— আপনারা রাজী থাকলে আমি ব্যবস্থা করে দিতে পারি। মেডিকেল কলেজে আমার জানাশোনা আছে।

সুখেন ও ভদ্রলোক একসঙ্গে সম্মতি জানালেন। সুখেন তৎক্ষণাৎ ট্যাক্সি ডেকে আনল। তারপর তিনজনে মেয়েটির প্রায় সংজ্ঞাহীন দেহটি তুলে নিয়ে মেডিক্যাল কলেজ গেলেন। ডাক্তারবাবুর এক বন্ধু হাউস-ফিজিসিয়ান ছিলেন এবং তাঁর চেষ্টায় ভর্তি করতে বিশেষ বেগ পেতে হল না। ভর্তি করে ফিরবার সময় ডাক্তারবাবুকে তাঁর চেম্বারে নামিয়ে দিয়ে সুখেনের সঙ্গে ঐ ভদ্রলোক চলে এলেন বাড়ীতে। ভদ্রলোক কৃতজ্ঞতায় তখন ভাষাহীন, শুধু তাঁর চোখের দৃষ্টি বুঝিয়ে দিচ্ছিল তাঁর অন্তরের কৃতজ্ঞতা। সুখেন বলে,—আজ অনেক রাত হয়ে গেল, আমাকে এবার বাড়ী ফিরতে হবে। হয়ত এতক্ষণ বাবা অস্থির হয়ে উঠেছেন। আমি········

ভদ্রলোক তাকে কথা শেষ করতে না দিয়েই অধীর স্বরে বললেন,—হ্যাঁ, হ্যাঁ, বাবা, আজ সত্যিই অনেক রাত হয়েছে। তোমাকে যে কি বলব ভেবে পাচ্ছি না। যদি বয়সে বড় হতে তাহলে তোমাকে প্রণাম করতাম। হয়ত প্রণাম করাই আমার উচিত, শুধু সংকোচে করতে পারছি না। আমার জন্য আজ তুমি যা করলে············

সুখেন তাড়াতাড়ি তাঁকে থামিয়ে নিয়ে বলল, আমি তেমন কিছুই করিনি, মানুষ মানুষকে যতখানি সাহায্য করে আমি ঠিক ততটুকুই করতে চেয়েছি মাত্র। এর জন্য আপনার কুণ্ঠিত হওয়া উচিত নয়।

ভদ্রলোক উত্তর দিলেন— মানুষ ? তা হবে বাবা। তবে আজ তোমায় বলতে বাধা নেই মানুষের ব্যবহারে, তাদের নিষ্ঠুর কঠিন আঘাতে আমি মনুষ্যত্বের উপর বিশ্বাস হারিয়েছিলাম, আজ আবার সে বিশ্বাস তোমার ব্যবহারে খুঁজে পেলাম।

সুখেন বলল,—অনেক রাত হয়ে গেছে, আজ আমি চলি। কাল আমি আবার আসব। তবে কাল কলেজ থেকে ফিরে আপনার মেয়েকে দেখে তারপর আপনার কাছে আসব। আপনি আজ এই টাকা ক'টা রাখুন,: কোন লজ্জা করবেন না।

ভদ্রলোকের আপত্তি সত্ত্বেও সুখেন তার হাতে টাকাগুলো একরকম জোর করেই গুঁজে দিল, তারপর বাড়ীর পথে পা বাড়াল। পিছন ফিরে সে সময় যদি সুখেন তাকাত তা হলে দেখতে পেত একজোড়া কৃতজ্ঞ, সজল চোখ তার চলার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে আর তার চোখের জল যেন তার অন্তরের আশীর্বাদ হয়ে ঝড়ে পড়ছে।

এদিকে বাড়ীতে দীনেশবাবু ডাক্তাবাবুর সাথে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন। রাত হয়েছে, কোনদিন সুখেন বাড়ী ফিরতে রাত করে না অথচ আজ সে এখনও ফেরেনি দেখে দীনেশবাবু খুব চঞ্চল হয়ে পড়েছেন। দীনেশবাবু ভাবছিলেন হয়ত তার কোন বিপদ হয়েছে, না হলে এত রাত ত সে কোনদিন করে না। আর তার মা মারা যাবার পর সিনেমা-থিয়েটারে যায় না, নিশ্চয় কোন অ্যাক্সিডেণ্ট্ হয়েছে তার।

অ্যাক্সিডেণ্টের কথা চিন্তা হওয়া মাত্র তিনি যেন একরকম লাফিয়ে উঠে বলে উঠলেন,—ডাক্তার, তার কোন অ্যাক্সিডেণ্ট্ হয়নি ত ?

ডাক্তারবাবুও একথা ভাবছিলেন। তিনি প্রথমটা চমকে উঠলেও নিজেকে কোনক্রমে সামলে বললেন—না, না, তা নিশ্চয়ই নয়। বোধ হয় বৃষ্টির মধ্যে কোন বন্ধুর বাড়ী আট্কা পড়েছে।

কিন্তু দীনেশবাবু খুবই চঞ্চল হয়ে বললেন,—না ডাক্তার। একবার হাসপাতালগুলো ফোন করে দেখা দরকার। কি জানি যদি সত্যিই সেরকম কিছু হয় ? রাত দশটা বাজে, এত দেরী ত সে কোনদিন করে না। আমার মনে হচ্ছে............

তাঁর কথার মাঝেই সুখেন ঘরে ঢুকল। বৃষ্টিতে সমস্ত শরীর ভিজে গেছে, তার উপর এতক্ষণ দৌড়াদৌড়িতে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে। তাকে দেখেই দীনেশবাবু বলে উঠলেন—এতক্ষণ কোথায় ছিলি? বৃষ্টিতে ভিজে একেবারে চুপসে গেছিস দেখছি। তোর আচ্ছা কাণ্ডজ্ঞান ত? আমি এতক্ষণ চিন্তা করে মরি আর তোর বাড়ী ফেরার কথা খেয়াল নেই?

সুখেন বলল—তোমাকে সব বলব বাবা। আজ যা হয়েছে বা যা করেছি সব বলব। আগে জামা-কাপড় ছেড়ে আসি, তারপর সব বলব।

একের পর এক সব ঘটনা বলবার পর বলল—বাবা, তুমি রাগ করো না। মায়ের দেওয়া আংটিটি, আমি বিক্রি করে ফেলেছি। আমার কাছে তখন টাকা না থাকায় আর বাড়ী আসবার সময়ও না থাকায়, বিক্রী করতে বাধ্য হয়েছি।

সব শুনে দীনেশবাবু তাকে জড়িয়ে ধরে বললেন,—আমি একটুও রাগ করিনি সুখেন। আজ তুই যা করেছিস তাতে নতুন করে তোকে আশীর্বাদ করতে হয় না, তবু আমি আশীর্বাদ করে বলছি, চিরদিন তোর মন যেন এইরকম থাকে। পরের দুঃখে যে হাসিমুখে এগিয়ে যায় দুঃস্থের কষ্ট যে লাঘব করতে চায় সেইত মানুষ। শুধু খেয়ে পড়ে বেঁচে থাকার সার্থকতা কি?

ডাক্তারবাবু বললেন,—সুখেন, মায়ের আংটির স্মৃতির থেকে বড় স্মৃতি, আরও শত-সহস্র গুণ বড় স্মৃতি তোমার থাকবে—তোমার আজকের, এই ব্যবহারে। আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি তোমার মা বেঁচে থাকলে যে রকম সুখী হতেন তার থেকেও বেশী আনন্দ পাচ্ছেন তোমার এই আচরণে। তাঁর শিক্ষা যে ব্যর্থ হয়নি তাই দেখে আজ তিনি তৃপ্ত। আমিও তোমাকে আশীর্বাদ করছি। কাল যখন তুমি হাসপাতালে যাবে আমাকে ডেকে নিও, আমিও তোমার সঙ্গে গিয়ে মেয়েটিকে দেখে আসব।

ক্লান্ত সুখেন সেদিন বিছানায় শোওয়া মাত্র ঘুমিয়ে পড়ল। অনেকদিন পর বড় তৃপ্তিতে বড় আরামে ঘুমিয়ে পড়ল সে।

॥ ৫ ॥

পরের দিন কলেজ থেকে ফিরে ডাক্তারবাবুকে সঙ্গে নিয়ে সে যখন মেডিক্যাল কলেজ প্রাঙ্গণে প্রবেশ করল তখন দিনান্তের শেষে সমস্ত আকাশ রক্তিম বর্ণের আলোয় ছেয়ে গেছে। সুখেনের মনে হল এ যেন তার জীবনের পুণ্যব্রতের উদ্দেশ্যে দেবতার আশীর্বাদ! ভিজিটার্স'দের আনাগোনায় সমস্ত প্রাঙ্গণটি ভর্তি হয়ে গেছে। ফল, খাবারের বাক্স, দুধের বোতল নিয়ে চিন্তাক্লিষ্ট মুখে কেউ চলেছে দ্রুতপদে তার আত্মীয়ের কুশল আনতে, আবার কেউ ফিরে আসছে আনন্দ-উজ্জ্বল মুখে। দেখে তার মনে হল এ যেন সংসার-জীবনের জীবন্ত চিত্র। কেউ আসছে, কেউ যাচ্ছে। যারা আসছে তারা যেন নূতনের প্রতীক, আর যারা যাচ্ছে তারা পুরাতনের স্মৃতি বহন করে মন্থর।

অপর্ণার কাছে যখন পৌঁছাল তখন ওঘরে কয়েকজন ভিজিটার্স্ অপর রোগীর কুশল প্রশ্ন করছে আর অপর্ণা একাকী সেদিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। কাল ভর্তি করবার সময় জেনেছিল এই মেয়েটির নাম অপর্ণা, আর তার বাবার নাম ললিত রায়। অপর্ণার কাছে গিয়ে প্রশ্ন করল,—কেমন আছ? আজ একটু ভাল বোধ করছ ত?

অপর্ণা সুখেনকে দেখতেই তার সমস্ত মুখ আনন্দে, খুসীতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে সকাল থেকেই এই গৌরবর্ণ ছেলেটির

আসার পথ চেয়েছিল। ছেলেটির পরিচয় সে জানে না, কিন্তু জানে এ তাদের পরিবারের হিতাকাঙ্ক্ষী। সুখেনের প্রশ্নের উত্তরে অপর্ণা মাথা হেলিয়ে সম্মতি জানাল।

সুখেন ডাক্তারবাবুকে দেখিয়ে বলল,—ইনি আমার কাকু হন। খুব বড় ডাক্তার। তোমাকে দেখতে এসেছেন।

ডাক্তারবাবু এগিয়ে এসে তাকে পরীক্ষা করে বললেন—ভয় নেই মা, তুমি শিগ্‌গির ভাল হয়ে যাবে।

সুখেন তার কাছে কয়েকটা লেবু রাখল। তারপর আবার তাকে অভয় দিয়ে বলল,—ভয় নেই, তুমি শিগ্‌গির ভাল হয়ে যাবে। আমি প্রতিদিন একবার এসে তোমার খবর নিয়ে যাব। তোমার বাবার খবরও আমার কাছে পাবে, কোন চিন্তা করো না।

ডাক্তারবাবু নার্সদের বলেন ওর প্রতি একটু লক্ষ্য রাখতে। তারপর দুজনে অপর্ণার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গেটের কাছে এলে সুখেন ডাক্তারবাবুকে বাড়ী যেতে বলে। সে অপর্ণার বাবার কাছে খবর দিয়ে বাড়ী ফিরবে জানালে ডাক্তারবাবু বাড়ীর দিকে রওনা হন, আর সুখেন চলে ললিতবাবুর কাছে।

সেই বস্তির কাছে আসতেই সুখেন শুনতে পায় এক ভিখারী গান গাইছে—'সবারে দিয়েছ ঘর আমাকে দিয়েছ শুধু পথ।' তার করুণ কণ্ঠস্বর আর গানের ভাষায় সকলে মুগ্ধ হয়ে তার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। বিশ্ববাসীর কাছে ভিখারীর সেই আবেদন উপেক্ষা করে চলে যায় কে ? ক্ষণেকের জন্যও দাঁড়াতে হয়, থামতে হয় তাকে। গানের ভাষা সুখেনকে বেশ আঘাত দেয়। ভাবে সত্যিই এই এক কলকাতা শহরেই কত লক্ষ লক্ষ লোক ফুটপাথে আশ্রয় নিয়েছে। ধনীর প্রাসাদের জন্য, তার সখের বাগানবাড়ীর জন্য কত জায়গা তারা ব্যবহার করছে, অপচয় করছে। আর এদিকে এই লক্ষ লক্ষ গৃহহীন সহায়-সম্বলহীন লোকের একমাত্র আশ্রয়স্থল ফুটপাথ অথবা লোকের গাড়ী-বারান্দা। গ্রীষ্মের ঘামঝরা রৌদ্র, বর্ষার মুষলধারে পড়া বৃষ্টি, হেমন্তের হিমেল হাওয়া, আর শীতের হাড়কাঁপান সবটুকু শীত সহ্য

কয়া অসাধ্য হলেও এদের উপায় নেই কোন। এরা সত্যিই প্রকৃতির সন্তান!

দেখতে দেখতে সে ললিতবাবুর বাড়ীতে এসে পড়ে। তার ডাকে বাইরে বার হয়ে আসেন ললিতবাবু লণ্ঠন হাতে। সুখেনকে দেখে উল্লসিত হয়ে উঠেন। তার হাত ধরে ঘরের মধ্যে নিয়ে আসেন, তারপর জিজ্ঞাসা করেন অপর্ণার কথা।

সুখেন বলে,—তার খবর দিতেই এলাম। সে আজ একটু ভাল আছে। আপনি ভাববেন না, আমার এক ডাক্তারকাকু আজ ওকে দেখতে গিয়েছিলেন। আপনার কোন চিন্তা নেই, আমি থাকতে তার কোন কষ্ট হবে না।

ললিতবাবু বললেন—তা আমি জানি বাবা। কাল থেকে তোমার সেবা, তোমার ব্যবহার দেখে অবাক হয়ে ভাবছি, এত বড় মন তোমার কি করে হল, কার কাছে পেলে এই সুমহান শিক্ষা? আমার মনে হয় তোমার মা-বাবার কাছেই পেয়েছ এই প্রেরণা, এই সুমহান শিক্ষা। তাঁদের চরণে আমি প্রণাম জানাচ্ছি। এই হচ্ছে বাবা সত্যিকারের শিক্ষা, এরই জন্য পাঠাভ্যাস। পুরাতন ভারতে এই ছিল শিক্ষা, এই ছিল দীক্ষা। আর আজ শিক্ষার মাপকাঠি ডিগ্রী। দক্ষতা থাকুক বা না থাকুক, ডিগ্রী থাকলেই হোল। কিন্তু কাল থেকে তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে, না বাবা?

কষ্ট?—সুখেন উত্তর দেয়। কষ্ট কি বলছেন? মিথ্যা আপনি সংকোচ করছেন। ধরুন না কেন, অপর্ণা আমার বোন। আমার নিজের বোন নেই, কিন্তু সে থাকলে তার অসুখে কি আমি চুপ করে বসে থাকতাম? আমি ত তার বেশী কিছুই করতে পারিনি। আর আমার নাম সুখেন। আপনি আমার বাবার বয়সী, নাম ধরে ডাকলে খুসী হব।

ললিতবাবু কিছুক্ষণ অবাক হয়ে চেয়ে থাকেন এই কিশোর ছেলেটির দিকে। তার কথায় মুগ্ধ হয়ে বলেন,—তাই হবে সুখেন। আর তোমায় ওসব কথা বলে লজ্জা দেব না। আজ তোমায় দেখাব

আমার সারা জীবনের সঞ্চয় আর শোনাব আমার জীবনকথা। তোমার কোন আপত্তি নেই তো সুখেন ?

সুখেন তৎক্ষণাৎ বলল—না, না, আমার কোন আপত্তি নেই ?

ললিতবাবু ঘরের এককোণে রাখা একটা ভাঙ্গা বাক্স খুলে বার করে আনলেন কতকগুলো ছবি। সুখেনের হাতে ঐ ছবিগুলো দিয়ে বললেন,--এই আমার সারা জীবনের একমাত্র সঞ্চয় !

সুখেন দেখে সুন্দর হাতে এক দক্ষ শিল্পীর আঁকা ছবি। কয়েকটা ছবি বছরের বয়সে মলিন, কিন্তু তারমধ্যেও যেন আত্মপ্রকাশ করেছে সুন্দরের পূজারী মনের ছবি। কয়েকটা ছবি, তার মনে হল সেগুলি সবে আঁকা, আজকের দুঃস্থ জনগণের প্রতিচ্ছবি। একটা ছবিতে দেখল আঁকা রয়েছে একটি লোকের কাঁধে চেপে রয়েছে একটি ছোট্ট মেয়ে। আর লোকটি স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে একটা প্রাসাদের দিকে। যেন ঐ ছবির লোকটি ধনীর প্রাসাদের দিকে তাকিয়ে বলছে,—আমার বুকের রক্তে-স্বেদে তোমার সৃষ্টি। আমার কাছে তোমার ঔদ্ধত্য শোভা পায় না, নীচু কর তোমার ঐ গর্বিত সৌধচূড়া—নতুবা ধ্বংস হয়ে যাবে।

ছবিটি সুখেনকে মুগ্ধ করেছে দেখে ললিতবাবু বললেন,—ছবিটা তোমাকে দিলাম সুখেন। আমার তো আর কিছুই নেই তবু তুমি যদি এই ছবিটা নাও তাহলে আমি তৃপ্ত হব। মনে করব আমার আঁকা সার্থক হয়েছে।

সুখেন তার দিকে তাকিয়ে বলল,—আপনার আঁকা ছবি ? আপনি আর্টিস্ট ?

ললিতবাবু বললেন—আর্টিস্ট আমাকে বলা চলে কিনা জানি না, তবে ছবিগুলো আমিই এঁকেছি. আর্ট কি আমি জানিনা, তার সংজ্ঞাও আমি জানি না। তবে আর্ট স্কুলে কিছুদিন পড়েছি, আর আঁকতেও ভাল লাগে। তাই আঁকি আমি। জানি না ছবিতে রং, তুলির ব্যবহার ঠিক হয়েছে কিনা, তবে এই ছবি আঁকা আমার জীবনের একমাত্র সখ। সখ বললাম বটে, তবে আজ সখ না বলে আমার ব্যবসা বলা ভাল। শোন, সুখেন. এই ছবি আঁকাই আমার জীবনে একদিন

সাধনা ছিল। এই শিল্পই আমাকে স্বর্গে তুলেছে; আবার এই শিল্পই আমাকে নিঃস্ব করেছে। আমি ছোট বেলায় পড়াশোনার বদলে ছবি আঁকা বেশী পছন্দ করতাম। ছবি আঁকা যেন আমার নেশা হয়ে দাঁড়াল। কি করে এই নেশা আমায় পেয়ে বসল জান? আমার একদাদা আমাকে একবাক্স রং আর তুলি একবার উপহার দেন আর তিনিই আমাকে ছবি আঁকতে শেখান। সে দাদা একজন নামকরা শিল্পী—নাম বললে অনেকে আজ তাঁকে চিনতে পারবেন, তাই তাঁর নাম আমি বলব না। তিনিই আমার আঁকা ছবির একমাত্র প্রেরণাদাতা। শিক্ষাগুরুও তাঁকে বলতে পার। কিন্তু সেই আঁকার নেশাই আমার জীবনে দুষ্টগ্রহ। বাবার অবস্থা খুব ভাল ছিল, সুতরাং টাকার কষ্ট কি তা ছোট-বেলায় জানতে পারিনি। বোধ হয় জানা সে সময় সম্ভবও ছিল না। একে অবস্থা ভাল, তায় বাড়ীর বড়ছেলে হিসেবে খুব আদরেই মানুষ হয়েছি। বিচিত্র হেসে বললেন,—বোধ হয় সেজন্যই তার ঋণ শোধ হচ্ছে আজ! বাড়ী ছিল ঢাকা শহরে। শহরের কোলাহল হতে বিশ্রাম নেবার জন্য পল্লী অঞ্চলেও একটা বাড়ী ছিল। মাঝে মাঝে যখন ঐ পল্লী অঞ্চলে যেতাম, তখন ঐ অঞ্চলের শোভা আর নদীর স্রোত দেখতে খুব ভাল লাগত। একমনে ছবি আঁকতে আঁকতে আমি সব কিছু ভুলে যেতাম। আগেই বলেছি পড়াশোনা আমার ভাল লাগত না। তাই এণ্ট্রান্স্ পাশ করতে পারলাম না। কিন্তু তার জন্য আমার তখন বিন্দুমাত্র দুঃখ ছিল না, দ্বিগুণ উৎসাহে ছবি আঁকায় মন দিলাম। বাবার শত চেষ্টাতেও পড়াশোনা আর করলাম না। সকলেই হাল ছেড়ে দিলেন, আমিও ছবি আঁকাতেই নিজেকে নিয়োগ করলাম। হাত আমার ভালই ছিল, তায় দিনরাত আঁকার সাধনায় বেশ ভাল ছবি আঁকতে পারতাম। বাবা আমার ইচ্ছায় কলকাতার আর্ট স্কুলে ভর্তি করে দিলেন। অল্পদিনেই খুব নাম করলাম। কিন্তু সেদিন স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি ছবি আঁকাকে কোনদিন একমাত্র অবলম্বন করতে হবে দু'মুঠো অন্নের জন্য! আর্টস্কুলে পড়ার সময় বাবা আমার বিয়ের ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু আমি সে বিয়েতে মত দিলাম না। আমি বিয়ে

করলাম এক অন্য জাতের মেয়েকে। বাবাকে ভয়ে প্রথমে জানাইনি, কারণ জানতাম তাঁর মত পাব না। কিন্তু তখন অল্প বয়স, তায় টাকার কষ্ট কি কোনদিন জানতে পারিনি। ভেবেছিলাম বাবা রাগ করবেন ঠিক, কিন্তু আমাকে ত একেবারে ত্যাগ করতে পারবেন না। আদরেই মানুষ হয়েছি, আমার কোন আবদারই বাবা উপেক্ষা করতে পারেন নি। তাই লুকিয়ে বিয়ে করতে ভয় করিনি। বিয়ে করার কিছুদিন পর বাবা কার কাছে সব জানতে পারলেন। আমি সব কথা বলতে বাধ্য হলাম। সব শুনে বাবা বললেন— 'আজ থেকে আমার বাড়ীতে তোমার স্থান হবে না, তোমায় আমি ত্যাগ করলাম। আমিও রাগ করে বাড়ী থেকে বেরিয়ে এলাম।' তারপর বাবাও কোনদিন আমার খোঁজ নেন নি, আমিও আর বাড়ী যাইনি। বুঝতেই পারছ, বাবা টাকাপয়সা পাঠান বন্ধ করে দিলেন। ফলে আর্টস্কুল ছাড়তে হল। অনেক চেষ্টায় এক স্কুলে ড্রইং টিচারের কাজ পেলাম। অর্পণার মাকে নিয়ে চলে গেলাম সেখানে। বেশ আনন্দের মধ্যে দিন কাটছিল আমাদের। প্রথমটায় একটু কষ্ট হলেও পরে সব ঠিক হয়ে গেল। কয়েক বছর পরে অপর্ণা এল আমাদের সংসারে। ছোট্ট সংসারে অভাব কিছু থাকলেও আনন্দের অভাব ছিল না। গ্রামের লোকে ভালবাসতেন আমাদের। গ্রামের অধিকাংশ লোকই ছিল গরীব। কিন্তু তারা গরীব হলেও তাদের জীবনে আনন্দ ছিল, বিরাট বৈচিত্র্য ছিল। তাদের প্রাণ ছিল, মনুষ্যত্ব ছিল। কিন্তু আমার কপালে বিধাতা লিখেছেন দুঃখ ভোগ করা—তাই সুখ সহ্য হবে কেন ? একদিন স্কুল থেকে ফিরে দেখলাম অপর্ণার মায়ের বেশ জ্বর। চিকিৎসা হল, কয়েকদিন পরে যখন জ্বর ছাড়ল। তখন ভাবতে পারিনি এ কালজ্বর কিছু একটা না নিয়ে যাবে না। জর ছাড়ল কিন্তু দেখা গেল অপর্ণার মার একটু মাথার গোলমাল আরম্ভ হয়েছে। যতদূর সাধ্য চিকিৎসা হল, কিন্তু কোন ফল হল না। অপর্ণার মা বদ্ধপাগল হয়ে গেল। ঘরে বন্ধ করে রাখতে হত তাকে। কিন্তু একদিন স্কুল ফেরৎ বাড়ী এসে দেখলাম ঘর খোলা

—অপর্ণার মা ঘরে নেই। বোধ হয় সেদিন তাড়াতাড়িতে ঘর বন্ধ করিনি আর সেই সুযোগে সে চলে গেছে। প্রায় একবছর তাকে খুঁজলাম, কাগজে বিজ্ঞাপন দিলাম, তার জন্য সেই গ্রামেই অপেক্ষা করলাম, কিন্তু সে আর ফিরে এল না। দুঃখের সংসারে আমি তাকে শুধু কষ্টই দিয়েছি, তাই সে রাগ করে চলে গেল। গ্রামে আর থাকতে পারছিলাম না। সবসময় মনে পড়ত তার কথা, তাই একদিন রাত্রে চুপিচুপি পালিয়ে এলাম সেখান থেকে। জানতে পারলে হয়ত কেউ যেতে দিতে চাইবে না, এই ভয়ে কাউকে কিছু না বলেই পালিয়ে এলাম সেখান থেকে। কিছুদিন ঘুরে বেড়ালাম নানা জায়গায়। আশা ছিল হয়ত তাকে খুঁজে পাব, কিন্তু সব চেষ্টা ব্যর্থ হল। অনেক চেষ্টাতেও যখন তার খোঁজ পেলাম না অথচ টাকাও প্রায় শেষ হয়ে এল, তখন চলে এলাম কলকাতায়। একটা প্রাইভেট স্কুলে ড্রইং টিচারের চাকরী পেলাম। ছোট একটা বাসায় আমি আর অপর্ণা দুজনে কোন প্রকারে দিন কাটাতে লাগলাম। অপর্ণাকে স্কুলে ভর্তি করে মানুষ করবার চেষ্টা করতে লাগলাম। কিন্তু এখানেও ঝড়ে বিপর্যস্ত হয়ে গেল আমাব জীবন। অসুখে বেশ কিছুদিন ভুগলাম। মাস চার পাঁচ পরে অসুখ ভাল হলে স্কুলে যেতেই কর্তৃপক্ষ জানালেন আমার অসুখে একজন শিক্ষককে তাঁরা কাজ দিয়েছেন। তিনি আর্টস্কুল থেকে সেবারই পাশ করে বেরিয়েছেন। আমার অবস্থার কথা শুনে শেষে তাঁরা বললেন,—আপনার সার্টিফিকেট্ দেখান। যদি দেখা যায় আপনার নম্বর বেশী তা হলে আপনাকেই নিয়োগ করব।

আর্টস্কুলে পরীক্ষা আমি দিতে পারিনি। সুতরাং সার্টিফিকেট্ আমার ছিল না। তাঁরাও জানতেন এ কথা। কিন্তু সরাসরি না বলতে পারায় কৌশলে আমাকে ছাঁটাই করলেন। তারপর অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু সবাই চায় সার্টিফিকেট্। আমি কি জানি, কতটা জানি সে কথা বড় নয়—সার্টিফিকেট্ তাঁদের কাছে বড়, তারই কদর তাঁরা বোঝেন। শেষে কোথাও চাকরী জোটাতে না পারায় যা পুঁজি

ছিল তা শেষ হয়ে গেল। মাইনে দিতে না পারায় অপর্ণার নাম স্কুল থেকে কাটা গেল, বাসা ছেড়ে বস্তিতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হলাম। অপর্ণা পড়াশোনায় মন্দ ছিল না, কিন্তু তাকে পড়াতে পারলাম না। বাপ হয়ে মেয়েকে পড়াতে না পারা যে কত বড় দুঃখ, কত বড় পরাজয় তা তুমি বুঝবে না। একবার ভেবেছিলাম সেই গ্রামেই ফিরে যাব, কিন্তু যেভাবে সেখান থেকে পালিয়ে এসেছি তাতে আজ এতদিন পরে ফিরে যেতে লজ্জা লাগল। কিন্তু না খেয়ে মানুষ বাঁচতে পারে না, তাই দু'মুঠো ভাতের জন্য ঐ ছবি বিক্রী আরম্ভ করলাম। কয়েকটা ছবি বিক্রী করিনি, অন্য ছবি এঁকে বিক্রী করেছি। এক একটা ছবির দাম কত পেয়েছি জান? দু টাকা, একটাকা, কোনটি মাত্র আট আনায় দিতে হয়েছে। জীবনের সাধনার দাম মাত্র দু-এক টাকা! পেটের দায়ে বিক্রী করেছি জীবনের সব থেকে বড় সাথী এই ছবিগুলো। বলতে বলতে তাঁর চোখ থেকে জল পড়ে।

স্তম্ভিত সুখেন অনেকক্ষণ কোন কথা বলতে পারে না। চুপচাপ বসে থেকে সে অনুভব করতে চেষ্টা করে এই মানুষটির বেদনা। অনকক্ষণ পরে উঠে দাঁড়িয়ে বলে,—আজ আমি চলি, কাল আবার আমি আসব। কাল আমি আপনাকে হাসপাতালে নিয়ে যাব। বলেই চলে আসে সুখেন। সে বোঝে বেশীক্ষণ এইভাবে থাকা তার পক্ষে অসম্ভব।

ধীরে ধীরে পরিচয় ঘনিষ্ঠ হতে থাকে। ডাক্তারবাবুর চেষ্টায় একটা কমার্শিয়াল ফার্মে ললিতবাবুর চাকরী করে দিল সুখেন। মাইনে বেশী নয়—তবু কোন রকমে দু'জনের চলে যাবার একটা ব্যবস্থা হল।

এদিকে অপর্ণা বেশ সুস্থ হয়ে উঠতে থাকে। হাসপাতালের বেডে শুয়ে শুয়ে তার অভিজ্ঞতা বাড়তে থাকে। দেখে যারা নার্সদের, ঝিদের দু'পয়সা দিতে পারে তাদেরই এরা ভালভাবে যত্ন নেয়, আর যারা তা দিতে পারে না তাদের সেবা করা এদের যেন কর্তব্য নয়! উপেক্ষা, কিছুটা ঘৃণা তাদের প্রাপ্য বলেই মনে করে তারা।

কেউ কিছু বলতে গেলেই সামান্য মেথর থেকে মেট্রন পর্যন্ত সকলেই মুখিয়ে উঠে। তাদের আচরণ দেখলে মনে হয় এই গরীবদের বেঁচে থাকাটা অন্যায়, তারা বাঁচবার অধিকার-বর্জিত! খাবার বেলাতেও সেই একই দৃষ্টান্ত। যারা মোটা টাকা বকশিস দিতে পারে তাদের দাবী সর্বাগ্রে। তাদের জন্য দেয় ভাল খাবার, আর গরীবদের জন্য নিকৃষ্ট খাবার। আবার তারা খেল কি না খেল তাও দেখা নার্সরা প্রয়োজন মনে করে না। কোন সহানুভূতি নেই তাদের প্রতি। অপর্ণা ভাবে সেবা মহান ব্রত। কত লোকের জীবন একটুখানি সেবায়, একটু হাসিতে ধন্য হয়ে যায়। আর এরা সেই মহান ব্রতে দীক্ষা নিয়ে কি ঘৃণ্য মনোবৃত্তির পরিচয়ই না দিচ্ছে। আর ভাবতেও আশ্চর্য লাগে, এর কোন প্রতিবাদও হচ্ছে না, আর কেউ প্রতিকার করতেও আসছে না।

সেদিন সন্ধ্যায় এক বারো-তেরো বছরের মেয়ে অপর্ণাদের ওয়ার্ডে ভর্তি হল। সারা শরীর আগুনে পুড়ে গেছে তার। সে সারারাত চিৎকার করছে, কাঁদছে, মাঝে মাঝে খাবার জল চাচ্ছে কিন্তু কোন নার্সের দেখা পাওয়া গেল না। হয়ত যাদের ডিউটি পড়েছে তারা রাতজাগা পছন্দ করে না, তাই রোগীদের যাই হোক্ না কেন, তারা ঘুমিয়ে তাদের কর্তব্য পালন করছে! বেশ কিছুক্ষণ সে মেয়েটি চিৎকার করার পর ঝি এসে ধমক দিয়ে গেল। বলে গেল আর চিৎকার করলে ওয়ার্ডের বাইরে বার করে দেবে। অপর্ণা আর সহ্য করতে না পেরে ঝিকে বলল নার্সদের খবর দিতে। ঝি একটু হেসে বলল—দিদিমণি, তাঁদের দেখা এই রাতে পাবেন না। সাধে কি ধমক দিচ্ছি, উপায় নেই। আমি কিছু বললেই তাঁরা দলবেঁধে আমার পেছনে লেগে আমার চাকরী ছাড়াবেন। চুপ করে দেখে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। দরদ দেখাতে গেলেই বিপদ, সুতরাং কানে আঙ্গুল দিয়ে থাকতে হয়।

সুখেনকে বলে অপর্ণা এই অব্যবস্থার কথা। সুখেন বলে,—কি করবে বল, আমাদের জাতির রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছে

এই অনাচার। সুখ, আনন্দ, সহানুভূতি সব কিছুর জন্য দাম দিতে হয়, পয়স. থাকলে নাও যত ইচ্ছা, না থাকলে ভোগ কর দুঃখ। প্রতিবাদ করতে গেলেই দেখবে বড় বড় রথী-মহারথীরা পর্যন্ত এর মূলে।

সেদিন সকালে অপর্ণা বেডের উপর বসে একটা পত্রিকা পড়ছে এমন সময় তার কানে এল কারা যেন শ্লোগান দিতে দিতে চলেছে—'হাসপাতালের স্বেচ্ছাচারিতা চলবে না। বিনা কারণে ডাক্তারদের সরান চলবে না। আমাদের দাবী মানতে হবে।' অপর্ণার কৌতূহল হল ব্যাপারটা কি জানার জন্য। একজন বয়স্ক নার্স তাকে খুব ভালবাসত। অপর্ণা তাকে জিজ্ঞেস করল,—কি ব্যাপ'ব দিদি? ওরা ডাক্তারদের নামে ওসব কথা বলছে কেন?

নার্সটি বলল,—সে সব অনেক কথা। সবাব সামনে সব কথা বলা যায় না, তোমাকে পবে সব বলব। অন্য স্টাফের সামনে বললে তারা আমাকে যা তা বলবে, চাকবীও চলে যেতে পাবে। তুমিও যেন কাউকে আমার নাম বলে দিও না।

দুপুবে সেই নার্সটি একা অপর্ণার কাছে এল। ঘরে অন্য রোগীরাও তখন ঘুমোচ্ছে। সে অপর্ণাকে বলল,—দেখ তোমায় আমি সব কথা বলব, কিন্তু তুমি কাউকে যেন কোন কিছু বলে দিও না। এখানে একজন খুব ভাল ডাক্তার ছিলেন। গাইনাকোলজীতে তাঁর দক্ষতা দেখে সকলেই প্রশংসা করতেন। একে শিক্ষিত তরুণ, তায় বাবাও ডাক্তার, সুতরাং পয়সাব দিকে তাঁর লোভ ছিল না। ডাক্তারী তিনি শুধু পেশা হিসাবে নেননি, সেবা হিসাবেও নিয়েছিলেন। ডাঃ অজিত রায় তাই অল্পদিনেই সব রোগীদের খুব প্রিয় হয়ে উঠলেন। কোন অন্যায় বা কাজে ফাঁকি দিলে তিনি তাঁদের বলতেন,—'গল্প করে অযথা সময় নষ্ট না করে রোগীদের ভালভাবে চিকিৎসা করবার দিকে মন দিলে রোগও ভাল হয়, দেশের অনেক মূল্যবান জীবনও তাতে অযথা অকালে প্রাণ হারায় না। আপনাদের উপর নির্ভর করছে মানুষের জীবন।' নার্সরা ঠিকমত যদি সেবা না করত তাহলে তিনি তাদের বেশ কড়া ধমক দিতেন। কোন ডাক্তার যদি রোগীর কাছ

থেকে বা তার আত্মীয়ের কাছ থেকে টাকা-পয়সা নিতেন তাহলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে বলতেন,—'আপনি সরকারী চাকরী করছেন, সরকার আপনাকে মাইনে দিচ্ছে, আর আপনি এইভাবে ঘুষ নিচ্ছেন? এভাবে অসৎ পয়সা নিয়ে নিজেকেও অপমান করছেন, ডাক্তারী শিক্ষাকে পর্যন্ত অপমান করছেন।' তিনি নিজে রোগীর আরামের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। কোন অপারেশন কেস থাকলে রোগীর জ্ঞান ফিরে না আসা পর্যন্ত অস্থির ভাবে অপেক্ষা করতেন। প্রত্যেকটি রোগীকে সমান ভাবে চিকিৎসা করতেন। রোগীরাও ডাঃ রায়ের নাম শুনেই যেন অনেক ভরসা পেত, তাঁকে সত্যিকারের ভালবাসত, শ্রদ্ধা করত। কিন্তু তাঁর সততা, তাঁর সুনাম অপর ডাক্তাররা, নার্সরা দেখত পারত না। তাদের স্বার্থহানিতে, আর্থিক ক্ষতিতে তারা দলবেঁধে নানা অপবাদ দিয়ে, কুৎসা রটনা করে তাঁকে চাকরী ছাড়তে বাধ্য করল। কিছু কিছু ডাক্তার তাঁর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু উপর মহল পর্যন্ত ঐ সব স্বার্থপর ডাক্তারদের হাতের মধ্যে। তাই একরকম বাধ্য হয়েই তাঁকে চাকরী ছাড়তে হল। অবশ্য কর্তৃপক্ষ তাঁকে চাকরী ছাড়তে বলেনি, শুধু অন্য জায়গায় বদলী করতে চেয়েছিল। কিন্তু আত্মমর্য্যাদায় আঘাত লাগায় তিনি বলেছিলেন,—'না, চাকরী আর করব না। যারা স্বার্থের জন্য অন্যায় করতে পারে, যারা অন্যায় জেনেও সে অন্যায়ের প্রশ্রয় দেয় তাদের কাছে চাকরী করব না।' মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা তাঁকে খুবই ভালবাসত। তারাই এই প্রতিবাদ মিছিল বার করেছে—তারাই শ্লোগান দিয়ে এই অন্যায়ের প্রতিকার চাইছে। যদিও তারা জানে যে তাদের দাবী কর্তৃপক্ষ মেনে নেবেন না, দেবেন কিছু উপদেশ—'তোমরা ছাত্র, পড়াশোনা নিয়ে থাকাই তোমাদের উচিত। এ সব তোমাদের দেখা উচিত নয়, কর্তব্য নয়।' কর্তব্যনিষ্ঠ কর্তা ব্যক্তিরা এই বলেই এত বড় অন্যায় চেপে যাবেন। সবাই জানবে ডাঃ রায় চাকরী ছেড়ে প্রাইভেট্ প্রাকটিশ করবেন ঠিক করায় চাকরী ছেড়ে দিয়েছেন।

বুদ্ধির আর বিদ্যার যৌথ চিন্তায় সাজানো চক্রান্ত কি রকম

সুন্দরভাবে, সফল হচ্ছে! এই আজ দেশের প্রকৃত অবস্থা। হাসপাতালে এসে বৃহত্তর জগতের, স্বার্থ-কুটিল নির্মম জগতের অভিজ্ঞতায় অপর্ণা যেন নতুন করে পৃথিবীকে জানতে পারল। জানল এ পৃথিবীর পথপরিক্রমা বক্র আবর্তে আবদ্ধ, জানল শিক্ষিত সমাজসেবী বলে পরিচিত মানষের স্বরূপ। মহানব্রতে যাদের জীবন নিয়োজিত তাদেরও সামান্য স্বার্থে কর্তব্যচ্যুত হয়ে সামান্য মানুষের মত আচরণ করতে, নিজেদের স্বার্থরক্ষায় বিদ্যা-বুদ্ধির প্রয়োগে সুন্দরভাবে কৌশলের সাহায্যে কাজ উদ্ধার করতে দেখে সে শিহরিত হয়। অপর্ণা শপথ করে তাকে এই সেবাধর্মে দীক্ষা নিতে হবে, সেবায় বেদনাতুর মানুষের কষ্ট লাঘব করে বড় হতে হবে। ভাল হয়ে বাড়ী ফিরেই সে সুখেনকে বলে—দাদা, আপনি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন। আর একটা উপকার আপনাকে করতে হবে। আমি নার্স হতে চাই, ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করে দিতে হবে আপনাকে।

সুখেন বলে,—এখন তুমি পড়াশোনা কর অপর্ণা। ম্যাট্রিকটা পাশ করে নাও, তার পরে তোমার ইচ্ছামত ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করে দেব।

কিন্তু অপর্ণা দেরী করতে চায় না। এমনিতেই বেশ দেরী হয়েছে, আর দেরী সে করতে চায় না। তাই কাতরস্বরে অনুনয় করে বলে,— না দাদা, আর পড়ব না। বেশী পড়াশোনা করে আমি কি করব? আর হাসপাতালেই দেখতে পেয়েছি লেখাপড়া শেখা মানুষদের! আর আমি দেরী করতে চাই না, আপনি আমার ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করে দিন। আমি চাই এই সব গরীব সংসারের চাপে বিধ্বস্ত মানুষদের সেবা করতে, তাদের কষ্ট যথাসাধ্য দূর করতে। জানি আমার ক্ষমতা কম, কিন্তু একজনকেও যদি বাঁচাতে পারি, একজন রোগীও যদি আমার সেবায় আনন্দ পায় তাহলে জানব জীবন সার্থক।

অপর্ণার স্বচ্ছমনের পরিচয় সুখেনকে অভিভূত করে। সে বোঝে এ তার সংকল্প, তার জীবনব্রত। মুগ্ধ হয়ে বলে,—বেশ, তাই হবে বোন। আমি যেমন করে পারি তোমার ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করে দেব।

॥ ৬ ॥

ট্রেনিং শেষে অপর্ণা যখন সব বিষয়েই ভাল ভাবে পাশ করল তখন শিক্ষকরা পর্যন্ত তার অধ্যবসায় ও আগ্রহে বিস্মিত হলেন। সরকারী-ভাবে সে বিহারের একটা হাসপাতালে চাকরী নিল। যাবার সময় বাবাকে বলল—বাবা, আমি চললাম পীড়িতদের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করতে। আশীর্বাদ কর তোমার মেয়ে যেন সকলকে আনন্দ দিতে পারে, শত বাধা-বিপত্তির মাঝেও সে যেন আপন কর্তব্য পালনে সক্ষম হয়।

সজল চোখে মেয়ের মাথায় হাত রেখে তিনি বলেন—পারবি অপর্ণা, তুই পারবি। আমি বলছি, দেখিস্ একদিন সকলেই তোর কাজের প্রশংসা করবে, দৃষ্টান্ত দিয়ে ভাবীকালের সেবাব্রতীদের প্রেরণা দেবে।

বাবাকে প্রণাম করে অপর্ণা যায় সুখেনদের বাড়ী। সুখেন তখন কলেজ থেকে ফেরেনি। দীনেশবাবুকে সশ্রদ্ধে প্রণাম করে অপর্ণা বলে—আমি কাজে যাচ্ছি মেসোমশায়। আশীর্বাদ করুন এই কাজে যেন সফল হতে পারি। আর জীবনে যদি কোনদিন এই সামান্য মেয়েকে প্রয়োজন মনে করেন তাহলে জানাবেন, সমস্ত কাজ ফেলে সে নিশ্চয়ই ছুটে আসবে। দাদার সঙ্গে দেখা না করে যাওয়া হবে না, তাঁকে আজ প্রণাম করতেই হবে। আমার জীবনের যে দীপশিখা তিনি জ্বেলে দিয়েছেন সেই শিখা উজ্জ্বল রাখতে তাঁর আশীর্বাদ আমায় নিতেই হবে।

দীনেশবাবু তাঁকে আশীর্বাদ করেন। সুখেনের জন্য অপেক্ষা করতে বলেন। সুখেন কলেজ থেকে ফিরলেই অপর্ণা তার কাছে গিয়ে বলে—দাদা, ডাক এসেছে আমার। যে পুণ্য ব্রত নিয়েছি তারজন্য আমাকে যেতে হবে বিহারের এক ছোট্ট হাসপাতালে। সেখানে হঠাৎ কলেরা মহামারী রূপে দেখা দিয়েছে। আমি সেখানেই যাচ্ছি। যাবার সময় তোমার বোন হিসাবে তোমাদের এই অনন্ত ভালবাসার পাশ থেকে চলে যেতে আমার মন কাঁদছে। কিন্তু কর্তব্য আমায় করতেই হবে, সেখানে কোন বাধার স্থান নেই। আজ আশীর্বাদ কর যেন তোমার মত নিঃস্বার্থ ভাবে সকলের সেবা করতে পারি, তোমার বোন হিসাবে তোমার মুখ যেন উজ্জ্বল করতে পারি। তুমিও যেন একদিন গর্ব করে বলতে পার—অপর্ণা আমার বোন। ভগবানের কাছে যাবার সময় প্রার্থনা করছি তুমি যেন একদিন দেশের ও দশের একজন হতে পার। তোমার সে সাফল্যের দিনে সব থেকে খুশী হবে তোমার এই অতি গরীব, চির দুঃখী বোন। আমি যেন আনন্দে তোমার পরিচয় দিয়ে নিজেকে গর্বিত করতে পারি।

সুখেনের দু'চোখ জলে ভরে যায়। সে বলে—কে বলে তুমি আমার সামান্য বোন? তুমি অসামান্যা, তুমি শ্রেষ্ঠা। তোমার কর্ম জীবন সার্থক হবে সফল হবে। আর ভাবীকালের স্বার্থপর কুটিল সমাজ-শত্রুরা তোমার বিরাট সাফল্যে চঞ্চল হবে, চেষ্টা করবে তোমার মত নিঃস্বার্থ হতে। তোমাকে আশীর্বাদ করবার ক্ষমতা আমার নেই, তবু একান্তই যদি তা করতে হয় তাহলে বলব—যা মহৎ, যা শ্রেষ্ঠ তার জয় অবশ্য। দেরী হতে পারে, সাফল্যের পথে বাধা আসতে পারে কিন্তু তার জয় নিশ্চিত। লোহা আগুনে পুড়ে ইস্পাত হয়। জাতির উন্নয়নে প্রধান সহায়ক হয়। তেমনি দুঃখ-কষ্ট, বাধা-বিপত্তির মাঝে তোমার অন্তরের শক্তি দৃঢ় হবে, খাঁটি হবে। আর সে শক্তিতে তুমি তোমার প্রতিষ্ঠা পাবে, মহীয়সী হবে।

অপর্ণা বিদায় নিয়ে চলে যাবার পর সুখেন ভাবে স্নেহের মোহ মানুষকে কত অন্ধ করে। সমাজের কল্যাণে, দেশের প্রয়োজনে যে

আত্ম নিয়োগ করেছে তাকেও ছেড়ে দিতে চায় না। তাকেও সামান্য নিজের অন্ধ স্নেহের আবরণে ঢেকে রাখতে চায়, কল্যাণময়ীর আদর্শে বাধা দিতে চায়। কি আশ্চর্য এই মানুষের মন! অপর্ণা বিদায় নিয়ে চলে গেল, কিন্তু তার দৃপ্ত কথায় সুখেনকে আরও দৃঢ়তা দিয়ে গেল।

একদিন কলেজ থেকে ফিরবার পথে দেখল কলেজের কাছেই একটা গলির মধ্যে কয়েকজন ছাত্র মিলে তাদের কলেজের এক বেয়ারাকে মারছে। সে নাকি তাদের কথা শুনেনি, তাই তাকে শিক্ষা দেবার আয়োজন করেছে এরা। দেখেই সুখেনের সারা শরীরে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল! ছুটে গিয়ে বেয়ারাকে তাদের হাত থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলল—লজ্জা করে না তোমাদের এই নিরীহ গরীবকে মারতে। ছাত্র সমাজের মুখ এতে গৌরবময় হচ্ছে, না তাদের মুখে কলঙ্কের কালিমা লেপে দিচ্ছ তোমরা? একজন সামান্য বেয়ারাকে মেরে পৌরুষ দেখাতে তোমাদের সংকোচ হচ্চে না দেখে আমি অবাক হয়ে গেছি। তোমরাই না দেশের ভবিষ্যত, ভাবীকালের কর্ণধার? আর তোমরাই এই নীচ মনের পরিচয় দিচ্ছ? পার তাদের মারতে যারা দেশের রক্ত দূষিত করছে? কালবাজারীর চোরা পথে সমস্ত দেশটা অতল তলে তলিয়ে দিচ্ছে? এই গরীবের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে নিজেরা বাড়ী করছে, গাড়ী চাপছে, তাদের দিতে পার শাস্তি? তবেই জানব তোমরা দেশের দরদী আদর্শ ছাত্র। তা না করে এই নিরীহ লোকের উপর জুলুম করে বাহবা নিচ্ছ। ছিঃ, লজ্জা হওয়া উচিত তোমাদের।

কলেজের একজন সেরা ছাত্রকে এভাবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে দেখে তারা অবাক হয়ে যায়। তারা ভাবত সুখেনদা শুধু পড়া নিয়ে ব্যস্ত। কিন্তু আজ তাকে এই বলিষ্ঠ ভঙ্গীতে অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে দেখে, গরীবের দুঃখে প্রাণভরা ভালবাসা নিয়ে তাদের পাশে দাঁড়াতে দেখে তারা অবাক হয়ে যায়। সত্যিকারের দরদীর কাছে তাদের মাথা হেঁট হয়ে যায়। অন্যায় যত বড় হোক, যতই না কেন তার সমর্থক থাকুক, বলিষ্ঠ প্রতিবাদের কাছে তার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। ছেলেরাও লজ্জিত হয় তাদের আচরণে, ক্ষমা চায় সুখেনের কাছে

সেদিনই তারা সকলে প্রতিজ্ঞা করে সঙ্ঘবদ্ধ হবার, অন্যায়ের প্রতিবাদ করার, আর নিজের কর্তব্যবোধে সকল কষ্ট হাসিমুখে সহ্য করার। সুখেনকে দলবাতি করে তারা কলেজে মিটিং করে ঠিক করল আদর্শ ছাত্র হতে হবে। সুখেনের নেতৃত্বে গড়ে উঠল ত্রাণসমিতি—গরীব ছাত্রদের, দুঃস্থ নিঃসহায় লোকদের সাহায্য করাই হল এর একমাত্র মন্ত্র।

নূতন মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে সকলেই উৎসাহিত হয়। কৈশোর ছাড়িয়ে যৌবনের প্রারম্ভে সকলেই চঞ্চল হয়ে উঠল। নবমন্ত্রে সকলে একত্র হল, ভেদাভেদ ভুলে, ঈর্ষা দ্বন্দ্বের অবসানে সকলে পেল আনন্দ। নিয়মিত শরীর চর্চা আর ব্যায়ামে সকলেই হল বলিষ্ঠ।

ইতিমধ্যে সুখেনের বি, এ, পরীক্ষা এসে গেল। দিবারাত্র পরিশ্রমে সুখেনকে বেশ ক্লান্ত দেখে উদ্বিগ্ন দীনেশবাবু তাকে বললেন—দেখ সুখেন, এত পরিশ্রম তোর সহ্য হচ্ছে না, একটু বিশ্রাম নেওয়া প্রয়োজন। তাছাড়া পরীক্ষার জন্য তোমায় প্রস্তুত হতে হবে, আরও পড়াশোনা করা উচিত।

সুখেন উত্তর দিল—দেখ বাবা, নিজের প্রয়োজনে যদি কর্তব্যচ্যুত হই তাহলে যারা আমাদের জন্য অপেক্ষা করে আছে, আমাদের মুখের পানে তাকিয়ে আছে, তাদের কি হবে ? নিজের সুখ যদি বড় হয় তাহলে কি আদর্শ আমার কাছ থেকে সরে যাবে না ? আর পরীক্ষা ? তোমার সুখেন কোন্‌দিন পরীক্ষায় সফল হয়নি বল ? কখন তোমার মুখ উজ্জ্বল করেনি ? তবে তুমি যদি অমত কর, ওদের কাছ থেকে দূরে থাকতে বল তাহলে তোমার আদেশ আমি অমান্য করব না। আমার প্রাণ তাতে কাঁদবে কিন্তু তোমার অবাধ্য হব না।

দীনেশবাবু রুদ্ধ কণ্ঠে বলেন—তোর কাজে বাধা আমি দিতে চাই না। যে মহান কর্তব্যে তুই নিজেকে নিয়োজিত করেছিস সে পথে প্রতিবন্ধক হয়ে আমি তোর যাত্রা পথ পিচ্ছিল করে দিতে চাই না। অবুঝ স্নেহের বশে তোকে একটু বিশ্রাম নিতে বলেছি, কর্তব্য ত্যাগ করতে বলিনি। ভগবান তোর কর্তব্য পথে সহায় হোন এই কামনা করছি।

সমস্ত দিন কলেজে কাটিয়ে সন্ধ্যায় যখন বাড়ী ফিরত তখন ক্লান্তিতে অবসাদে সুখেনের শরীর বিশ্রাম খুঁজতো। কিন্তু বিশ্রাম নেবার সময় কোথায়? পরীক্ষার প্রস্তুতিতে তাকে পড়তে বসতে হয়। গভীর রাত পর্যন্ত পড়াশোনা করে যখন ঘুমুতে যেত, তখন তার আর চোখ খুলে রাখা কোনমতেই সম্ভব হত না।

এদিকে কিছুদিন হল দীনেশবাবু ডাক্তারবাবুকে তাঁর সঙ্গে থাকবার অনুরোধ করায় ডাক্তারবাবু ও কৃষ্ণা ওখানে এসেছেন। দীনেশবাবুর অবসর সময়ে ডাক্তারবাবু যেমন তাঁকে সান্ত্বনা দিতে চাইতেন, তেমনি কৃষ্ণাও সুখেন বাড়ীতে থাকাকালীন তাকে তার সেবা যত্ন দিয়ে ভুলিয়ে রাখতে চেষ্টা করত। কৃষ্ণা অনেকটা কল্পনার স্থান অধিকার করার চেষ্টা করত, কিন্তু সুখেন কিছুতেই তাকে সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করতে পারত না। যে আঘাত সে পেয়েছে একদিন, তার পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনাকে সে কোনমতেই প্রশ্রয় দিতে পারে না। তাছাড়া সুখেন কল্পনাকে কোনদিন নিজের বোন নয়—তা মনে করেনি। সে ভুলে গিয়েছিল তারা সহোদর ভাই-বোন নয়—পাতান সম্পর্ক। ছোট বেলা থেকে তারা ভাই-বোন-এর মত মানুষ হয়েছিল। এক মূহূর্তের জন্য একজন অপরজনকে ছেড়ে থাকতে পারত না। তাদের অন্তরের সব কথা উভয়ে উভয়ের কাছে জানাত। একজন ব্যথা পেলে, দুঃখ পেলে, অপরজন সে ব্যথা, সে দুঃখ, সমান ভাবে অনুভব করত। কল্পনার অসুখে সুখেন মাসাবধি সেবা করেছে অনলস ভাবে। দু'জনে ছিল তাদের সব থেকে বড় সাথী। কিন্তু সেই কল্পনা চলে যাবার পর সুখেনের জীবন থেকে সব সুখ নিয়ে চলে গেছিল। তার কিশোর জীবনের সব থেকে বড় আনন্দের দিনে সে পেয়েছিল চরম আঘাত। তাই কৃষ্ণার সেবা-যত্ন সে প্রাণ-খোলা মনে গ্রহণ করতে পারত না। কৃষ্ণা চাইত তার সবকিছু দিয়ে সুখেনকে সুখী করতে। কিন্তু সুখেন সর্বদা কৃষ্ণাকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করত। কৃষ্ণা অনেক সময় সুখেনের কাছে আসত, তার পড়াশোনা দেখিয়ে নিত। কিন্তু সুখেন যতটা সম্ভব তার কাছ থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করত। বোধ হয় ভাবত, মায়া বাড়িয়ে লাভ নেই,

তাতে শুধু ঠকতেই হয়। তাই কৃষ্ণাকে সে কিছুতেই অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারত না। এটা স্বাভাবিক, চিরন্তন ঘটনা। অভিজ্ঞতার স্রোতে মানুষ জগৎকে জানতে পারে। একবার মানুষ যাতে আঘাত পায় তার মধ্যে সে কিছুতেই আর থাকতে চায় না। সে মনে করে আবার আঘাত পাব, সুতরাং আর তার মধ্যে না থাকাই ভাল। তাই সেই পরিপ্রেক্ষিতে সে দূরে থাকতে চায়। কৃষ্ণার মধুর ব্যবহারে তার মন যে সাড়া একেবারেই দিত না এমন নয়, কিন্তু তার ভয় হত। মনে হত এটা বোধ হয় কৃষ্ণার একটা অভিনয়। মাঝে মাঝে তার সেবার প্রতি সুখেনের বিরাট প্রলোভন হত। কিন্তু অন্তরের এই আবেদন সে অগ্রাহ্য করবার চেষ্টা করত। হয়ত একটা অন্য কারণও ছিল। কল্পনার স্থান কৃষ্ণা দখল করতে চাইচে দেখেই হয়ত সে তাকে দূরে ঠেলে রাখতে চেষ্টা করত। কল্পনার স্থান শূন্য থাকতে পারে, কিন্তু সে স্থান যে অন্য কেউ অধিকার করবে এ চিন্তা তাকে কিছুটা হয়ত বিমুখ করেছিল। কৃষ্ণা নিজে জানে দুঃখ কি, তার আঘাত কত বড়। তাই সে সুখেনকে তার মমতা দিয়ে, দরদী মনে সেবা করে তার দুঃখে অংশ নিতে চাইত।

দীনেশবাবু কৃষ্ণার এ ব্যবহার লক্ষ্য করে মনে মনে খুসী হয়েছিলেন। অনেক সময় তার মাথায় হাত দিয়ে বলতেন—মা, তুই ছিলি বলে সুখেন এখন অনেকটা শান্তি পেয়েছে। তার মা মারা যাবার পর এতদিনে সে যেন অনেকটা সহজ হয়ে উঠেছে।

দীনেশবাবুর স্নেহের স্পর্শে কৃষ্ণার হৃদয় ভরে উঠে। সে যেন আরও গভীর মমতায় তাঁদের সেবা করতে থাকে। তার এই অকৃত্রিম সেবায় সুখেনও চঞ্চল হয়। কৃষ্ণা যেন তার সেবায়, তার অন্তরের পবিত্রতায় সুখেনকে জয় করে নেয়। অনেক রাত পর্যন্ত পড়তে গেলে সুখেনকে নিষেধ করে কৃষ্ণা, হাত থেকে বই কেড়ে নিয়ে বলে—'শুয়েপড় সুখেনদা, না হলে শরীর খারাপ হবে।' সুখেন প্রথম প্রথম তার নিষেধ অমান্য করত, কিন্তু পরে তাকে মানতেই হত সে নিষেধ। এক একদিন টেবিলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ে সুখেন, কৃষ্ণা এসে তাকে বিছানায় শুতে বলে।

আলো নিভিয়ে নিজের হাতে মশারী ফেলে সে চলে যায়। এক একদিন সুখেন বলে—'তুমি এত কষ্ট কর কেন ?' কৃষ্ণা তার উত্তরে বলে—কি কষ্ট ? তোমাদের সামান্য একটু সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে লক্ষ্য রাখাকে কি তুমি কষ্ট বলে মনে কর ? তাহলে তুমিই বা সারাদিন এত অজানা অচেনা লোকের দুঃখ-কষ্ট দূর করতে যে সেবা কর তাতে তোমার নিশ্চয়ই খুব কষ্ট হয় ? বলতে পার সুখেনদা, কেন প্রতিদিন এত কষ্ট করছ, আর কেনই বা কষ্ট জেনেও সে কাজ থেকে বিরত হও না ?

তার যুক্তিতে পরাস্ত হয় সুখেন। সে বোঝে কৃষ্ণা নিজে দুঃখ পেয়েছে, তাই সে সুখেনকে সুখী করতে চায়। তার সেবা অকৃত্রিম, আন্তরিক আর তার এমনই ব্যক্তিত্ব যে কেউ পারে না তাকে তুচ্ছ করতে, অবহেলা করতে।

ফাইন্যাল পরীক্ষার কয়েকদিন আগে হঠাৎ একদিন অপর্ণার চিঠি এল। অপর্ণা লিখেছে—

দাদা, তোমাদের কাছ থেকে চলে আসার পর এতদিন চিঠি দিতে পারিনি নানাকারণে। তোমার খবর প্রায়ই পেয়েছি বাবার কাছ থেকে। চিঠি লিখতে বসেও চিঠি লেখা হয়ে উঠেনি। যেদিন প্রথম এলাম গৌরীপুরের হাসপাতালে সেদিন দেখি হাসপাতাল রোগীতে ভর্তি। অনেককে বারান্দায় রাখা হয়েছে জায়গার অভাবে। প্রথমটায় নাকি এরা হাসপাতালে আসতে চায়নি, পরে রোগ বাড়লে অনেককে প্রায় জোর করে নিয়ে আসতে হয়েছে। স্থানীয় অধিবাসীরা হাসপাতালের নামে চমকে উঠে। ওরা হাসপাতালের নাম দিয়েছে যমপুরী। তাদের ধারণা ওখানে গেলে কেউ বাঁচে না, তাই তারা মারাত্মক রোগেও হাসপাতালে আসতে চায়নি। এসেই দেখলাম স্টাফ্ খুব কম, এত কম যে সত্যিই ভালভাবে সেবা করা সম্ভব নয়। মাত্র দুজন ডাক্তার আর একজন নার্স ছিলেন। আমি আসার সঙ্গে সঙ্গে সিনিয়র ডাক্তারবাবু আমাকে কাজে লেগে যেতে বললেন। আমিও এ অবস্থায় সঙ্গে সঙ্গে কাজে যোগ দিলাম। তারপর যে কেমন করে এতগুলো দিন চলে গেছে জানি না। দিবারাত্র কঠোর পরিশ্রমে এখন অনেকেই ভাল

হয়ে গেছে, রোগও আর নেই। ক'দিন থেকেই তোমাকে চিঠি দেব দেব ভাবছিলাম, তাই আজ সারাদিন খাটুনির পর এ চিঠি লিখছি। এখন রাত কত জান, বারটা অনেক আগেই বেজে গেছে। সকলেই ঘুমচ্ছে, শুধু আমি জেগে জেগে এই চিঠি লিখছি। সিনিয়র ডাক্তারবাবু বেশ বয়স্ক, আমায় মেয়ের মত ভালবাসেন। রোগীদের তিনি সযত্নে চিকিৎসা করেন। আরও একজন ডাক্তার আছেন, তিনি সবেমাত্র এসেছেন। বাইরের লোকের সাথে আলাপ করবার সময় পাইনি।

পাহাড়ের কোলঘেঁষা এই জায়গাটা আমার বেশ ভাল লাগছে। প্রাকৃতিক দৃশ্য সত্যি বেশ চমৎকার। তোমার তো পরীক্ষা এসে গেল, পরীক্ষার পর একদিন এস এখানে বেড়াতে। বাবার চিঠিতে জেনেছি তোমার শরীর ভাল নেই। এ খবর পেয়ে অবধি খুব খারাপ লাগছে; তোমার ভাল থাকা খবর না পাওয়া পর্যন্ত অস্থির থাকব জেনো। পরীক্ষার জন্য খুব পড়ছো বোধ হয়, তাই শরীর খারাপ হয়েছে। পরীক্ষার পর নিশ্চয়ই একবার এখানে এস দাদা। মেশোমশায়, ডাক্তারবাবুকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম দিও। তাঁরা কেমন আছেন জানাবে। তুমি আমার প্রণাম নিও। ইতি

তোমার বোন অপর্ণা

॥ ৭ ॥

হাসপাতাল জীবন প্রায় অভ্যস্ত হয়ে গেছে অপর্ণার। প্রথম প্রথম যে অসুবিধা ছিল এখন আস্তে আস্তে তা সহ্য হয়ে যাচ্ছে। দেহাতী লোকের সরল মন, বলিষ্ঠ চেহারা তাকে মুগ্ধ করেছে।, সমাজের চালচলন, মুখোশপরা আদবকায়দা তারা জানে না। সে কারণ হয়ত একটু রূঢ়, কিন্তু তারা মানুষ। তারা হাসতে জানে সমাজজীবনের ঠোঁটের ফাঁকে আলতো হাসি নয়, প্রাণখোলা উদার হাসি। অর্পণার মনে হয় মানুষের মনের ছবি ফুটে উঠে তাদের হাসিতে। এদের স্বচ্ছ নদীর মত উদার হাসি তাকে মুগ্ধ করে। হাসপাতাল থেকে তারা যখন বাড়ী ফিরে যায় সে সময় তারা বলেছিল—দিদিমণি, তোর কথা আমরা ভুলব না। তুই মানুষ নয় রে, তুই দেবতা। আমাদের বাড়ী গেলে খুব খুশী হব।

অপর্ণা তাদের আমন্ত্রণ উপেক্ষা করতে পারেনি, রাজী হয়েছিল। তারাও হাসি মুখে বিদায় নিয়েছিল। অপর্ণার জন্য তারা নিয়ে এসেছিল তাদের বাড়ীর সব্জী, মুরগীর ডিম। অপর্ণা তাড়াতাড়ি পয়সা দিতে গিয়েছিল। তাতে তারা বলেছিল—দিদিমনি তুই আমাদের প্রাণ বাঁচালি, আর তুই আমাদের পয়সা দিতে আসছিস্? তোর কাছে এর জন্য দাম নেব? আমরা গরীব বটে রে কিন্তু অমানুষ নয়। যদি দাম না দিলে জিনিস নিতে না চাস্ তা হলে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি এসব, তোকে নিতে হবে না।

অপর্ণা বুঝতে পারে তার শহুরে মন সব কিছুই দাম দিয়ে কিনতে অভ্যস্ত। কিন্তু এই সরল লোকগুলির মন কিনতে পাওয়া যায় না, তাকে জয় করতে হয় ভালবাসা দিয়ে। তাদের উপহার সে নেয় হাসিমুখে, সঙ্গে সঙ্গে হাসি ফুটে উঠে তাদের মুখে।

হাসপাতালের কাজের পর প্রায়ই অপর্ণা বেরিয়ে পরে গ্রামে গ্রামে। দেখে সামান্য ঘরে কোনমতে বাস করে এরা। কিন্তু বাড়ীগুলো খুবই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। দেখে জীবনধারণের উপকরণ কত সামান্য, কয়েকক্ষেত্রে হয়ত অপর্যাপ্ত। কিন্তু তার মধ্যেই তারা শান্তির সন্ধান পেয়েছে। অপর্ণা ভাবে এত সামান্য-উপকরণের মধ্যেও এরা এত শান্তির সন্ধান কি করে পেল? যা পায়নি তার জন্য নেই কোন অভিযোগ। যা পেয়েছে তাতেই সন্তুষ্ট, তার মধ্যেই নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে। অভাব থাকলেও তারা সে অভাবের প্রাধান্য দেয়নি জীবনে, পরের ঐশ্বর্য তাই এরা দেখে না কুটিল চোখে। আত্মসুখই এদের শান্তির অনাবিল আনন্দ দিয়েছে। আজকের দুনিয়ায় মানুষ কখনো কোন কিছুতেই তুষ্ট থাকছে না। কোন কিছুর সামান্য অভাবও সে সহ্য করতে রাজী নয়। তাই তারা আত্মসুখে বঞ্চিত, শান্তির প্রথম সোপান তাদের অজানা। এই লোকেরা কঠোর পরিশ্রমী, বেঁচে থাকবার জন্য কঠোর পরিশ্রমে এদেরকে সংগ্রহ করতে হয় খাদ্য, নেই আরাম বা বিলাসের উপকরণ, আর সেই সঙ্গে সময়ও। তাই দৈহিক গড়ন যেমন চমৎকার, স্বাস্থ্য যেমন অটুট, জীবনও এদের তেমনি সহজ, সরল।

অর্পণা ওদের জীবন জানতে চায়, তাই মিতালী পাতিয়ে নিল ওদের সঙ্গে। তারাও ওদের দিদিমণির অ-গর্বিত মনের পরিচয়ে তাকে আপন জন করে নেয়। মেয়েরা তার খোঁপায় গুঁজে দেয় বনফুল আর পুরুষরা দিতে চায় তাদের দৈহিক সামর্থ্যে ওর স্বাচ্ছন্দ্য। কদিন দেখতে না পেলেই তারা আসে তার কোয়ার্টারে, অনুযোগ করে না যাওয়ার জন্য। অপর্ণা দেখে তাদের এ অনুযোগ কত আন্তরিক। শুধু সভ্যতাগর্বী মানুষের মৌখিক কুশল-প্রশ্ন নয়।

একদিন সন্ধ্যায় অপর্ণা সবে তার ডিউটি শেষে কোয়ার্টারে ফিরে যাবার আয়োজন করছে এমন সময় কয়েকজন গরুগাড়ীতে করে নিয়ে এল এক কুড়ি-বাইশ বছরের ছেলেকে। আহত, অজ্ঞান ছেলেটিকে চেনে অপর্ণা। তার নাম মঙ্গু, কাছের এক গ্রামেই থাকে। তার মা অপর্ণাকে দেখে তার পায়ের উপর আছড়ে পড়ে কাঁদতে কাঁদতে বলতে থাকে—'তুই বাঁচিয়ে দে দিদিমণি, আমার ছেলেকে তুই বাঁচিয়ে দে।' জিজ্ঞাসা করে জানল অপর্ণা মঙ্গুকে বাঘে ধরেছিল। কয়েকদিন থেকে একটা বাঘ ওদের গ্রামের ধারে যে পাহাড়টা আছে সেখানে এসে আশ্রয় নিয়েছিল। তার উৎপাতে সকলে অতিষ্ঠ হয়ে গেছিল। মঙ্গু ঐ পাহাড়ের ধারে গেছিল তাদের গরু চরাতে। তার মা বারবার বারণ করেছিল, কিন্তু মঙ্গু শোনে নি। সে একটা টাঙ্গি হাতে গেছিল ওখানে গরু নিয়ে। জোয়ান ছেলে ভয় কাকে বলে জানে না। তা ছাড়া বাঘের উপদ্রবে সকলেই বিব্রত হয়ে পড়েছিল, তাই সে জিদ করে গেছল ওখানে। সারাদিন তন্ন তন্ন করে খুঁজেও সে যখন বাঘের দেখা পেল না তখন অনেকটা বিরক্ত হয়েই বাড়ী ফিরছিল গরু নিয়ে। কিন্তু ফিরবার সময় তার সন্দেহ হল। বাতাসের গন্ধে বুঝল বাঘ ওৎ পেতে বসে আছে কাছেই কোথাও। সে সাবধান হয়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছিল, এমন সময় দেখল একটা ঝোপের আড়াল থেকে একটা বাঘ তার ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্য তৈরী হচ্ছে। সেও টাঙ্গি হাতে সাবধান হল। বাঘটা যেই তার ঘাড়ে ঝাঁপিয়েছে সেও-তার সবশক্তি দিয়ে বসিয়ে দিয়েছে বাঘটার মাথায় এককোপ। সঙ্গে সঙ্গে বিকট গর্জন করে বাঘটা লাফিয়ে পড়ল একটু দূরে, কিন্তু ততক্ষণে থাবার আঘাতে মঙ্গুর ঘাড়ের মাংস খুবলে নিয়েছে। বাঘটা কিন্তু আর উঠতে পারল না, মঙ্গুও অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। গরুগুলোকে ছুটতে ছুটতে ফিরতে দেখে মঙ্গুর মা বুঝতে পারে নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের লোকজন নিয়ে গিয়ে দেখে মঙ্গু অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। মাথাতেও চোট্ খেয়েছে সে। বাড়ীতে নিয়ে এসে বুনো লতা দিয়ে রক্ত কোনরকমে বন্ধ হয়েছে। মধ্যে একবার জ্ঞান ফিরতেই বলেছিল বাঘটা সে কি করে

মেরেছে। কিন্তু তারপরই আবার অজ্ঞান হয়ে যায়। অনেক চেষ্টাতেও তার জ্ঞান না ফেরায় তারা হাসপাতালে এনেছে তাকে।

অপর্ণা তাদের সান্ত্বনা দিয়ে মঙ্গুকে ভর্তি করে নেয় হাসপাতালে। ডাক্তারবাবু তাড়াতাড়ি সেলাই করে দেন ক্ষতস্থান আর ইনজেকসন্ দিয়ে দেন। অপর্ণা অন্য সকলকে ফিরিয়ে দেয়, শুধু মঙ্গুর মা বাড়ী গেল না কিছুতেই। সারারাত অপর্ণা বসে থাকল মঙ্গুর মাথার কাছে। অন্য নার্স তাকে সারাদিন খাটুনির পর বাড়ী যেতে বলে কিন্তু অপর্ণা তার কথা শোনে না। বলে—'আমার কোন কষ্ট হবে না। এর জ্ঞান না ফিরলে কি করে বাড়ী যাই বল ?' নার্সটির পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও অপর্ণা সেখানেই বসে থাকল। তার মনে পড়ে কোলকাতার হাসপাতালে সেই আগুনে পুড়ে যাওয়া মেয়েটির কথা, যার যন্ত্রণা দেখে সে নার্স হবার প্রতিজ্ঞা করেছিল।

রাত যে কখন পার হয়েছে খেয়াল নেই অপর্ণার। রাত জাগা চেহারায় চোখেমুখে তার ক্লান্তি, কিন্তু তার মন অক্লান্ত। তার চমক ভাঙ্গে ডাক্তারবাবুর ডাকে। অবাক হয়ে তিনি বলেন—আশ্চর্য মেয়ে তুমি অপর্ণা। সামান্য একজন গ্রাম্য লোকের জন্য তোমার এ দরদ দেখে আমি সত্যিই অবাক হয়ে গেছি

অপর্ণা সলজ্জে বলে— ওরাও তো মানুষ ডাক্তারবাবু। এদের রক্ত প্রবাহিত যে ধমনীতে, আমাদের রক্তও সে ধমনীতে প্রবাহিত হয়। শুধু তফাৎ এই যে এরা শিক্ষা পায়নি, সভ্যতা জানে না। কিন্তু তার জন্য ঘৃণিত হবার মত কোন কাজই তারা করেনি। রং না হয় একটু কালো, শিক্ষা না হয় নেই, সভ্যতা না হয় জানে না কিন্তু এদের মত উদার মন কাদের আছে! শুধু সামান্য বাইরের প্রভেদটাই বড় করে দেখে এদের ঘৃণা করে দূরে থাকা যে ক৩ বড় পাপ তা আমি বুঝেছি ডাক্তারবাবু। দেখেছি এরা কত মহৎ. কত উদার, কত তৃপ্ত। এদের বঞ্চিত করে যে সুখ, যে আরাম আমরা ভোগ করছি তার জন্য নেই কোন অভিযোগ এদের, অথচ আমরাই এদের দূরে ঠেলে রেখেছি। মানুষ মানুষকে এত ছোট ভাবে কেন ডাক্তারবাবু আমার তা জানতে ইচ্ছে

করে। সভ্যতা-গর্বী মানুষকে ডেকে দেখাতে ইচ্ছে করে এদের জীবনকে, এদের উচ্চ মনকে। সত্যিই ডাক্তারবাবু, যাদেরকে দেখে আমাদেরও নিজেকে সংশোধন করা উচিত তাদেরকে আমরা দূরে ঠেলে রেখেছি অসভ্য বলে, ঘৃণা করছি অশিক্ষিত বলে, আর নিজেদের শিক্ষায়, সভ্যতায় গর্বে মাথা উঁচু করে বলছি—দেখ আমরা কত সভ্য, কত শিক্ষিত!

ডাক্তারবাবু কিছুক্ষণ মুগ্ধ চোখে তার দিকে তাকিয়ে থেকে বলেন—ধন্য তুমি অপর্ণা। তোমার সেবা ধন্য, তোমার দীক্ষা সার্থক। মানুষকে যে এত বড় করে দেখতে শিখেছ, তোমার দু' চোখের দৃষ্টি যে ভিন্ন নয় তা দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি। তুমি আমার মেয়ের মত অপর্ণা, তাই তোমাকে আজ আমি সর্বান্তঃকরণে আশীর্বাদ করে বলছি, তুমি বড় হবে, তুমি পাবে মানুষের ভালবাসা। তোমার আসার আগে প্রায়ই হাসপাতালে লোকে আসতে ভয় পেত, তারা বাড়ীতে রোগ যন্ত্রনা ভোগ করত তবু আসত না এখানে। তুমি আসার পর তাদের সে ভয় ভেঙ্গেছে, আমি সিট্ দিতে পারছি না। আরও একজন নার্স আনতে হয়েছে। সত্যিই অপর্ণা, তোমার নিঃস্বার্থ সেবায় তুমি হাসপাতালকে করেছ আদর্শ সেবাশ্রম। তোমাকে ধন্যবাদ দেব না, কারণ তাতে তোমাকে ছোট করা হবে কিন্তু তোমার এই সেবার আদর্শ যদি অন্যরা নিত অপর্ণা, তবে যারা রোগী তারা পেত আরাম। তারা নির্ভাবনায় হাসপাতালে আসত নিজেকে ভাল করে তুলতে। আর তাদের হাসিতে সেবা-দাত্রীরাও তৃপ্ত হত। তুমি এখন একটু বিশ্রাম নাও অপর্ণা, আমি এর ভার নিচ্ছি। তোমার নিজের শরীরটাও তো দেখতে হবে।

শান্তমুখে কোয়ার্টারে গিয়ে স্নান করে সামান্য কিছু মুখে দিয়েই আবার হাসপাতালে ফিরে আসে। ডাক্তারবাবু তাকে এবেলায় কাজ না করার জন্য বলা সত্ত্বেও অপর্ণা নিজের কাজ করতে থাকে। তাঁকে বলে—'আপনি উদ্বিগ্ন হবেন না, এর থেকে অনেক বেশী কষ্ট জীবনে সহ্য করা অভ্যাস হয়ে আছে। একটা রাত জাগায় আমার কিছু হবে না।'

মঙ্গুর জ্ঞান ফিরতেই সে অপর্ণাকে দেখে ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞাসা করে—আমার মা কোথায় ? আমি বাঁচবো তো দিদিমণি ?

তাকে আশ্বস্ত করে অপর্ণা। তার সেবায় কয়েকদিনের মধ্যেই মঙ্গু ভাল হয়ে উঠে। বাড়ী ফিরে যাবার দিন মঙ্গু কাঁদতে থাকে, অপর্ণার পা জড়িয়ে বলে—'দিদিমণি, আমি তোর কেনা চাকর হয়ে গেলাম। তুই যা বলবি তাই করবো, তোর জন্য জীবন দেব।' অপর্ণা জবাব দিতে পারে না, তার মনে হয় এরা তাদের ভালবাসায় তাকে বেঁধে ফেলেছে, তার সমস্ত প্রাণ জুড়ে আছে এরা।

দিন কেটে মাস পেরিয়ে যায়। গ্রামের জীবন যাত্রায় অপর্ণা নিজেকে বিলিয়ে দেয়। ঠাণ্ডা লেগে কদিন সর্দি জ্বরে একটু ভুগছিল অপর্ণা। কিন্তু পরে আর পারল না, শয্যাশায়ী হল। অপর্ণার সহকর্মী সুলতা রাগ করে বলে—'মানুষের শরীর তো, এত খাটুনী সহ্য হয় কখনো ? তখন বার বাব বলেছি একটু বিশ্রাম নে, তা নয়, জিদ বজায় রাখতে গেলি। এখন মজা বোঝ।' কিন্তু রাগ করেও চুপ করে থাকতে পারেনা সে, ডাক্তারবাবুকে তাড়াতাড়ি খবর দেয়। ডাক্তার বাবুও তাড়াতাড়ি চলে আসেন, কিন্তু কতক্ষণে অপর্ণা বেঁহুশ হয়ে গেছে। ডাক্তারবাবু ও সুলতার চেষ্টায় কয়েকদিন পরে রোগ একটু কমলো তবে খুব দুর্বল করে দিয়ে গেল। সুলতাকে বলে অপর্ণা—'তোর খুব কষ্ট হচ্ছে না রে ?' সুলতা আগুন হয়ে বলে—তোকে কি আমার সঙ্গেও ভদ্রতা করতে হবে ? তোর বাবাকে তার করা হয়েছে, তিনি আসুন তারপর তোর বাহাদুরী বার·হবে।

অপর্ণার অসুখে স্থানীয় সকলেই এসে খোঁজ নেয় তাদেব দিদিমণির। তাদের ব্যাকুল প্রশ্নে ডাক্তারবাবু অবাক হয়ে ভাবেন এরা কত ভালোবাসে অপর্ণাকে। খবর পেয়েই চলে আসে সুখেন অপর্ণার বাবাকে সঙ্গে নিয়ে। সুখেন চমকে উঠে অপর্ণাকে দেখে। বলে—কি করেছ শরীরটাকে অপর্ণা ? সেবা করতে এসে নিজেই যে সেবার যোগ্য হয়ে উঠেছ ?

মঙ্গু কাছেই ছিল, বলে উঠল—আর বলবি না, এত বলা সত্ত্বেও

শুধুই আমাদের জন্য খাটবে। ওর কি প্রাণের মায়া আছে, শুধু খাটতে জানে।

অনেক দিন পর সুখেনের দেখা পেয়ে অপর্ণা আনন্দে অধীর হয়। সুলতাকে বলে—দেখেছিস্ আমার দাদাকে? এঁরই চেষ্টায় আমি ট্রেনিং নিতে পেরেছি। শুধু তাই নয় এঁরই প্রেরণায় আমি নিজেকে গড়তে চেষ্টা করেছি। তোকে যার কথা বলেছি ইনিই সেই দাদা।

সুলতা শ্রদ্ধায় সুখেনকে তার প্রণাম জানায়। সুখেনের অনেক কথা সে শুনেছে, সুলতা বলে—কি যে মন্ত্র দিয়েছেন অপর্ণাকে দাদা, ও দিনরাত শুধু কাজ নিয়েই মেতে আছে। এত বলি নিজের শরীরটাও ঠিক রাখা দরকার, কিন্তু সে কথায় কান দিতেই চায় না। বলে দিন তো দাদা, শরীর ঠিক রাখাটাও মন্ত্রের অঙ্গ।

সুখেন খুব খুশী হয় এদের সহজ সরল ব্যবহারে। জায়গায়টাও তার খুব ভাল লাগে। শাল-মহুয়ার মিতালী পাতান বনানী, সবুজ পাহাড় আর ঝর্ণার তিরতির জল দেখে সুখেন আত্মহারা হয়। দেখে স্থানীয় দেহাতীরা শাল গাছের মতই উন্নতশির, মহুয়ার মতনই তাদের অন্তরের ভালবাসা মনকে মাতিয়ে দেয়। তার নিজের শরীরও একটু ভাল হয়ে উঠে। অপর্ণাও ইতিমধ্যে সেরে উঠেছে। সে জোর করে সুখেনকে কিছুদিন ওখানে রেখে দেয়। যাবার সময় সুখেন অপর্ণাকে বলে—তুমি আমার সঙ্গে চল কলকাতায়। তোমার শরীর এখনও তেমন সারেনি। কিন্তু তুমি এখানে থাকলে কাজ ছাড়া থাকতে পারবে না। কলকাতায় কিছুদিন বিশ্রাম নিয়ে আবার এখানে আসবে।

অপর্ণা বলে—না দাদা, তা হয় না। এমনিতেই অনেক দিন এদের অসুবিধায় ফেললাম। আবার ছুটি নিলে এদের খুবই অসুবিধা হবে। একেই আমাদের স্টাফ্ কম, সুতরাং ছুটি নিলে এরা সব কাজ সামলাতে পারবে না।

ওদের যাবার পর অপর্ণাও আবার কাজের মধ্যে ডুবে যায়। কিন্তু সমাজের যারা লেখাপড়া জানা, যাঁদের আমরা শিক্ষিত ও সভ্য বলি, যাদের টাকার কোন অভাব নেই, তাঁরা

অপর্ণার এত সুনাম সহ্য করতে পারল না। তারা ভাবে একজন সামান্য মেয়েছেলে গ্রামের সমস্ত ছোটলোকদের হাতের মুঠোয় করেছে। অপর্ণা যা বলে এই ছোটলোকগুলো হাসিমুখে তা করবে। অথচ তাদের কোনকথা তারা শুনবে না। তাই তারা অপর্ণাকে একটু আঘাত দেবার জন্য অপর্ণাকে সুখেন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে—'সে তার কেমন দাদা? তাদের সম্পর্কটা ত ভাই-বোন নয়?' অপর্ণা এই ধরণের কথায় প্রচণ্ড আঘাত পায়। সে ভাবে এরা এত সন্দেহপরায়ন কেন? এত নীচ কেন এদের মন? কিন্তু অপর্ণা বুঝতে পারে এই আঘাত তাকে ইচ্ছে করে দেওয়া হচ্ছে, আর সে আঘাতের প্রতিবাদ করতে গেলেই এরা সাংঘাতিক কিছু একটা করবে। তাই সে খুব সহজ ভাবে যেন এই কথা নিয়েছে তাই দেখাতে লাগল। স্থানীয় ভদ্র সমাজের মাথাওয়ালা লোকেরা তাদের এ চাল ব্যর্থ হল দেখে তারা কিছুটা বাঁকাপথ ধরল। তারা মেডিক্যাল অফিসারের কাছে অপর্ণার বিরুদ্ধে দরখাস্ত করল। অপর্ণার কাজে গাফিলতি এবং নৈতিক চরিত্র সম্বন্ধে কটাক্ষ করে তারা তাকে অপসারণের দাবী করল এই দরখাস্তে। কয়েকদিন পর মেডিক্যাল অফিসার নিজেই তদন্তে এলেন। তিনি প্রথমেই হাসপাতালের সিনিয়র ডাক্তারকে অপর্ণার কথা জিজ্ঞাসা করলেন তারপর তার বিরুদ্ধে গ্রামের লোকদের দরখাস্তের কথা বললেন। ডাক্তারবাবু অবাক হয়ে গেলেন এই নীচ ষড়যন্ত্র দেখে। তিনি বললেন—স্যার, আপনি কি বলছেন? ও আশার পর থেকে এই হাসপাতাল রোগীতে পূর্ণ হয়ে উঠেছে। যেখানে আগে এই হাসপাতালে কোন লোক আসতে চাইত না, যাকে তারা যমপুরী মনে করত সেখানে অপর্ণা আসার পর আমি জায়গা দিতে পারছি না। এসব চক্রান্ত স্যার। আমি বুঝেছি কাদের চক্রান্ত। আপনি আমার সঙ্গে সামনের পল্লীতে চলুন, দেখবেন তারা অপর্ণার সম্বন্ধে কি বলে? ওর বিরুদ্ধে আমরা কথা বললে ওরা আমাদের মারতে আসবে। ওরা ওকে দেবতার মত ভক্তি করে। ওর অসুখে দেখেছি ওরা কি ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। চলুন স্যার, আপনি নিজেই দেখে আসবেন আমার কথা সত্যি কিনা।

মেডিক্যাল অফিসার ডাক্তারবাবুর সঙ্গে যান সামনের পল্লীতে। গোপনে ওদের জিজ্ঞাসা করেন অপর্ণার কথা। শুনেই সকলে বলে উঠে- 'দিদিমণি আমাদের দেবতা বাবু। ও আমাদের মায়ের থেকেও বেশী।' অফিসার বুঝতে পারেন গ্রামের লোকের চক্রান্ত। ফিরে এসে তিনি অপর্ণাকে ডেকে বলেন—মা, আমি মুগ্ধ হয়েছি তোমার সেবার কথা শুনে। কিন্তু তবুও আমাকে জিজ্ঞাসা করতে হচ্ছে—কেন গ্রামেব লোকেরা, সকলে না হলেও কিছুলোক তোমার বিরুদ্ধাচরণ করে? তোমার কাজে তদন্ত করতে চায়?

অপর্ণা শান্ত, বিনয়ীভাবে উত্তর দেয়—হয়তো আমি কোন অন্যায করেছি স্যার। হয়তো ঠিকমত কাজ করতে পারিনি।

অফিসার বলেন—না মা, আমি নিজে স্থানীয় লোকেদের জিজ্ঞাসা করে দেখলাম তোমার প্রতি তাদের ভালবাসা. শ্রদ্ধা। তুমি কিছু মনে করো না মা, মানুষ মানুষের ভাল দেখতে পারে না। তাই প্রকৃত সৎলোককেও খারাপ প্রতিপন্ন কবতে চায়। কাঁটা যদি ক্ষুদ্র হয় তব তাতে আমাদের ব্যথা লাগে। তাই এদেব ব্যবহার তোমার খারাপ লাগবে। কিন্তু তাতে নিজের কর্তব্য যেন ভূল না হয়। তোমার কর্মজীবন আবও উজ্জ্বল হোক্, তুমি আরও বড় হও। তোমাব আদর্শ যেন কোনদিন কোন বাধা-বিপত্তিতে ভেঙ্গে না যায় সেদিকে লক্ষ্য রেখে কাজ কবে যাবে। উদ্দেশ্য যদি মহৎ হয় তবে কর্মে সফলতা অনিবার্য ভাবে সত্য।

অফিসার যখন চলে যাচ্ছেন তখন অপর্ণা তাঁর সামনে গিয়ে বলল— স্যার, একটা কথা আপনাকে বলতে পারি কি?

—'নিশ্চয়ই পারো মা। তোমার যা ইচ্ছা তুমি নির্ভয়ে বিনা দ্বিধায় বল।' অপর্ণা বলল—স্যার, এখানে জায়গার খুব অভাব। যদি আরও কয়েকটা বেডেব ব্যবস্থা করে দেন তাহলে খুবই ভাল হয়। যারা জায়গার অভাবে ভর্তি হতে পারছে না তারাও চিকিৎসা করাতে পারে।

ডাক্তারবাবুও সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন—স্যার, আমিও আপনাকে

একথা বলবো মনে করেছিলাম। কিন্তু বলবো বলবো করেও আপনাকে বলে উঠতে পারি নি। আরও কয়েকটা বেডের ব্যবস্থা করে দিলে খুব উপকার হয় স্যার।

মেডিক্যাল অফিসার প্রতিশ্রুতি দিলেন।

অপর্ণার উদ্যম আরও বেড়ে যায়। সে তার সবটুকু শক্তিকে সেবার কাজে নিয়োগ করে। ডাক্তারবাবুরা ও অন্য নার্সরাও তার সঙ্গে সহযোগিতা করেন, তার আদর্শে তাঁরাও নিজেদের উদ্বুদ্ধ করে তোলেন।

বেনামী দরখাস্তে যখন কিছু হল না, উল্টো সকলে অপর্ণার প্রশংসা করলেন, তখন কুচক্রী সভ্য নামধারী কয়েকজন বিশিষ্ট গ্রামবাসী রুদ্ধ আক্রোশে অপর্ণাকে হেয় করবার জন্য এক ফন্দি করল। গ্রামের প্রধান ধনী বাসুদেব রায়। তাঁর ছেলে চঞ্চল আই, এস, সি পাশ করে গ্রামে বসে আছে। কোন কাজ না থাকায় এবং ধনীর একমাত্র পুত্র হিসাবে হাতে প্রচুর টাকা থাকায় অল্পবয়সে নেশা, জুয়া আর অন্য উপসর্গে একটা দুর্দান্ত বদমায়েস হয়ে উঠেছে। সে আর তার দল পারে না এমন কোন কাজই নেই। তার ভয়ে সকলেই তটস্থ থাকত। এই চঞ্চলকে দিয়েই অপর্ণাকে অপদস্ত করার কথা ঠিক করল তারা। চঞ্চলও এভাবে প্রকাশ্যে স্থানীয় সমাজ চূড়ামণিদের সমর্থন লাভ করে খুশীমনে অপর্ণাকে সকলের সামনে অপদস্ত করতে রাজী হল। সেদিন থেকেই সে অপর্ণার পেছনে লাগ া। অপর্ণাকে রাস্তায় দেখতে পেলেই সে টিট্‌কিরি দিয়ে, পেছন পেছন গিয়ে নানা ভঙ্গীতে অপর্ণার দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করতে লাগলো। অপর্ণা বুঝতে পারে চঞ্চলের মতলব, তাই সে চঞ্চলকে দেখলেই তাড়াতাড়ি পাশ কাটিয়ে চলে যেতে চায়। একদিন রাস্তায় অপর্ণাকে ্কা পেয়ে চঞ্চল তার পথ রোধ করে দাঁড়াল। তারপর নানা কথায় তাকে প্রলোভন দেখাতে চেষ্টা করল। অপর্ণা নিরুপায় দেখে তাকে ভাল কথায় বোঝাতে গেল, কিন্তু তাতে সে দুরাত্মা প্রশ্রয় মনে করে যেই অপর্ণার হাত ধরল অমনি অপর্ণা চঞ্চলের গালে এক চড় দিয়ে প্রায় ছুটতে ছুটতে হাসপাতালে ঢুকলো। ডাক্তার-

বাবুকে সবকথা বলতেই তিনি তাকে সাবধান করে দিলেন আর কোনদিন সে যেন একা রাস্তায় না বার হয়। অপর্ণা বলে—'এভাবে একজন সবসময় পেছনে লাগলে কি করে মন দিয়ে কাজ করব?' ডাক্তারবাবু বলেন—'মা, জীবনে অনেক দুঃখ অনেক ব্যথা, অনেক আঘাত সহ্য করতে হয়। চঞ্চল বড়লোকের ছেলে, তায় তার বাবা সমাজের প্রধান। সুতরাং ওকে কিছু বললেই সে আরও জঘন্য কিছু করে বসবে। তুমি বরং নিজে একটু সাবধানে থাকবে। আমি ওর বাবাকে অবশ্য এসব কথা বলে আসব, কিন্তু কোন ফল হবে বলে মনে হয় না।'

অপর্ণার খুব খারাপ লাগে এ অভদ্রতা। একজন শিক্ষিত ছেলে যদি একাজ করে তাহলে অশিক্ষিতরা কি করবে? আর এর প্রতিবাদ করতে গেলেই সকলে উল্টো অপর্ণাকে দোষী করবে। কিন্তু দিনদিন চঞ্চলের ব্যবহারে অপর্ণা অতিষ্ঠা হয়ে গেল। তার অবস্থা দেখে ডাক্তার নিজে একদিন চঞ্চলের বাবার কাছে গিয়ে চঞ্চলের দুর্ব্যবহারের কথা বললেন। কিন্তু রায়মশায় ছেলের বিরুদ্ধে কথাশুনে অত্যন্ত রেগে ডাক্তারবাবুকে অপমান করলেন। ডাক্তারবাবু ক্ষুণ্ণমনে ফিরে এসে অনেক দুঃখে অপর্ণাকে বললেন—'এক শ্রেণীর অসভ্য ছেলে চিরকাল এভাবে লোকের পেছনে লাগে, কিন্তু তাতে মন খারাপ করে কোন লাভ নাই। তারসঙ্গে এমনভাবে ব্যবহার করা উচিত যে সে যেন মনে করে তুমি এসব কথায় একেবারে দৃঢ় হয়ে সব কিছু তুচ্ছ ভাবছো। তাতে একসময় সে নিজেই বিরক্ত হয়ে এসব অসভ্যতা ছেড়ে দেবে।'

অপর্ণাও বুঝলো সব। এদিকে শীতের প্রারম্ভে বসন্ত দেখা দিল। কাজের ভীড়ে অপর্ণা সব ভুলে গেল। কিন্তু কয়েকদিন পর শুনলো চঞ্চল বসন্তে আক্রান্ত হয়েছে। রায়বাবু হাসপাতালে কোন খবর না দিয়ে টাকার অহঙ্কারে শহর থেকে বড় ডাক্তার নিয়ে এলেন। তিনি দেখেই বললেন—এ খুব খারাপ রকমের বসন্ত। খুব সাবধানে সেবা করতে হবে রোগীকে, ওষুধে কোন কাজ হবে না। হাসপাতাল

যখন গ্রামেই আছে তখন রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি করে দিন।

রায়বাবু ও তাঁর স্ত্রী খুব ভয় পেয়ে গেলেন। একমাত্র ছেলের এ অবস্থা দেখে আতঙ্কে শীর্ণ হয়ে গেলেন। কিন্তু লজ্জায় হাসপাতালে নিয়ে যেতে পারলেন না। যাঁকে বাড়ীতে নিজেই কয়েক দিন আগে অপমান করেছেন তাঁকে কোন মুখে ছেলেকে দেখতে বলবেন? কিন্তু অপর্ণা যে মাত্র শুনলো চঞ্চলের খুব বাড়াবাড়ি অসুখ তখন সে ডাক্তারবাবুকে বলল—চলুন ডাক্তারবাবু, চঞ্চলকে দেখে আসি।

ডাক্তারবাবু হতবাক হয়ে বললেন—সেকি অপর্ণা? এই সেদিন পর্যন্ত তোমাকে এমন ভাবে অপমান করল যে বখাটে ছেলেটা তুমি তাকে দেখতে যাবে? আর জানইতো আমাকে পর্যন্ত ওর বাবা অপমান করে বাড়ীথেকে দূর করে দিয়েছিলেন? না অপর্ণা, শুধু শুধু অপমান সহ্য করতে যাওয়া ঠিক হবে না।

অপর্ণা বলে—জানি ডাক্তারবাবু। কিন্তু ওদের এত বড় বিপদের দিনে তুচ্ছ এ অপমানই বড় হবে? অন্যায় করেছে বলে তাকে দূরে সরিয়ে রাখলে সে কোন দিনই শোধরাতে পারবে না। তাছাড়া সেবাই আমাদের ব্রত, সুতরাং এ সময় আমাদের মত সেবিকারা না গেলে কে যাবে? চলুন ডাক্তারবাবু, কোন অপমানই আমাকে স্পর্শ করবে না। আমি তাকে ভাল করে তুলতে, তাকে আবার মানুষ করে তুলতে চাই। আমি জানি চঞ্চল কুসঙ্গে বখে গিয়েছে, কিন্তু ওর মধ্যে তেজ আছে ডাক্তারবাবু। সে তেজ যদি একবার ভাল কাজে লাগাতে পারি সে জয়ী হবেই। এ সুযোগ আর কোনদিন পাওয়া যাবে না ডাক্তারবাবু, চঞ্চলকে মানুষ করে তুলতেই হবে, আর সেই হবে আমার সব থেকে বড় জয়।

ডাক্তারবাবু বিস্ময়ে অবাক হয়ে ভাবেন তিনি কি স্বপ্ন দেখছেন? যে কয়েক দিন আগেও তাকে অপমান করতে ছাড়েনি তারই অসুখে নিজের সমস্ত দুঃখ অভিমান তুচ্ছ করে তারই সেবা করতে যাবে অপর্ণা, এ সত্যিই তাঁকে অবাক করে দেয়। তিনি অনেকক্ষণ

পরে ধীরে ধীরে বলেন—অপর্ণা, তুমি মহৎ, তোমার তুলনা নেই। তোমার আদর্শ, তোমার শিক্ষা ধন্য। ধন্য তোমার শিক্ষাগুরু, আর আমিও ধন্য তোমার মহৎ প্রানের পরিচয়ে। চল, দেখি কি করে চঞ্চলকে ভাল করে তোলা যায়।

দুজনে যখন রায়বাবুর বাড়ীতে পৌঁছলেন তখন দেখলেন সারা বাড়ী যেন কালবৈশাখী ঝড়ের পূর্বাভাসের মত থম্‌থমে হয়ে আছে। বাড়ীর ঝি-চাকর সব খারাপ অসুখ দেখে ভয়ে পালিয়েছে, এতবড় বাড়ীতে শুধু রায়বাবু ও তাঁর স্ত্রী রুগ্নপুত্রকে নিয়ে আছেন। ডাক্তারবাবু ও অপর্ণাকে দেখে তাঁরা অবাক হয়ে যান। রায়বাবু তাড়াতাড়ি ডাক্তার-বাবুর হাত ধরে ব্যাকুল হয়ে বলে উঠলেন—এসেছেন ডাক্তারবাবু? আমি যে ভাবতেও পারছি না একথা। দেখুন, দেখুন ঐ আমার একমাত্র ছেলে, যেমন করে হোক্ ওকে বাঁচিয়ে দিন। ডাক্তারবাবু আপনি যা বলবেন, যা চাইবেন, সব দেব, শুধু ওকে বাঁচিয়ে দিন।

ডাক্তারবাবু তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন—কোন ভয় নেই রায়বাবু। অপর্ণা যখন এসেছে আপনাদের চঞ্চল নিশ্চয়ই ভাল হয়ে উঠবে।

অপর্ণার নামে চমকে উঠে রায়বাবু তাড়াতাড়ি অপর্ণার কাছে গিয়ে বললেন—তুমি এসেছ মা, আমার বাড়ীতে এ চঞ্চলকে সেবা করতে? তুমি আমায় ক্ষমা কর মা, ওকেও তুমি ক্ষমা কর। তুমি ক্ষমা না করলে ও বাঁচবে না, কিছুতেই বাঁচবে না।

অপর্ণা তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল—ভয় কি? ও ঠিক ভাল হয়ে যাবে। আর ক্ষমা? ক্ষমা না করলে নিজে কি করে এখানে এলাম বলুন। ক্ষমা ওকে আমি করেছি।

তাঁরা দেখলেন চঞ্চলের সমস্ত শরীরটা বসন্তের গুটিতে ভরে গেছে। ওর চোখ-মুখ সবই গুটিতে ছেয়ে গেছে। গুটি এখনো পাকেনি তাই অসহ্য যন্ত্রনায় মাঝে মাঝে চঞ্চল চিৎকার করছে। অপর্ণা সঙ্গে সঙ্গে চঞ্চলের শুশ্রূষায় লেগে যায়। এতটুকু দ্বিধা নেই তার মনে।

অপর্ণার নিরলস সেবা দেখে, তার ক্লান্তিহীন সেবিকারূপ দেখে সকলেই চমকিত হন। রোগীকে ভাল করে তুলতে তার বিরামহীন

সেবা দেখে ডাক্তারবাবু ভয় পেয়ে যান। মনে হয় অল্পবয়সী এই মেয়েটি যেন প্রতিজ্ঞা করেছে তার সেবায় সকলকে জয় করে নেবে, কোন শত্রু থাকতে দেবে না। রোগীর বাড়ীর সকলকে সান্ত্বনা দেওয়া দেখে রায়বাবু ও তাঁর স্ত্রী সুরমা দেবীও অপর্ণাকে নিজের মেয়ের মত ভালবেসে ফেললেন। চঞ্চলও দেখে যাকে সে অপমান করেছে, যাকে হেনস্তা করতে প্রতিজ্ঞা করে সে রাস্তায় তাঁর নামে টিট্‌কারী দিয়েছে সেই অপর্ণা তার অসুখে নিজের প্রাণের বিপদ তুচ্ছ করে তাকে সেবা করছে। দেখে তার দু'চোখ জ্বালা করে উঠে। সে ভাবে অপর্ণা কি করে এত বড় মন পেল, কি করে সকলের জন্য মন প্রাণ দিয়ে সেবা কবতে পারে। লজ্জায়, নিজের আচরণে নিজের প্রতি ঘৃণায় সে অপর্ণাকে কোন কথা বলতে পারে না। শুধু চুপ করে তাব সেবায় নিজেকে সংশোধন করবার, নিজেও অপর্ণার মন্ত্র-শিষ্য হবাব, সকলকে সেবা করে অনুপম তৃপ্তি লাভ করবার প্রতিজ্ঞা করে, আর ভাবে কি করে এই দেবী সদৃশ নারীর কাছে ক্ষমা চাইবে। তার অন্তর্দ্বন্দ্ব হয়ত অপর্ণা কিছুটা বুঝতে পাবে কিন্তু সেও এ বিষয়ে কোন কথা বলে না। হয়ত অপর্ণা চঞ্চলকে সময় দিচ্ছে তার মনকে প্রস্তুত করতে, অনুশোচনার আগুনে নিজেব চরিত্র সংশোধন করে পবিত্র,নির্মল করে তুলতে। চঞ্চল কোন কিছুর প্রতিবাদ করতেও ভয় পায়, অপর্ণার সব নির্দেশ সে বিনা বাক্যব্যয়ে পালন করে। সে ভাবে কথা বললেই বোধ য় তার অপরাধ বেড়ে যাবে।

কিন্তু একদিন চঞ্চল আর চুপ করে থাকতে পারল না। বলে উঠল —অপর্ণাদি, আর আপানার কাছে ক্ষমা চাওয়া আমার ধৃষ্টতা, আপনিও ক্ষমা কবতে পারবেন কিনা জানিনা কিন্তু ক্ষমা আমাকে চাইতেই হবে। আপনি ক্ষমা করতে না পারলেও আমাকে ক্ষমা চাইতে হবে। বিবেকের দংশন বড় ভীষন। দিবারাত্রি অপরাধের জ্বালা, আমার অপকর্মের জন্য বিবেকের তীব্র দংশন আর সহ্য করতে পারছি না। আপনি যদি কোন শাস্তি দিতে চান তাহলে মাথা পেতে নেব সে শাস্তি, সে শাস্তি হবে আমার স্বর্গের আশীর্বাদ। যা করেছি তার শাস্তি যত

ভীষণই হোক, যত কঠিনই হোক্ সে শাস্তিতে আমি পাব পরম শান্তি। কারণ যে অন্যায় আমি করেছি সে অন্যায়ের কোন ক্ষমা নাই, মার্জনা নাই। আপনাকে আমি ভুল বুঝেছিলাম, ভুল আমাকে বোঝান হয়েছিল। মানুষ যে এত বড়, এত মহৎ হতে পারে, অন্ততঃ আজ এই যন্ত্রযুগেও যে সকলে যন্ত্র হয়ে যায়নি সে ধারনা আমার ছিলনা। সংকীর্ণ মন নিয়ে সকলকে বিচার করতাম, সকলকে ছোট ভাবতাম। কিন্তু চিরদিন আমি এ রকম ছিলাম না, আমার মন এত ছোট ছিল না। বড়লোক পিতার একমাত্র সন্তান হিসাবে অযাচিত ভাবে প্রচুর টাকা সব সময় পেয়েছি, ছোট থেকেই যে কোন আব্দার তাঁরা প্রশ্রয় দিয়েছেন কখনো সামান্যমাত্র কষ্ট পাইনি, তাই স্বভাবটা আমার একটু জেদী হয়েছিল। কোনদিন আমার কোন কাজেই আমার মা-বাবা একটু রুষ্ট হননি, তাই আমি ক্রমেই খেয়ালী, দুর্দান্ত হয়ে উঠলাম। কিন্তু এখানে যতদিন ছিলাম বা স্কুলের পড়া যতদিন শেষ হয়নি ততদিন খেয়ালী হলেও দুর্দান্ত হইনি। ততদিন স্কুলের শিক্ষকদের একটু শাসনে নিজের প্রকৃতি এত ঘৃণ্য হয়ে উঠেনি। গরীব সহপাঠিদের বা গরীব কাউকে দেখলেই কিছু সাহায্য করতাম, তাদের জন্য দুঃখবোধ করতাম। কিন্তু যেই কলেজে ভর্ত্তি হলাম অমনি আমার স্বভাবটা সম্পূর্ণ বদলে গেল। দেখলাম জীবন উপভোগ করবার নানা আকর্ষণীয় সামগ্রী বিলাসের প্রাচূর্য আর দুহাতে টাকা নষ্ট করবার মত বিবিধ উপকরণ। তাই দিন দিন আমি অধঃপাতের পথে নেমে চললাম। কয়েকজন বদমাইশ সঙ্গীকে আমার পথপ্রদর্শক করলাম, তাদের জীবনের কালিমায় নিজেকেও ডুবিয়ে দিলাম। আগেই বলেছি টাকার অভাব কোনদিনই হয়নি, তায় কলেজে ঢুকতেই বাবা প্রয়োজনের অতিরিক্ত টাকা পাঠাতে লাগলেন। টাকার প্রাচুর্য্যে আমি প্রথমটায় দিশেহাবা হয়েছিলাম, কিন্তু পরে কুসঙ্গীদের পরামর্শে মদ ধরলাম। তারপব ধরলাম জুয়া, রেস আরও কত কি যা আপনাকে বলতে আজ লজ্জা হচ্ছে। তাই ক্রমশঃ টাকায় টান পড়ল, আমি আরও টাকা পাঠাবার জন্য বাবাকে বললাম। মধ্যে মধ্যে এসে মায়ের কাছ থেকেও কিছু

টাকা নিয়ে যেতাম। এভাবে ক্রমশঃ অধঃপাতের মধ্যে নিজেকে সম্পূর্ণ ডুবিয়ে দিলেও পড়া শোনায় খুব খারাপ ছিলাম না বলেইকোন রকমে আই, এস, সি, পাশ করলাম। তারপর আমারও আর পড়তে ভাল লাগছিল না, বাবাও আমাকে ছেড়ে থাকতে রাজী হলেন না। সুতরাং পড়া শোনার পাঠ সেখানেই ইতি করলাম। কিন্তু ততদিনে কয়েকটা খারাপ অভ্যাস হয়ে গেছে, তার উপর গ্রামে সারা দিনরাত প্রায় বেকার বসে থাকতে থাকতে আমি আরো খারাপ হতে লাগলাম। প্রথম প্রথম আমার দুর্দান্ত স্বভাবের জন্য লোকে বাহবা দিত, আর বলত একটু একরোখা হওয়া ভাল, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তাদের কাছে আমার কাজের সমর্থন পেয়ে আমি একটা পাকা বদমাইশ হয়ে উঠলাম। তখন লোকে ভয়ে আমাকে কোন কথা বলতে সাহস করত না। তাই আপনাকে অপমান করবার জন্য তারা যখন প্রকাশ্যে আমারই সাহায্য চাইল আমি খুব খুশী মনেই আপনাকে অপদস্ত করতে রাজী হয়েছিলাম। তারপর সবই আপনি জানেন, শুধু জানেন না যে আমাকে একাজ করবার জন্য গ্রামের বড় বড় মাতব্বররা আমাকে বলেছিলেন। আপনি নাকি তাঁদেরকে ছোটলোক দিয়ে অপমান করেছেন তারা যেন তাঁদের কথা না শোনে সে সম্বন্ধে তাদের উস্কানি দিয়েছেন, এমনি কত কথায়, আপনার সম্বন্ধে কত নোংরা কথায় আমাকে উত্তেজিত করে ছিলেন তাঁরা। কিন্তু আজ আপনি আমার জীবনদাত্রী, আমার দেবী। শুধু প্রাণই দেননি, আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন আমি কত ঘৃণ্য, কত ছোট। আমাকে আবার মানুষ হবার, জীবনের সব মলিনতা ধুয়ে নূতন করে জীবন গড়ে তুলবার প্রেরণা দিয়েছেন। আপনার কাছেই শিখলাম মানুষকে ভালবাসতে, দুঃস্থের দুঃখে আনন্দ না করে তার দুঃখ দূর করার মাঝেই আনন্দ পেতে। জীবনে নানা অসৎ কাজ করলাম কিন্তু কোন দিন তৃপ্তি পাইনি। প্রকৃত আনন্দ কি তা জানতে পারিনি। কিন্তু আজ শুধু মাত্র আপনার স্পর্শে নিজে পবিত্র হয়ে সেবাধর্ম নেব এই চিন্তাতেই সমস্ত শরীরটা পুলকিত হচ্ছে। আজ থেকে চিরজীবন আমি আপনার কাছে ঋণী রইলাম। যদি

কোনদিন কোন কাজে এ অধমকে দরকার মনে করেন তাহলে শুধু একবার হুকুম দেবেন, দেখবেন এতদিন যে চঞ্চলকে শুধু মাতাল, লম্পট, জুয়াড়ী, চরিত্রহীন বলে জেনেছেন সেই চঞ্চল নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়েও তার জীবনদাত্রীর আদেশ পালন করবে। আর যদি সত্যিই ক্ষমা করতে পারেন তাহলে আদেশ করুন কি করে আমি আবার মানুষ হতে পারব, কি করলে আমার অপরাধের বোঝা কিছুটা হাল্কা হবে, কোন মন্ত্রে আমিও আপনার মত মহৎ না হতে পারলেও কিছুটা উদার হতে পারব? কোন দীক্ষায় নিজেকে সকলেব মাঝে প্রতিষ্ঠিত করে সকলের মন জয় করতে পারব, আপনাব এই জীবনদানকে কোন্ পুণ্যব্রতে সফল করতে পারব? বলুন অপর্ণাদি, ক্ষমা আমি পাব কিনা. আপনার শুচিতায় আমি আবার নির্মল হতে পারব কিনা?' বলতে বলতে চঞ্চল ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলে ছোট ছেলের মত।

অপর্ণার সারামুখ হাসিতে ভরে যায়। হাসিমুখে চঞ্চলের মাথায় হাত বুলিয়ে বলে—নিশ্চয়ই ক্ষমা করেছি ভাই, ক্ষমা করেছি বলেই ত তোমার কাছে আসতে পেরেছি। আজ থেকে তুমি হলে আমার ভাই, আর আমি তোমার দিদি। তুমি তোমার ভুল বুঝতে পেরেছ দেখে, তোমার অনুশোচনা দেখে, তোমার আত্ম-বিশ্লেষণ করে নিজের দোষ বুঝে চরিত্র সংশোধন করবার আগ্রহ দেখে আমি যে আজ কত আনন্দ পেলাম তা তোমাকে বোঝাতে পারব না ভাই। আমি জানতাম তুমি একদিন অনুতপ্ত হবে, একদিন তোমাকে ভাল হতেই হবে, চিরদিন কখনো তুমি কুপথে থেকে নিজেকে নষ্ট করতে পারবে না, তাই আমি তোমাকে ভাল করে তুলতে চেয়েছিলাম। আমি বুঝেছিলাম তোমার মধ্যে শক্তি আছে। যে কোন কাজ সফল করে তুলতে তুমি পারবে তাই আমি অপেক্ষা করছিলাম সেই পুণ্যদিনের। আজ সে পুণ্যদিন এসেছে—আজ কি আমি তোমাকে ক্ষমা না করে থাকতে পারি চঞ্চল। তোমরা হলে দেশের যুবশক্তি, দেশের ভবিষ্যৎ। দেশের প্রকৃত শক্তি তোমাদের মত যুবকদের নিয়েই, যারা দেশের ডাকে জীবন পণ করে

সাড়া দেয়। সমস্ত দেশ তোমাদের দিকে তাকিয়ে আছে, তোমাদের অনেক দায়িত্ব, অনেক কর্তব্য। অন্যায় করেছ সে কথা ঠিক, কিন্তু সেই অন্যায়ই কি বড় হবে? আজ যে তুমি অন্যায় বুঝতে পেরেছ তা সংশোধন করতে চাইছ তার কি কোন দাম নেই? নিশ্চয়ই আছে চঞ্চল। অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয় নিশ্চয়ই কিন্তু অন্যায় স্বীকার করে নিজেকে সংশোধন করতে চাইলে তাকে কি সে সুযোগ দেব না, না তাব সে অন্যায়ই বড় করে দেখে তাকে ঘৃণা ভরে দূরে ঠেলে রাখব? তাছাড়া তুমি আমাকে দিদি বলে ডেকেছ, তুমি আমার ছোট ভাই হয়েছ। দিদির কাছে ছোটভাই কত অন্যায় করে কিন্তু তাই বলে কি দিদি ভায়ের উপর রাগ করে থাকতে পারে? আমার কোন রাগ নেই চঞ্চল। একদিন হয়ত রাগ করেছিলাম কিন্তু আজ আর কোন রাগ নেই। তোমাকে আমার খুব দরকার। তুমি আমার কাছে শাস্তি চাইছিলে না? আর তুমি বৃথা সময় নষ্ট করতে পাবে না, অলস হয়ে বসে থাকতে পাবে না। তোমাকে কাজ করতে হবে, দেশের কাজ। মানুষের সেবা করার, দুঃস্থের দুঃখ দূর করার, অশিক্ষিতকে শিক্ষিত করার, বেকারকে কাজের সন্ধান দেবার, কৃষককে জমির ফসল ফলান আগ্রহী করবার কাজ তোমাকে দেব। আর সেই কাজ করাই হবে তোমার শাস্তি। আজ থেকে তোমাকে নূতন করে জীবন শুরু করতে হবে, তোমাকে বড় হতে হবে। ঘরের মধ্যে বসে থাকলে ত বড় হওয়া যায় না ভাই, তারজন্য চাই কাজ। নিজে কাজ শিখে অপরকে শেখাতে হবে, অন্ধকারের মাঝে আলো দেখাতে হবে, সকলের মাঝে জ্বালাতে হবে আশার দীপশিখা। তবেই হবে তুমি কর্মী, তুমি মানুষ। সমস্ত জীবন ধরে তোমাকে নিরলস ভাবে কাজ করে যেতে হবে। কোন আঘাত, কোন ব্যর্থতা যেন তোমাকে নিরাশ না করে। কোন প্রতিদানও তুমি চাইবে না। শুধু কাজই হবে তোমার মন্ত্র। আমাকে যিনি কাজের প্রেরণা দিয়েছিলেন তিনি আমাকে বলেছিলেন—'কাজের মাঝে তোমাকে প্রতিষ্ঠালাভ করতে হবে। নিজের জন্য নয়, দেশের জন্য কাজই হবে তোমার একমাত্র মন্ত্র।'

সেই মন্ত্রে আজ তোমাকেও আমি দীক্ষা দিলাম। দেখ দেশের আজ দরকার ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, কুশলী যন্ত্রী। তোমাকে ডাক্তার হতে হবে চঞ্চল। দেখ তোমার গ্রামের প্রায় অধিকাংশ লোকই স্বাস্থ্যহীন, সামর্থ্যহীন। তাদের সেবা করে সুস্থ সবল করে তুলতে হবে। তোমাকে আজ আমায় কাছে প্রতিজ্ঞা করতে হবে তুমি আমার কথা রাখবে কিনা, তোমার সেবায় তোমার গ্রামের এই স্বাস্থ্যহীন লোকদের স্বাস্থ্যবান করে তুলবে কিনা?

চঞ্চল বলে—নিশ্চয়ই দিদি আপনার আদেশ আমি শিরধার্য করে নিলাম। আপনার ক্ষমা যে আমার প্রধান সহায়। আশীর্বাদ করুন দিদি, আপনার ভাই যেন বড় হতে পারে, আপনার মত অনলস সেবা যেন তার একমাত্র লক্ষ্য হয়।

অপর্ণা আর নিজেকে স্থির রাখতে পারে না। আনন্দে তার চোখ চিক্ চিক্ করে উঠে। সে চঞ্চলকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে। চঞ্চলও কোন কথা না বলে নীরবে তার চোখ-মুখের উজ্জ্বলতায় প্রমাণ করে তার প্রতিজ্ঞা সে নিশ্চয়ই রাখবে।

রায়বাবু ডাক্তারবাবুর কাছে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তাঁর পূর্বের দুর্ব্যবহারের জন্য ক্ষমা চান। অপর্ণাকে বলেন---তোমার ঋণ শোধ করা যায় না, শোধ করতে যাওয়া ধৃষ্টতা। কিন্তু মা, আমি তোমাকে কিছু দিতে চাই। কোন সংশয় না করে তুমি যা চাইবে মা, তোমার এই ছেলে হাসিমুখে তা দিতে রাজী আছে। এ তোমাকে দান নয়, এ আমার নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত। তোমার যা ইচ্ছা বল আমি কথা দিচ্ছি, তা আমি রাখবই।

অপর্ণা বলে—যদি সত্যিই আমাকে কিছু দিতে চান তাহলে গ্রামে একটা স্কুলের খুব প্রয়োজন। দেশকে, গ্রামকে যদি উন্নত করতে হয় তাহলে শিক্ষার প্রসার অতি প্রয়োজনীয়। শিক্ষা ব্যতিরেকে কোন দেশ, কোন জাতি বড় হতে পারে না। কিন্তু এখানকার গরীব ছেলেরা পয়সার অভাবে পড়তে পারছে না। পড়বার ইচ্ছে তাদের আছে শুধু আর্থিক অনটনই তাদের বাধা দিচ্ছে। সুতরাং আপনি যদি গ্রামের

এই অবহেলিত গরীব ছেলেদের জন্য একটা স্কুল করে দেন তাহলে আমি কৃতার্থ হব।

রায়বাবু তৎক্ষণাৎ আনন্দে রাজী হয়ে গেলেন। তিনি প্রথমে তাঁর বাড়িতেই একটা পাঠশালা বসালেন আর তার ভার দিলেন অপর্ণার উপর। গ্রামের লোকেরা অবাক হয়ে গেল। ভাবল এ কি করে সম্ভব? যে লোক নিজের স্বার্থ ছাড়া একপা চলত না সেইলোক এত টাকা খরচ করছে পরের জন্য। কি আশ্চর্য পরিবর্তন!

অপর্ণার কাজ আরও বেড়ে গেল। হাসপাতালের ডিউটি, গ্রামে গ্রামে গিয়ে সকলের খোঁজ খবর নেওয়া, আবার পাঠশালার সব দায়িত্ব তার উপর। চঞ্চলও মেডিক্যালে কলেজে ভর্তি হয়ে পড়তে চলে গেল। কাজেই অপর্ণার কাজের চাপ বেশ বেড়ে গেল। খেটে খাওয়া লোকেরা বোঝে না লেখাপড়ার সার্থকতা। তারা বলে—দিদিমণি, আমাদের ছেলেরা লেখাপড়া শিখে কি করবে? তারা কি সবাই জজ ম্যাজিস্ট্রেট্ হবে? আর তারা লেখাপড়া শিখতে গেলে আমাদের কাজ কি করে চলবে? একেই তো সকলে মিলে কাজ করেও কোন রকমে দু'মুঠো খাবার জুটছে, আবার ওরা চলে গেলে আমরা সবদিক কি করে সামলাব? লেখাপড়ার খরচই বা দেব কেমন করে? তারচেয়ে তারা যেমন আছে তাই থাক দিদিমণি, ওদেরও কাজ শেখা হবে, আমাদেরও কিছুটা সাহায্য করা হবে।

কিন্তু অপর্ণা তাদের বোঝাতে চেষ্টা করে নানাভাবে। তাদের সামনে তুলে ধরে ভবিষ্যতের রঙিন স্বপ্ন। অপর্ণাকে তারা সকলে ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে, তাই তারা আপত্তি সত্ত্বেও ছেলেদের পাঠাতে রাজী হল। কিন্তু অন্তরের সঙ্গে ছেলেকে পাঠশালায় পাঠাতে পারছে না দেখে অপর্ণা তাদের বলল—তোরা এত চিন্তা করছিস কেন? লেখাপড়া শেখা তাদের খুবই প্রয়োজনীয়। দেখ্ তোরা যারা চাষ করিস তারা শুধু খেটেই যাস কিন্তু প্রায়ই ভাল ফসল পাস না। তোদের ছেলে লেখাপড়া শিখে বুঝবে কেন ভাল ফসল পাওয়া যাচ্ছে না। জমিতে ভাল সার দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে নানা ফসল বুনে তারা যেমন

ফসল বেশী ফলাবে তেমনি একই জমিতে নানারকম ফসল ফলাতে শিখবে। তাছাড়া কোন জমিতে কি ফসল ভাল হবে, পোকা-মাকড় যেন ফসল নষ্ট না করতে পারে তারজন্য বিভিন্ন কীটনাশক ওষুধ দিয়ে অনেক বেশী ফসল ফলাবে আর উৎপন্ন ফসল নষ্ট হবে না। এতে তোদেরও লাভ হবে। লেখাপড়া শিখে তাদের ভালই হবে, তোদেরও তারা তখন সাহায্য করবে।

তারা উত্তর দেয়—দিদিমণি, লেখাপড়া শিখে তারা তখন ভদ্রলোক হবে। জামা-কাপড় পরে তারা চুল আঁচড়াবে, মাঠের ধারে কাছেও যাবে না। হাল ধরতে তাদের তখন লজ্জা হবে, এমনকি আমাদেরকেও মুখ্যু বলে মানতে চাইবে না। তখন ফসল ফলবে কি করে দিদিমণি? তারা তখন কল-কারখানায় কাজ করতে যাবে শহরে। গ্রামকে তারা ঘৃণা করবে, আমাদেরকে আমাদের ছেলেরাই দূরে ঠেলে রাখবে, মাঠে ফসল বুনতে তারা লজ্জাবোধ করবে। না দিদিমণি. বাবুরা আমাদের ঘৃণা করে করুন কিন্তু ঘরের ছেলেও আমাদের ঘৃণা করবে, মুখ্যু বলে কথা বলবে না, গ্রামে না থেকে ভিটে ছেড়ে শহরে যাবে তা কি করে সহ্য করব? তাই লেখাপড়ার নামেই আমরা ভয় পাই। দেখেছি লেখাপড়া শিখে কেউ গ্রামে থাকতে চায় না, গ্রামের লোকদের অসভ্য মনে করে, শহরের চোখ ধাঁধান জৌলুস তাদের অন্ধ করে দেয়, বাড়ী ছাড়া করে। আমাদের সাধের জমি, পিতৃ-পুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে তারা শহুরে বাবু হবে তা আমরা কিছুতেই সহ্য করব না। তার থেকে মুখ্যু হয়ে গ্রামে থাক্, সেও ভাল।

অপর্ণা বোঝে কোথায় তাদের ভয়, কোথায় তাদের আসল ব্যথা। বলে—না, লেখাপড়া শিখে সকলে শহরে চলে যাবে না। কল-কারখানার কাজ করার থেকেও মাঠে ফসল ফলান অনেক বেশী লাভজনক, অনেক বেশী স্বাধীন তা' তারা নিশ্চয়ই বুঝবে। বুঝবে যে যারা কৃষক তাদের দরকার দেশের সবথেকে বেশী। জাতির জীবনে অন্ন সমস্যা থাকলে সে জাতি সে দেশ কোনদিন বড় হয় না, সুতরাং দেশের প্রয়োজন ভাল কৃষকের। আর ভাল কৃষক হতে গেলে

লেখাপড়া যে শিখতেই হবে। কল-কারখানায় কাজ করার থেকে বেশী সম্মান কৃষকের এ তারা বুঝবে। তোরা আপত্তি করিস না, আশীর্বাদ করে তোদের ছেলেকে আমাদের পাঠশালায় ভর্তি কর। তারা মানুষ হয়ে বাঁচতে শিখুক, পৃথিবীর সঙ্গে পরিচয় হোক তাদের। বই পড়ে, লোকের সঙ্গে আলোচনা করে তারা জ্ঞানলাভ করুক, উন্নতি করুক চাষের। নিজেদের আর সেইসঙ্গে অন্যের দুঃখ দূর করুক।

অপর্ণার ইচ্ছায় তারা শেষ পর্যন্ত ছেলেদের ভর্তি করে পাঠশালায়। রায়বাবু তাদের বইপত্তরও কিনে দেন। গ্রামের আর একটি ছেলে পডাতে রাজী হয় তাদের, অপর্ণাও মাঝে মাঝে কাজের অবসরে পড়াতে থাকে। রায়বাবু নিজের খরচায় তাঁরই বাড়ীর কাছে স্কুলের জন্য বাড়ী আরম্ভ করেন। বাড়ীও খুব তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে গেল। নূতন বাড়ীতে একদিন পাঠশালা স্থানান্তরিত হয়ে উদ্বোধন করার জন্য দিন ঠিক হল। রায়বাবু অপর্ণার নাম অনুযায়ী স্কুলের নামকরণ করবার কথা ভেবেছিলেন, কিন্তু অপর্ণার আপত্তিতে শেষ পর্যন্ত তা হয়ে উঠল না। উদ্বোধন করলেন শহরের এক বিখ্যাত ব্যক্তি। ডাক্তারবাবু, রায়বাবু ও অপর্ণা তাদের এই নব প্রতিষ্ঠানকে সরকারী অনুমোদন লাভ করবার জন্য আবেদন করল।

অপর্ণা তার বাবাকে ওখানে চলে আসতে লিখলে তিনি এসে স্কুলের কিছুটা ভার নিলেন। অপর্ণাও কিছুটা হাল্কা হল। ললিতবাবু আর্টিস্ট, সুতরাং অল্পদিনের মধ্যেই স্কুলটি সুন্দরভাবে সাজিয়ে নিলেন। অনেকদিন পর মনমতো কাজ পেয়ে তিনি এই বৃদ্ধ বয়সেও যুবার ন্যায় পরিশ্রমী হয়ে উঠলেন, তাঁর স্বপ্ন সফল হল। তিনি ছেলেদের ছবি এঁকে, গল্প করে আপন করে নিলেন। তারাও ছবির মাধ্যমে পড়া শিখতে লাগল খুব তাড়াতাড়ি।

ছুটিতে চঞ্চল এল গ্রামে। কলকাতায় সুখেনের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। দেখেছে তার অপর্ণাদির দীক্ষাগুরুকে। দেখে মুগ্ধ হয়েছে, নিজে আরও দৃঢ় হয়েছে। সে দেখেছে অপর্ণা সুখেনের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধায় তার চরণে প্রণতি জানায়, সুখেনের জন্যই সে পেয়েছে আনন্দময়

জগৎ। ছুটির দিনে স্কুলের ছেলেরা প্রায় বিনা কাজে সময় নষ্ট করে। সুতরাং সকলে পরিকল্পনা করল তাদেরকে সে সময় উন্নতিমুলক কাজে নিয়োগ করলে ছোট বয়সেই তাদের মন সমাজসেবার উপযোগী হয়ে উঠবে, তাদের চরিত্রও দৃঢ় হবে। গ্রামের রাস্তা, পুকুর, প্রভৃতি সংস্কার করা ইত্যাদি নানা কাজে সকলে একসঙ্গে কাজ করে বেশ তৃপ্তি পায়। যারা একদিন অপর্ণার বিরুদ্ধে ছিল তারাও ক্রমে ক্রমে অপর্ণার সহযোগিতা করে, তাকে সমাদর করে। স্কুলও সরকার কর্তৃক মঞ্জুর হয়ে গেল।

চঞ্চল এখন মেডিক্যাল কলেজের নামকরা ছাত্র। যেমন লেখা পড়ায় তেমনি ব্যবহারে। পূর্বস্মৃতি রোমন্থন করে চঞ্চল নিজেই অবাক হয়, লজ্জা পায়। লেখাপড়ায় চঞ্চল বরাবরই ভাল কিন্তু তার ব্যবহার ছিল অমার্জিত। আজ সে ভদ্র বিনয়ী। নিজের আচরণে নিজেই আনন্দ পায়, দেখে মন তার পূর্ণ হয়ে উঠেছে। একদিন সে এককাণ্ড করে বসল। বেড়াতে বার হয়েছিল, ফিরতে রাত হল। ফিরবার সময় দেখে রাস্তায় এক অন্ধ লোক খুব কাঁদছে। জিজ্ঞাসা করে জানল তার একমাত্র ছেলে কয়েকদিন হল মারা গেছে। এতদিন তার একটা চোখ খারাপ ছিল-কিন্তু অন্যটিতে কিছুটা দেখতে পেত। কিন্তু কিছুদিন থেকে সে চোখেও দেখতে পাচ্ছে না। ছেলেটি তার হাত ধরে ভিক্ষা করে বেড়াত, সে মারা যাওয়ার পর তাকে দেখবার কেউ নেই। দু-তিন দিন সে কিছুই খায়নি। তাই তার অদৃষ্টকে গালমন্দ করছে আর কাঁদছে। চঞ্চল তাকে সঙ্গে করে তার নিজের রুমে নিয়ে এসে খাওয়াল। ছেলেরা দেখে অবাক। ভাবে নিশ্চয়ই ওর মাথা খারাপ হয়েছে। তাকে তারা বলে—'তুই একটা ছোটলোক ভিক্ষুককে কি করে তোর বিছানায় শুতে দিলি? তোর নিশ্চয়ই মাথা খারাপ হয়েছে।' চঞ্চল রাগ করে বলে—মানুষ আবার ছোটবড় হয়ে জন্মায় নাকি? আমি ওর চিকিৎসা করাব।

ছেলেদের হাজার ঠাট্টা হাসি তাকে তার কর্তব্য থেকে ফেরাতে পারে না। তাদের সব কথাই সে হেসে উড়িয়ে দেয়। পরের দিন

ডাঃ সোমকে সে সব কথা খুলে বলে। ডাঃ সোম একজন নামকরা সার্জেন। চঞ্চলকে তিনি খুব ভালবাসতেন, তাই তার কথায় তিনি মুগ্ধ হয়ে গেলেন। বললেন—'তোমার ডাক্তারী শেখা সার্থক চঞ্চল। আমি নিজে ওর অপারেশন করব, তুমি ওকে আজই ওয়ার্ডে ভর্তি করে দাও।' ডাঃ সোম আরও কয়েকজন সার্জেনের সাথে পরামর্শ করে অপারেশন করলেন। সার্থক অপারেশন। মাস কয়েকের মধ্যেই লোকটি তার দৃষ্টি ফিরে পেল! সে যখন ডাঃ সোমকে বলল—'আমি আবার সব দেখতে পাচ্ছি', সেদিন দুজনের সে কি আনন্দ! চঞ্চল ভাবে সার্থক হল তার দিদির আশীর্বাদ।

অনেক রাতে নিজের রুমে ঢুকে জানলার কাছে গিয়ে বসল চঞ্চল। তার মন আজ আনন্দে পূর্ণ। সে ভাবে কিছুদিন আগেও সে কি দুর্দান্ত বদমাইশ ছিল। উঃ, কি নির্দয়ই না সে ছিল? তার পাষণ্ডবৎ আচরণে কত লোকের সর্বনাশ হয়েছে। সেদিন লোকের সর্বনাশ করে, তাদেরকে আঘাত করে সে আনন্দ পেত। কিন্তু সে আনন্দের সঙ্গে আজকের আনন্দের কত তফাৎ! পূর্বস্মৃতি স্মরণে তার দু'চোখ জলে ভরে যায়। মনে পড়ে তার অপর্ণাদির কথা, সে তার মহৎ প্রাণের পরিচয় দিয়ে তাকে বাঁচিয়েছে। কৃতজ্ঞতায় তার উদ্দেশ্যে দুহাত তুলে প্রণাম করে চঞ্চল। হঠাৎ তার মনে হল এ আনন্দ সংবাদ সে এখনও তার দিদিকে দেয়নি, তৎক্ষণাৎ অপর্ণাকে চিঠি লিখতে এসে দেখল টেবিলের উপর তার নামে অপর্ণার চিঠি। আনন্দে আত্মহারা হয়ে তাড়াতাড়ি চিঠিটা খুলে এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলল চিঠিটা। কিন্তু চিঠিটা পড়েই তার চোখের সব দীপ্তি যেন নিভে গেল। সে পাথরের মত চুপ করে বসে রইল। অপর্ণা লিখেছে—

স্নেহের ভাই চঞ্চল,

আজ বেশ কয়েকবছর আমি তোদের কাছে এসেছি। এতদিন পর আজ আমি অন্য জায়গায় চলে যাচ্ছি। খুবই খারাপ লাগছে তোদের স্নেহের পাশ থেকে চলে যেতে। হাসপাতাল, স্কুল, এর আশে পাশে যে গ্রামগুলি রয়েছে তার প্রতিটির সাথে আমি এমনভাবে

জড়িয়ে গিয়েছি যে আজ সে বাঁধন থেকে মুক্তি নিতে যে কি ব্যথা তা আমি চিঠিতে তোকে জানাতে পারব না। তোদের সকলের প্রীতি, ভালবাসা, মমতা ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে দূরে। সরকার আমাকে মেট্রন করে রাঁচীতে পাঠাতে চান। আমি অনেক চিন্তা করে দেখলাম এখানে আমার কাজ প্রায় শেষ হয়েছে, আর নূতন কোনকিছু করবার মত ক্ষমতা আমার নেই। এখন সব কাজের ভার তোর উপর। তোর উপর আমার অনেক আশা-ভরসা। আর তো মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই তুই আসছিস্। এদিকে হাসপাতালেও আরও ডাক্তার, নার্স এসেছেন। স্কুলেও কয়েকজন নূতন শিক্ষক কাজ করছেন। সুতরাং আমার আর দরকার হবে না। তাই সরকারের এই ট্রান্সফার আমি মেনে নিয়েছি। আমার সব থেকে খারাপ লাগছে এখানকার লোকদের প্রাণভরা ভালবাসা ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে বলে। কিন্তু কি করব বল্? কষ্ট হলেও উপায় নেই। সরকারী চাকরী, তায় বেশ উন্নতি হচ্ছে। তাই আমি কয়েকদিনের মধ্যেই চলে যাচ্ছি। জানি আমার এ চিঠি পেয়ে তুই খুব রাগ করবি। আস্তে আস্তে তোরা আমাকে ভুলে যাবার চেষ্টা করিস ভাই। আমার পরিবর্তে আবার কেউ আসবে। আর এতো পৃথিবীর চিরন্তন রীতি। দিদির উপর রাগ করে নিজের কোন ক্ষতি করিস না যেন।

আমার শেষ কথা—যে ভাবেই হোক্, যেমন করেই হোক্ তোকে বড় হতে হবে। মানুষের মত মানুষ হয়ে সকলের সামনে মাথা তুলে দাঁড়াতে হবে। কোন বাধা যেন তোর পথরোধ করে থাকতে না পারে। তোর দিদির অনুরোধ রাখলে আমি যেখানেই থাকি না কেন, তোর ডাকে নিশ্চয়ই সাড়া দেব। ভবিষ্যতের সেই সোনালী দিনের আশায় আমি থাকব। ইতি

অপর্ণাদি।

চিঠিটা হাতে নিয়ে চঞ্চল দিশেহারা হয়ে যায় অপর্ণার প্রতি অভিমানে, দুঃখে তার মন পরিপ্লুত হয়ে যায়। অপর্ণা যে আজ স্বার্থের জন্য তাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছে এ চিন্তা তাকে যেন পাগল করে দেয়।

এ কি সম্ভব ? সে ডাক্তারী পড়ছে দেশের সেবা করতে, আর অপ
তার নিজের স্বার্থে চলে যাচ্ছে দূরে ? তাহলে কি হবে ডাক্তারী পড়ে
কার কাছে সে পাবে প্রেরণা, আশা-ভরসা ? কতক্ষণ এভাবে স্তব্ধ হ
সে বসেছিল, কখন চোখের জলে তার দু'টি গাল ভিজে গেছে খেয়া
করেনি। তাই খাবার ঘণ্টা পড়তে পাশের রুমের সুবীর যখন তা
ডাকতে এসে সে কাঁদছে দেখে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল—'কি রে তু
কাঁদছিস্ ?' তখন লজ্জা পেয়ে চোখের জল মুছে চঞ্চল বলে—'না, চো
কি যেন একটা ঢুকেছে, তাই জ্বালা করছে।' কিন্তু খেতে গেল
চঞ্চল, তার সব আশাভঙ্গে সে একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়ল। সম
রাত জেগে নানা চিন্তাতেও সে যখন কোন পথ দেখতে পেল না ব
অপর্ণা চলে যাবে এই চিন্তাতেই সে মুষড়ে পড়তে লাগল তখন ঠি
করল ভোরেই বাড়ী চলে যাবে। দিদির সঙ্গে ঝগড়া করবে, যে
করেই হোক্ তাকে আটকে রাখবে তাদের গ্রামে। ভোর হতেই ব্যথ
ক্লান্ত মন নিয়ে সে রওনা হল গ্রামের দিকে।

গ্রামে পৌঁছেই চঞ্চল অপর্ণার কোয়ার্টারে একরকম ছুটতে ছুট
ঢুকে পড়ল। অপর্ণা তখন কোথায় যাবার জন্য তৈরী হচ্ছে। হঠা
চঞ্চলকে দেখে সে একটু অবাক হয়ে গেল। চঞ্চল অপর্ণার সাম
গিয়ে বেশ ঝাঁঝের সঙ্গে বলে উঠল—কি মনে করেছ তুমি ? তোমা
কোথাও যাওয়া-টাওয়া হবে না।

অপর্ণা তার কথায় একটু হেসে বলে—কেন রে চঞ্চল, তোর হুকু
নাকি ? কিন্তু কি করব বল, সরকার বদলী করেছে, আর আমি
যেতে রাজী হয়ে যাবার ইচ্ছা জানিয়ে দিয়েছি। এখন আর কো
উপায় নেই।

—'কেন উপায় থাকবে না, এখনই টেলিগ্রাম করে জানিয়ে দা
তুমি যাবে না। ব্যাস, তাহলে আর যেতে হবে না। আর তাতে য
সরকার না মানতে রাজী হয় তাহলে ছেড়ে দাও চাকরী। এখানে
তোমাকে ভাল একটা চাকরী করে দেব আমরা। আর যদি তোম
নিজেরই ইচ্ছা না থাকে এখানে থাকতে তাহলে বল কেন এমন ক

সকলকে ভালবাসায় বেঁধে ফেলেছ? কি দরকার ছিল আমাকে বাঁচাবার? কি পাপ করেছিল এখানকার সরল নিরীহ গ্রামবাসীরা যে তাদের এভাবে আঘাত দিয়ে ব্যথা দেবে? বল তুমি, বলতেই হবে আজ।' চঞ্চলের কথার সুরে বেদনার গভীর আভাসে সমস্ত বাতাস যেন ভারী হয়ে উঠে।

অপর্ণা একটু দুঃখের সঙ্গে বলে—আজ অনেকদিন হল তোদের গ্রামে এসেছি। প্রথম প্রথম একা সব কাজ করতে হত। কিন্তু আজ তুই আমার কাজের ভার নিয়েছিস্, সকলেই আজ বুঝতে পেয়েছে তাদেব ভুল। যদি কোন কাজ অসমাপ্ত রইল মনে হয় তাহলে তুই সে কাজ সম্পূর্ণ করবি। তোরই উপর দিলাম আমার সব কাজের ভার। এই শান্ত পরিবেশ ছেড়ে যেতে আমারই কি ভাল লাগছে? কিন্তু উপায় নেই, কোন উপায় নেই। তাছাড়া আমারও ভবিষ্যৎ বলে একটা কিছু আছে ত? আমার উন্নতিতে তোরা বাধা দিবি কেন?

—উঃ, আমি এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না। তুমি সত্যি আমাদের ছেড়ে চলে যাবে। কাল যখন তোমার চিঠি পেলাম মনে হল এ যেন দুঃস্বপ্ন দেখছি। এ হতে পারে না। সারারাত একটুও ঘুমুতে পারিনি, বিছানা যেন কাঁটার মত বিঁধতে লাগল। শেষে মনে হল এ ভাবে আমি বোধ হয় পাগল হয়ে যাব। তাই ভোর হতেই ছুটে এলাম তোমার কাছে। তোমাকে জিজ্ঞাসা করব সত্যি তুমি চলে যেতে চাও কিনা। এখন দেখছি সত্যি সত্যি তুমি চলে যেতে চাচ্ছ। দেখলাম তুমিও সামান্য মানুষের মত নিজের স্বার্থ বড় করে দেখছ। স্বার্থত্যাগ করার বদলে নিজেও স্বার্থপর হয়ে উঠেছ। এই গ্রাম, যাকে তুমি নিজেব হাতে গড়েছ, সেই গ্রাম ছেড়ে শহরের প্রাণহীন জীবনই তোমাব কাছে বড় হল? যে জিনিস তুমি নিজের হাতে তিল তিল করে গড়েছ, যার জন্য অনেক দুঃখ, অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করেছ হাসিমুখে, শত বাধাবিপত্তির মাঝেও নিজের কর্তব্যপথে অটল থেকেছ, যার প্রতিটি অণুতে তোমার স্বেদ, তোমার রক্ত, তা তুমি ছেড়ে যাবে? একদিন তোমার প্রতি আমি অন্যায় করেছিলাম, তোমাকে পশুর মত আঘাত দিয়ে এখান থেকে

তাড়াতে চেয়েছিলাম, কিন্তু সে যেমন সত্যি, তেমনি সত্যি যে আজ আমি তোমাকে নিজের দিদির মত ভালবাসি। সেদিন তোমাকে চিনতে না পেরে, তোমাকে বুঝতে না পেরে আমার পশুপ্রকৃতিতে তোমাকে আঘাত দিয়েছিলাম। কিন্তু আজ আমার সেই ঘৃণ্য আচরণে নিজেই হার স্বীকার করেছি। তোমার ইচ্ছায়, তোমার আশীর্বাদে বড় হবার স্বপ্ন দেখছি। বলদিদি সে স্বপ্ন কি মিথ্যা ? আমি কি তোমার মত মহৎ, তোমার মত উদার হবার যে প্রতিজ্ঞা করেছি তা সফল হবে না ? দীক্ষাগুরু নিজেই যদি পথভ্রষ্ট হয় কে তবে আমাকে পথ দেখাবে ? কে হবে অন্ধকার পথে আলোর দিশারী ?

অপর্ণা উত্তর দিতে পারে না, চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। বসন্ত বাতাসের মৃদু স্পর্শ আর কনে দেখা আলোর রঙিন ছোঁয়ায় অপর্ণা যেন আরও সুন্দর আরও নূতন। তার মুখে চোখে কেমন যেন মমতার আবিলতা। হয়ত উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সুখস্বপ্নে সে কিছুটা মোহগ্রস্ত। চঞ্চল অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে অপর্ণার দিকে। উত্তেজনায় তার সমস্ত শরীরটা কাঁপছে। কিন্তু অপর্ণা যেন তার চিন্তার আকাশে বিলীন হয়ে গেছে। হয়ত সে ভাষা হারিয়ে বোবা হয়ে গেছে।

একটুপরেই চঞ্চল ফিরে পেল তার সংজ্ঞা। তীব্র আবেগে সে আবার বলে উঠল—জানি উত্তর তুমি দিতে পারবে না, সে তোমার সাধ্যাতীত। তোমাকে আবার বলছি আমাদের অনুরোধ অবহেলা করে চলে যেওনা। দেখ ঐ সরল নিরীহ লোকগুলো তোমার চলে যাবার কথাশুনে কেমন বেদনাহত। তোমাকে তারা প্রাণ দিয়ে ভালবাসে, তোমাকে যেতে দিতে চায়না। তাদের সে ভালবাসার প্রতিদানে তুমি তাদেরকে উপেক্ষা করে চলে গেলে তুমি নিজেই ব্যথা পাবে অনেক বেশী।

শাড়ীর আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে অপর্ণা বলে—আমার জন্য এমন কি তোদের ক্ষতি হবে চঞ্চল ? আমায় আটকাস না, ছেড়ে দে। আর কোন কাজ করবার ক্ষমতা যখন আমার নেই, আর যে কাজ করেছি তার সব দায়িত্ব যখন তোর উপর থাকছে তখন আর শুধু শুধু আমাকে

আটকাতে চাস না। নূতন জায়গাতেও আবার নূতন করে কাজ করতে হবে আমাকে, তোরা এবার আমাকে মুক্তি দে চঞ্চল।

চঞ্চল আর থাকতে পারে না। সুতীব্র ব্যথায় প্রতিটি কথায় জোর দিয়ে, আঘাত করবার অদম্য ইচ্ছায় শ্লেষের সঙ্গে বলে—'চমৎকার! আজ তোমাকে নূতন করে জানলাম দিদি। তোমাকে নূতন করে চিনতে পারলাম। তুমি মহৎ, উদার, স্নেহপরায়ণ বলে ধারণা করেছিলাম। মনে করেছিলাম তুমি সাধারণ মানুষের ঊর্দ্ধে, অনেক উঁচুতে। কিন্তু দেখলাম আমার সে ধারণা ভুল, তুমিও সাধারণ মানুষ ছাড়া আর কিছু নও। ধন্য তুমি! নিজের প্রতিষ্ঠালাভ করবার আকাঙ্ক্ষায়, যশের কাঙাল হয়ে তুমি সেবাধর্মের মুখোশ পরেছিলে, পরহিতৈষী সেজে সকলের প্রশংসা কুড়িয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করেছ আর নিজের বাহাদুরিতে নিজেকে বাহবা দিয়েছ! দরদী সেজে সরল গ্রামবাসীর মন জয় করে উল্লসিত হয়েছ, তাদের মূর্খতায় সরলতায় দম্ভ করেছ। তোমার ছলনা তারা বুঝতে পারেনি। ধরতে পারেনি তোমার শঠতা। তোমার মায়াবী মন-ভোলান ছলা-কলায় তারা পরাস্ত হয়েছে, আর তাদের পরাজয়ে, তাদের মূর্খতায় অজ্ঞতায় তুমি মনে মনে হেসে গড়িয়ে পড়েছ। এত নীচ, এত হীন তুমি? ছিঃ, তোমাকে বড় ভেবে ভক্তি করেছি, দেবী ভেবে পূজা করেছি, মহীয়সী নারী ভেবে তোমার কাছে দীক্ষা নিয়েছি, নিজের সমস্ত সম্মান তোমার চরণতলে অঞ্জলি দিয়েছি, ছোটভাই ভেবে গর্ব করেছি, তোমার বিজয়গৌরবে আনন্দ করেছি—এই আমি! এত মূর্খ আমি। তোমার লজ্জা করে না স্বার্থের বেদীমূলে নিজেকে আহুতি দিতে? এত ছোট তুমি হতে পার তা কোন দিন কল্পনাও করিনি। নিজের স্বার্থটাই আজ তোমার বড় হল? মানুষের স্নেহ, মমতা, ভালবাসার কোন দামই নেই তোমার কাছে? এই শান্ত, সরল লোকগুলোর মুখ চেয়ে তোমার সামান্য স্বার্থ, যশের প্রলোভন ত্যাগ করতে এখনও বাধছে? যশের লোভ, টাকার প্রাচুর্য আর ক্ষমতার অহংকার তোমার কাছে বড় হল? অর্থের লোভে সবকিছু ফেলে দূরে চলে যেতে তোমার মনে একটুও লজ্জা করছে না? টাকার মোটা অঙ্কে, ক্ষমতার

মোহ তোমাকে আচ্ছন্ন করল ? তোমাকে তা হলে টাকা দিয়ে কেনা যায় ? লালসার মোহে তুমি অন্ধ হয়েছে, পবিত্রতা বিসর্জন দিয়েছ, স্বার্থের খাতিরে কুটিল হয়েছ, ত্যাগ করেছ সব মহৎ সংকল্প। তুমি এত নীচে নেমেছ যে মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে, তাদের দুঃখ দিয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে, তাদের পরাজয়ে ঘৃণ্য পশুর মত উল্লাসে মত্ত হয়ে তোমার হিংস্র পশুমনকে তৃপ্ত করছ। আমি তোমাকে অভিশাপ দিচ্ছি ধ্বংস হবার, প্রার্থনা করছি তোমার মৃত্যুর।' উত্তেজনায় চঞ্চলের চোখ থেকে আগুন ঠিকরে বার হয়, ঘৃণায় চোখ মুখ কুঁচকে যায়। সে বলে চলে—এর থেকে তোমার মৃত্যুও শ্রেয় ছিল। তোমার দানবীরূপ আমাকে দেখতে হত না। যাকে শ্রদ্ধায় প্রণাম করেছি তাকে এই বীভৎস রূপে দেখে অপমানিত হতে হত না। তুমি, তুমি·······

আর সহ্য হয় না অপর্ণার। চিৎকার করে বলে—'তুই চুপ কর, তুই চুপ কর চঞ্চল।' তার আর্ত চিৎকারে একটি প্রচণ্ড আঘাতে চঞ্চল চমকে উঠে। দেখে অপর্ণার সমস্ত মুখটা নীল হয়ে গেছে, অপমানে আঘাতে সে থরথর কাঁপছে। তার দুচোখ থেকে জলের বড় বড় ফোঁটা নেমে এক অব্যক্ত বেদনায় করুণ হয়ে উঠেছে। অপর্ণা কি যেন বলতে গেল কিন্তু পারল না। ঠোঁট দুটি কেঁপে উঠল কিন্তু কোন স্বর বার হল না। সে যেন চঞ্চলের রূঢ়নিষ্ঠুর আঘাতে পাষাণ হয়ে গেছে। আর তাকিয়ে থাকতে পারল না চঞ্চল, মাথা নীচু করল সে পাষাণ প্রতিমার কাছে।

অনেক চেষ্টায় নিজেকে কিছুটা সংযত করে খুব আস্তে করুণ স্বরে অপর্ণা বলল—'তুই আমার মৃত্যু কামনা করছিস্ চঞ্চল ? এই তোকেই একদিন আমি অক্লান্ত পরিশ্রমে বাঁচিয়ে তুলেছি তাও ভুলে গেলি ? তোরা কি চাস না আমি বড় হই, আমার নাম হোক্।' একটু থেমে আবার তীব্রস্বরে বলে উঠল—'তোরা আমার ভাল চাস না ? তোরা কি শুধু এই চাস যে আমি সারা জীবন তোদের জন্য এই ভাবে কাটাব ? জীবনে যদি বড় হবার পথ দেখে ভবিষ্যতের উজ্জ্বল স্বপ্ন দেখে সে পথে পা দেই তাহলে তোরা সে পথ রোধ করে দাঁড়াবি ? আমার

সমস্ত. ভবিষ্যত জীবন নষ্ট করে দিয়ে আমার উন্নতির সকলপথে, সুখস্বপ্নের সকল আলো তোরা কি রোধ করবি, নিভিয়ে অন্ধকার করে দিবি? এতদিন এত দুঃখ-কষ্ট, মান-অপমান, লাঞ্ছনা-গঞ্জনা হাসিমুখে সহ্য করে আজ যদি একটু আশার আলো দেখি তবে সেকি আমার অপরাধ? তোর দিদি চিরদিন দীনহীন থাকবে, আর শুধু তোদের সেবা করে জীবন কাটাবে এই কি তোরা চাস্? বল্ তুই! তোকে বলতেই হবে, আমি যদি বড় হতে চাই তাহলে তোরা নিজেদেব স্বার্থে কেন আমাকে বাধা দিবি? কেন আমাকে আমার ভবিষ্যৎ জীবন থেকে বঞ্চিত করতে চাস্?'

অজানা ঝড়েব পূর্বাভাসে চঞ্চল শঙ্কিত হয়ে উঠল। বিবর্ণ মুখে ভয়ে ভয়ে খুব আস্তে বলল—'বেশ তোমাকে আর কোন কথা বলব না। তোমার যাত্রাপথ আটকাব না, সে পথে কাঁটা হয়ে তোমার যাত্রাপথ ব্যথিত করব না। যদি অন্যায় কোন কিছু বলে থাকি তাহলে ছোটভাই হিসাবে ক্ষমা কর। তবে তুমিই শিখিয়েছ মানুষের ভালবাসার কাছে মাথা নত করতে, তাই তোমাকে বাধা দিতে চেয়েছিলাম। তোমার যা ইচ্ছা হয় তুমি করতে পার, রাগের বশে যদি কোন কিছু কথায় আঘাত দিয়ে থাকি তাহলে মনে করে নিও তোমার মূর্খ ছোটভাই অবিবেচক, অপদার্থ।' কথা শেষ করেই চঞ্চল ছুটে বেরিয়ে যায় আর অপর্ণা স্থানুবৎ সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকে। চঞ্চলের যাওয়ার পথে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে অপর্ণা। মনে পড়ে কিছুদিন আগে ডাক্তারবাবু বদলী হয়ে চলে যাবাব সময়ও সে এইভাবে একদৃষ্টে বাইরেব দিকে তাকিয়ে নিজেকে অত্যন্ত অসহায় ভাবছিল। ডাক্তারবাবু তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন—আমিও তোমার মত একদিন এখানে এসেছিলাম। প্রথমটায় ফাঁকা জায়গা দেখে আমার শহুরে কোলাহল-মুখর মন হাঁপিয়ে উঠেছিল, খুব অস্বস্তি লাগছিল। একটুও ভাল লাগত না এখানে থাকতে। সবসময় বিরক্তিতে নিজেই অনেক সময় রাগ করতাম। কিন্তু আজ মনে হচ্ছে এই আকাশ-বাতাস সবই আমার সঙ্গে মিশে গেছে। তাদেরও যে ভাষা আছে তা যেন অনুভব করতে

পারি। চলে যেতে হলেও আমার মনের অনেকখানি এখানে ফেলে যেতে হচ্ছে।

অপর্ণা তাঁর সে কথা যেন মর্মে মর্মে অনুভব করে। সেও অনুভব করে তার জীবনের সঙ্গে এখানকার মানুষ, আকাশ-বাতাস, জল-মাটি সব কিছুই ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে গেছে। এখানকার গাছপালার ভাষাও সে যেন বুঝতে পারে। তার মনে হয় তারাও যেন তার কাছে অভিযোগ করছে তার চলে যাবার বিরুদ্ধে। আস্তে আস্তে বাইরে এসে দাঁড়াল অপর্ণা। দেখল অস্তগামী সূর্য তার শেষ আলোয় সমস্ত পৃথিবীকে যেন বিদায় জানাচ্ছে। আকাশে একদল পাখী উড়ে যাচ্ছে। একটা পাখী দল ছাড়া হয়ে কিছুটা পিছিয়ে পড়েছে। সে যেন খুবই ক্লান্ত তাই সে পিছিয়ে পড়েছে। অপর্ণার মনে হয় সেও ঐ রকম ক্লান্ত হয়েই কি এখানকার পরিবেশ থেকে আলাদা হয়ে চলে যাবে? তাকেও কি ঐ রকম পিছিয়ে যেতে হবে? জীবনেব সব অগ্রগতির পথে কি তাকে এইভাবে একা চলতে হবে? এই তো সেদিন সে নোংরা বস্তির এক অন্ধকার ঘরে অনাহারে, রোগে মরতে বসেছিল। সুখেন এল ভগবানের আশীর্বাদের মত। তার স্নেহে ভালবাসায় অপর্ণা পেল নূতন জীবন। প্রথম যখন এখানে চাকরী করতে আসে তখন সুখেন এখানে আসতে নিষেধ করেছিল। অনেক বুঝিয়ে রাজী করেছিল অপর্ণা। আর আজ সে নিজেই চলে যেতে চাইছে এ গ্রাম থেকে। এখানকার সরল লোকদের হৃদয় জুড়ে আছে সে। তাদের প্রতিটি নিঃশ্বাসে অপর্ণার নাম। তাদেরকে ছেড়ে চলে যাবার নামে একটা অসহ্য অস্বস্তিকর বেদনা তাকে এক মূহূর্ত স্বস্তি দিচ্ছে না।

ললিতবাবুও বলেছিলেন এখানে থাকতে, কিন্তু অপর্ণা রাজী হয়নি। এমনকি সুলতা যখন ডেকে বলল ট্রান্সফার না নিতে তখন অপর্ণা তীব্রভাবে তাকে আক্রমণ করে বলেছিল—'কেন নেব না? আমার উন্নতি দেখে তোর কি চোখ টাটাচ্ছে?' সুলতা একেবারে অপ্রস্তুত হয়ে গেছিল, দুঃখও তার হয়েছিল। অপর্ণা নিজেও পরে ভেবে পায়নি কেমন করে সুলতাকে সে একথা বলেছিল? কার উপর

তার আসল রাগে অমন নীচ কথা বলতে পেরেছিল? কিন্তু কোন বাধা মানবে না অপর্ণা. সে যাবেই। জিনিসপত্র বাঁধা হয়ে গেছে, রাত পোহালেই যাবার জন্য তৈরী হতে হবে। কালকেই চলে যাবে অপর্ণা, না হয় তার ভয় হচ্ছে এরা বোধ হয় শেষ পর্যন্ত তাকে যেতে দেবে না। কিন্তু চঞ্চলের কথা তাকে তীব্র আঘাত দিয়েছে। তার শাণিত কথার কশাঘাতে সে জর্জরিত। এক এক সময় মনে হচ্ছে যাবে না এখান থেকে, কিন্তু পরক্ষণেই সেচিন্তা দূর করছে দৃঢ়চিত্তে।

সারারাত অপর্ণা জেগেই রইল, কিছুতেই ঘুম এল না। নানা চিন্তায় ভোর হয়ে গেল। একটু বেলা হতেই অপর্ণা স্নান করে নিল। সারারাত মনের সঙ্গে যুদ্ধ করে ক্লান্তিতে অবসাদে তার মন ভারী হয়েছিল, স্নানের শুচিতায় মন আবার দৃঢ় হল। সংগ্রাম করবার শক্তি পেল অপর্ণা। রাঁচী যাবার ট্রেন বেলা বারটায়। আজ তাকে রান্না করতে দেয়নি সুলতা। তার আমন্ত্রণ উপেক্ষা করতে পারেনি অপর্ণা, সানন্দে রাজী হয়ে বলেছে—'তুই বাঁচালি সুলতা। রান্নার ঝামেলা থাকলে খাওয়া হয়ে উঠত কিনা সন্দেহ, খুব ভয় হচ্ছিল শেষটায় আবার ট্রেন ফেল না করি। আর যাবার সময় তোর হাতের রান্না খেয়ে একটু তৃপ্তি পেয়ে যাই। হয়ত আর কোন দিন দেখা হবে না, কিন্তু মনে থাকবে তোর আজকের যত্ন।'

ললিতবাবু বাইরে কোথায় গিয়েছিলেন, ফিরে এসে বললেন—তৈরী হয়ে নে অপর্ণা। আর দেরী করে লাভ নেই। কিন্তু বার বার আমার মনে হচ্ছে এ ঠিক হচ্ছে না, প্রাণের ডাক উপেক্ষা করে চলে যাওয়া যেন আমাদের অপরাধ।

কিন্তু অপর্ণা কোন কথা শুনতে চায় না। সে ঠিক করেছে যাবেই এখান থেকে। হয়ত বেশী বাধা তাকে বেশী জেদী করেছে। একটা গোলমাল শুনে বাইরে এসে অপর্ণা দেখে অনেক লোক তার কোয়ার্টারের কাছে দাঁড়িয়ে জটলা করছে। তাদের চোখে জল, কাতর মুখ। তাদের দীর্ঘনিঃশ্বাসের শব্দ যেন সে শুনতে পাচ্ছে। হঠাৎ ভীড় ঠেলে তীর বেগে ছুটে আসে মঙ্গু। সে শোনেনি অপর্ণা চলে যাবে, এইমাত্র

শুনতে পেয়েই সে রুদ্ধশ্বাসে অপর্ণার কাছে এসেই কেঁদে ফেলে। বলে—তুই চলে যাচ্ছিস্ দিদিমণি ? তুই যাসনি দিদিমণি, যাসনি আমাদের ছেড়ে। যদি না শুনিস তাহলে আমাকেও সঙ্গে নে তোর সঙ্গে, আমিও যাব। না হলে তোর পায় আমি মাথা খুঁড়ব, কোন কথা শুনব না।

এরা সরল মানুষ, জানেনা লেখাপড়া, সৌজন্য, শিষ্টাচার। তাদের আছে শুধু প্রাণভরা ভালবাসা, মমতা। চঞ্চল আবার এসেছে, এতক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু মঙ্গুর কান্না তার সংযম ভেঙ্গে দিল। বলে উঠল—এত বছর ধরে যারা তোমাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসল, ভক্তি করল, শ্রদ্ধায় তোমাকে প্রণাম জানাল, আজ তাদের ছেড়ে, তাদের এমন ভাবে কাঁদিয়ে তুমি চলে যাবে ? এরা কি তোমাকে এতটুকুও আকর্ষণ করেনি ? তোমাকে আবার বলছি দিদি, তুমি ভুল করছ। এখানে তোমার গড়া গ্রাম, তোমার স্নেহ-ছায়ায় আশ্রিত এই সরল গ্রামবাসীদের ছেড়ে যেও না।

একটুক্ষণ নির্বিকার থাকে অপর্ণা। কিন্তু পরে আস্তে আস্তে বলে—না চঞ্চল, তুই আমাকে বাধা দিসনা। আমার জীবনপথ স্নেহের অন্ধমোহে পিচ্ছিল করে দিস না। আমি আবার আসব তোদের কাছে, এই শান্ত ধীর পরিবেশের মাঝে। কিন্তু আজ আমায় যেতে দে তুই। আমি কথা দিচ্ছি আমি আবার আসব।

চঞ্চল মাথা দুলিয়ে অবিশ্বাস ভরা কণ্ঠে বলে—না, তুমি আর আসবে না। আসতে ইচ্ছে করলেও আর আসতে পারবে না। চলে যেও না তুমি দিদি।

অপর্ণার মনে হয় চঞ্চল তার অপর্ণাদিকে আজ যেন শপথ করে বলাতে চায় যদি তুমি এই গ্রাম, গ্রামের অধিবাসী সকলকে ভালবাস তাহলে তুমি যাবে না, আর যদি তা সত্য না হয় তবে তুমি চলে যাবে। কিন্তু প্রমাণ হবে তোমার সব কিছু মিথ্যা, শুধূ ছলনা। না, না এ শপথ করতে পারবে না অপর্ণা।

চলে গেল চঞ্চল অভিমান আর অবিশ্বাসে উত্তেজিত হয়ে।

এই যে আকাশ, এই যে সীমাহীন প্রান্তর, আর ওই অরণ্যের

নিবিড়তা সবই তার পরিচিত। পরিচিত শত শত গ্রামবাসীর সুন্দর মুখ। কত সরল, নিরীহ তারা। এরা যেন নূতন যুগের নূতন মানব। ভগবান যেন এদের আলাদা ভাবে সুন্দর ছাঁচে গড়েছেন। বিশ্বাসের গাঢ় স্তব জমেছে তার বুকে। কোথায় সে কয়েকবছর আগের রিক্ততা? জীবনে পূর্ণতার মধুর আস্বাদ পেয়েছে অপর্ণা। পৃথিবীর আনন্দেব অনুভূতি, শান্তির কল্যাণময় রূপ সে পেয়েছে এখানে। তার প্রতিটি রক্তকণা অনুভব করে এখানকার মাটির টান। কিন্তু তবু, তবু তাকে যেতে হবে দূরে।

বিদায়ের সময় দেখতে দেখতে এগিয়ে এল। এত দিনের নিবিড় বাঁধন অস্বীকার করে চলে যাচ্ছে অপর্ণা। হাসপাতালের সুইপাব অপর্ণার বেডিং-বাক্স তুলে নিল। তাবও চোখেব পাতাগুলো ভেজা ভেজা। অপর্ণা সকলকে সজল চোখে সান্ত্বনা দিচ্ছে, বলছে—আমি আবার আসব। কথা দিচ্ছি তোমাদের কাছে আমি আবার আসব। তোমাদের এত ভালবাসা ছেড়ে বেশীদিন আমি থাকতে পারব না, তোমাদের স্নেহের টানে আমাকে আবাব আসতে হবে।

কিন্তু সবাই জানে অপর্ণা আর আসবে না, তাদের অন্তর সাড়া দেয় না, তারা ভরসা পায় না। তাদের মন বুঝতে পারে অপর্ণা, তার মনটা কেমন যেন বেসুর হয়ে উঠে। চাতক পাখীরা উদাস দুপুরের আকাশে চিৎকার করে উড়ে চলেছে। তার সাথে সাথে চৈতালী ঘূর্ণি বাতাস মাটিতে ঝড়ে পড়া পাতাগুলো নিয়ে একসাথে উপরে তুলছে। হঠাৎ আকাশের গায়ে ভেসে থাকা চিলগুলো চঞ্চল হয়ে উঠল। চারিদিকে তীক্ষ্ণ চকিত দৃষ্টিতে তাকাল অপর্ণা। সকলের নীরব অভিযোগ সে বুঝতে পারে। বোঝে আর কোন বিদেশীকে তারা ভালবাসবে না, অপর্ণাকে বিদায় জানাতে পারল না চঞ্চল তাই চলে গেছে। তার ব্যথা সব থেকে বেশী, দিদির অধিক অপর্ণাকে বিদায় দিতে সে পারে না, তাই নিজেই বোধহয় কোথাও চলে গেছে। ললিতবাবু বলেন—চল, মা, আর মিথ্যা মায়া বাড়িয়ে লাভ নেই।

অপর্ণা সামান্য একটু এগিয়েছে মাত্র এমন সময় তাদের স্কুলের

ছাত্র অপূর্ব ছুটতে ছুটতে এসে আকুল স্বরে বলে—'দিদিমণি, শিগগির চলুন। চঞ্চলদা অ্যাকসিডেন্ট্ করেছে।' চমকে উঠল অপর্ণা, বলে—'কি, কি বললি?' অপূর্ব বলে—হ্যাঁ দিদিমণি মাথায় চোট্ লেগেছে। এইমাত্র আমি হাসপাতালে নিয়ে এসেছি। রক্ত পড়ছে, অজ্ঞান হয়ে গেছেন। আপনি আর দেরী করবেন না, শিগগির চলুন।

অপর্ণা স্থানুবৎ দাঁড়িয়ে থাকে। তার সময় হয়ে গেছে, দেরী হলে ট্রেন পাবে না। এমন সময় কি কববে সে? তাব মনের কথা বুঝলেন ললিতবাবু, বললেন—তুই শিগগির যা মা, এখন আর ভাবনার সময় নেই। যাওয়া যদি নাও হয় সেও ভাল কিন্তু কর্তব্য ছেড়ে, যে সেবা ধর্মে তুই দীক্ষা নিয়েছিস্ তাব অপমান করে যাওয়া ঠিক হবে না। এ অন্যায়, এ পাপ।

পাপ! কথাটা কানে যেতেই অপর্ণা যেন চাবুক খেয়ে, তার সংজ্ঞা ফিরে পেল। দৌড়ে গেল হাসপাতালেব দিকে, কোনদিকে ভ্রুক্ষেপ মাত্র না করেই। দেখল চঞ্চলের আঘাত খুব বেশী নয়। ভারী মনকে হাল্কা করবার জন্য চঞ্চল সাইকেলে করে ঘুরছিল, এমন সময় কি করে ধাক্কা লাগে একটা গাছের সঙ্গে। মাথাটা কেটে গেছে, অন্যান্য দু'এক জায়গায় সামান্য কেটে গেছে। কিন্তু কোন জ্ঞান নেই তার। একটু ক্ষণ অপর্ণা থমকে দাঁড়াল কিন্তু পরক্ষণেই মনের সমস্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সরিয়ে দিয়ে চঞ্চলেব মাথাটা তুলে নিল নিজের কোলে। সুলতা সেখানেই এতক্ষণ চঞ্চলের মাথা ব্যাণ্ডেজ করে আহত স্থান-ধুয়ে দিচ্ছিল. অপর্ণাকে এ ভাবে বসতে দেখে বলল—তুই আর দেবী কবছিস্ কেন? বেশী কিছু লাগেনি এখনই জ্ঞান ফিরবে। তুই নিজেই তো বুঝছিস ভয় নেই, নিশ্চিন্ত মনে যেতে পারিস।

অপর্ণা কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল সু···তাব দিকে, ভাবতে চেষ্টা করল সুলতা তাকে ব্যঙ্গ করছে কিনা। কিন্তু বুঝতে পারল না। তার মনে হল এ তার জীবনের চরমতম পরীক্ষা। যদি আজ না যায় তাহলে নিশ্চয়ই আর কোনদিন যেতে পারবে না, অথচ আহত চঞ্চলকে ছেড়ে সে যায়ই বা কি করে? একদিকে জয় আর একদিকে পরাজয়ের

কালিমা—কোন্‌টি সে গ্রহণ করবে? হঠাৎ জোর দিয়ে তীব্রভাবে বলে ফেলল—না, না, আমি যাব না, যাব না। যেতে পারলাম না, তোদের কাছে হেরে গেলাম।

খুশীর ছোঁয়ায় সুলতা শিহরিত হয়। এই কিছুক্ষণ আগেও যে এত লোকের অনুরোধ এড়িয়ে চলে যাচ্ছিল তার একি হল? আনন্দের উৎসাহ স্পর্শ করল সকলকে আর সেইসঙ্গে অপর্ণার মনে হল সে আনন্দিত, ধন্যা। তার জয়ধ্বনিতে মনের সমস্ত বিষাদ কেটে গেল যেন এক টুকরো কালো মেঘ যে সূর্যকে ঢেকে রেখে এতক্ষণ অন্ধকারে পৃথিবী আচ্ছন্ন রেখেছিল তা সরে যাওয়ায় সূর্যের রশ্মি আবার সমস্ত কিছু আলোয় উদ্ভাসিত করে দিল।

জ্ঞান হলে চঞ্চল দেখে তার মাথা কোলে নিয়ে বসে আছে অপর্ণা। তার মনে পড়ে অপর্ণা তার সমস্ত অনুরোধ অনুযোগ ঠেলে চলে যাচ্ছে। মনটা বিরক্তিতে রাগে ভরে উঠে। সে তাড়াতাড়ি উঠে বসতে যায় কিন্তু অপর্ণা বাধা দেয়। বাধা পাওয়ায় চঞ্চল নিজের সংযম ভুলে চিৎকার করে উঠে—'আবার তুমি সেবার ভাণ করছ? ছেড়ে দাও আমাকে, তোমার ছলনায় আমি আর ভুলতে চাই না! ছোট ভাইয়ের যে মর্যাদা রাখে না তার কোন অধিকার নেই সেবা করার, দিদির সম্মান লাভ করবার। আর আমাকে ভোলাতে চেয় না, আর ঋণী করে রেখ না।'

অপর্ণার দু' চোখ জলে ভরে যায়। ধীরে ধীরে অস্ফুট স্বরে বলে—'নারে, তোর দিদি যাবে না, যেতে পারল না। দেখছিস্ না ভাই আমি হেরে গেছি।' ঝর ঝর করে জল ঝরে চঞ্চলের মাথায়। চমকে উঠে চঞ্চল, একটু সামলে নিয়ে আনন্দে অধীর হয়ে বলে—'কি বলছ? কি বললে তুমি? তুমি যাবে না, তুমি আমাদের ছেড়ে যাবে না? সত্যি বল, তুমি, তুমি থাকবে ত?' দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে অপর্ণাকে চঞ্চল।

অপর্ণা চোখ মুছে বলে—নারে পাগল, আর আমি যাব না। যেতে গিয়েই তোর এ বিপদ হল, আর কোনদিন তোকে ছেড়ে, এ গ্রাম ছেড়ে যাব না। তুই পাশ করে আয়, তারপর দু'ভাইবোন মিলে কাজ

করব। মাটির টান যে কতবড়, কত তীব্র যে তার আকর্ষণ, তা আজ আমি ভাল করেই বুঝতে পেরেছি। দু' জনের মিলিত চেষ্টায় ঘরে ঘরে জ্বালব নূতন প্রদীপ, যার উজ্জ্বল দীপশিখায় সব অন্ধকার, সব কালিমা দূর হবে, সূচনা হবে জীবনের নব অধ্যায়। সংকল্প হবে দুর্জয়, দুর্বার হবে আমাদের অভিযান, মন্ত্র হবে পবিত্র শুচিশুভ্র, আর দীক্ষা হবে 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপর নাই' এই মন্ত্রশক্তিতে।

চঞ্চল আনন্দে, খুশীতে বলে—হ্যাঁ দিদি, সেই মিলিত যাত্রায় আমরা গড়ব আনন্দলোক। যাক্ প্রাণ নেই ক্ষতি কিন্তু মন্ত্র হবে প্রতিষ্ঠিত।

অপর্ণা হেসে বলে—আর অভিযোগ নেই তো? তুই কিন্তু আমার মৃত্যু কামনা করেছিস্?

চঞ্চল যন্ত্রণাকাতর কণ্ঠে বলে—আর খোঁটা দিও না দিদি। ভাই যে আমি, দিদির মৃত্যু কামনা কি করতে পারি? মুখ দিয়ে অমন অশুভ কথা বললেও তা যে দিদির স্পর্শে হবে আমার পুষ্পাঞ্জলি দিদির চরণে। যা বলেছি তা সত্য নয়, রাগের মুখে যা বলেছি তা মিথ্যা। আর জান ত মিথ্যা বলতে আমার জুড়ি নেই।

অপর্ণা সে রাত্রেই সুখেনকে লিখল—

দাদা, তুমি শুনে হয়ত খুশী হবে যে আমি আর রাঁচী যাচ্ছি না। মাটির টান যে এত বেশী তা জানতাম না। জীবনের সবকিছুর ত্যাগ স্বীকার করা যায় এখানের এই শান্ত পরিবেশের মাঝে। প্রথম তোমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যখন এখানে আসি তখন এখানে সবকিছুই ছিল অন্ধকারে আচ্ছন্ন। কিন্তু আজ সব কিছুই জীবন্ত, সবকিছুই আলোময়। এখানকার আলো-বাতাস, মাটি-জল সবকিছুই আমার আত্মার আত্মীয় বলে মনে হয়। আজ সার্থক হয়েছে তোমার আশীর্বাদ। তোমার প্রেরণা, তোমার কথার প্রতিটি শব্দ যেন আমার জীবনে দেববাণী। তোমার কাছে যে আমি কত ঋণী তা আজ মর্মে মর্মে অনুভব করছি। তোমার মন্ত্রশিষ্যা হয়ে এখানকার লোকদের কতটুকু সেবা করতে পেরেছি, কতটুকু আনন্দ দিতে পারছি জানি না। যদি সামান্য পরিমাণেও পেরে থাকি তাহলে আমি ধন্যা। স্বাধীন দেশের

নারী হিসাবে যদি আমার দেশের একচুল উপকার করে থাকতে পারি, একটা বিফল জীবনও যদি আমার সেবায় সফল হয়, যদি ঘন অন্ধকার জীবনের সামান্য একটুও আলোর স্পর্শে প্রাণবন্ত করে তুলতে পারি তাহলে আমার জীবন সার্থক মনে করব। আজ মনে পড়ছে আমার সেই মৃত্যুদিনগোণা জীবনের কথা, যেদিন তুমি দেবতার মত এলে আমার জীবনে আর আমায় আরোগ্য করে পুনর্জন্ম দিয়ে দীক্ষা দিলে সেবাধর্মে। তোমার সে আদর্শ আমি জীবন দিয়েও রাখব দাদা, কোন কিছুর প্রলোভন যেন আমাকে আদর্শত্যাগ করতে বাধ্য না করে। নিজের সেই সামান্য দীন অবস্থা ভুলে গিয়ে নিজের স্বার্থে সামান্য বড় চাকরীর লোভে এখান থেকে চলে যাচ্ছিলাম। মানুষের স্নেহভালবাসা বিসর্জন দিয়ে শুধুমাত্র নিজের উন্নতিতে স্বার্থপরের মত নিজের দিকটা দেখতে গিয়েছিলাম, কিন্তু পারলাম না শেষ পর্যন্ত। চঞ্চল আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছে আমার ভুল। বুঝতে পেরেছি সবার উপর মানুষ সত্য, আর তাই নিজেকে সেই নব মন্ত্রে দীক্ষিত করেছি। আমি সামান্য সেবিকা জীবনে সুখের উপকরণের প্রয়োজন কম, বিলাসের কোন আয়োজনে মন্ত্র হবে পথভ্রষ্ট। তাই সামান্য প্রয়োজনেই আমার সন্তুষ্ট থাকা উচিত। খনা স্বামীব মঙ্গল ইচ্ছায় কর্তন করেছিলেন তাঁর জিহ্বা, গার্গী অহংকাব ভুলে যাজ্ঞবল্কের প্রজ্ঞায় প্রণাম জানিয়েছিলেন তাঁকে, গান্ধারী শতপুত্রের জীবনের বিনিময়েও ধর্মের জয় শ্রেয় মনে করেছিলেন, জনক দুহিতা সীতা স্বামীর সত্যরক্ষায় স্বেচ্ছায় রাজবেশ ত্যাগ করে পরিধান করেছিলেন বল্কল, পদ্মিনী করেছিলেন জহরব্রত, রাণী লক্ষ্মীবাঈ ধরেছিলেন রাজ্যরক্ষায় মুক্তঅসি, রাণী রাসমণি করেছেন ধর্ম প্রতিষ্ঠার সহায়তা, মাতঙ্গিনী হাজরা, প্রীতিলতা নিয়েছিলেন স্বদেশ-মুক্তির অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা আর আমি সেই দেশের মেয়ে হয়ে ত্যাগ করতে পারব না তুচ্ছ পার্থিব সুখ? তাই যাইনি এখানকার মাটি ছেড়ে। আমি নিশ্চয়ই জানি তুমি আমার এ কাজ অন্যায় মনে করবে না, আমাকে আশীর্বাদ করবে। তোমার আশীর্বাদই হবে আমার একমাত্র অবলম্বন, আমার যাত্রাপথে সহায়ক। ইতি অপর্ণা

॥ ৮ ॥

অপর্ণার চিঠিটা সুখেন বিছানায় শুয়ে শুয়ে পড়ছিল আর মনে মনে ভাবছিল অপর্ণা কত সহজে নিজের এতবড় উন্নতিকে স্নেহের বিনিময়ে, মাটির টানে ত্যাগ করতে পারল। এই বয়সেই, যে বয়সে ভুল করা, উন্নতি সাধনের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করাতেই সকলে ব্যস্ত থাকে সে বয়সেই, অপর্ণা কতবড় প্রলোভন দমন করে রাখতে পারল। কি উদার অপর্ণার মন? তার মনের সংকল্প যে যথার্থই গ্রহণ করতে পেরেছে সে এই অপর্ণা। আজ প্রায় দশ-বার দিন সুখেন শয্যাশায়ী, অসুখটা খুব বড় নয় কিন্তু বেশ দুর্বল করে দিয়েছে তাকে। পরীক্ষার প্রস্তুতিতে তার শরীর ভেঙ্গে গেছে, কঠোব পরিশ্রমে সে প্রস্তুত করেছিল নিজেকে, পরীক্ষাও ভালই দিয়েছে। কিন্তু সেই থেকে শরীরটা খারাপ যাচ্ছিল, এই কদিনের সামান্য জ্বরে সে বুঝেছে সে কত দুর্বল। ডাক্তার কাকু তাকে এখন কিছুদিন বিশ্রাম নিতে বাধ্য করেছেন আর কৃষ্ণার তদারকিতে একটু চিন্তা করতে বা কোন কাজ করতে পারে না। বিছানা ছেড়ে একটু উঠলেই কৃষ্ণা ধমক দেয়, সুখেনের সাধ্য থাকে না সে নিষেধ অমান্য করতে। বরং কেমন যেন ভালই লাগে সুখেনের। মা বেঁচে থাকলে তিনিও নিষেধ করতেন সুতরাং কৃষ্ণার এই ধমকানি তাকে যেন একটু খুশী করে। কৃষ্ণার কথায় মায়েব স্নেহ অনুভব করে। অপর্ণার চিঠিতে তার মন ভরে উঠে, নিজের মন্ত্র শিষ্যার সার্থকতায়, ভোগলালসার প্রতি তার বিরূপতায় শ্রদ্ধা জাগে অপর্ণার

প্রতি, নিজের দীক্ষার প্রতি আনুগত্য হয় দৃঢ়তর। সুখেনের সুখ-স্বপ্নের মাঝে ঘরে ঢোকে কৃষ্ণা। তার মন উত্তেজনায় লাল হয়ে উঠেছে, কিন্তু চোখে দুষ্টামি দৃষ্টি। সে ঢুকেই বলল—'তোমাকে একটা খুব ভাল খবর দিতে পারি, কিন্তু আমায় কি দেবে বল?' সুখেন ভেবে পায়না কি এমন খবর দেবে কৃষ্ণা যাতে সে নিজেই উত্তেজিত হয়েছে। সুখেন অনেকটা নিস্পৃহের মত বলল—খবর যদি সত্যিই ভাল হয় তাহলে তুমি যা চাইবে তাই দেব।

কৃষ্ণা দুষ্টামি করে বলে—ঠিক তো?

সুখেন বলে—নিশ্চয়ই, বলেছি যখন তখন কথার দাম রাখবই।

কৃষ্ণা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলে—'বেশ, জেনে রাখলাম। তবে আজ চাইব না, কিন্তু ভবিষ্যতে যখন চাইব তখন না করতে পারবে না। মনে রেখ তুমি এ কথা।' বলেই সে সুখেনের সামনে মেলে ধরে একটা খবরের কাগজ।

এতক্ষণ হাতদুটো পেছনে রেখেছিল তাই সুখেন দেখতে পায়নি। এবার কৃষ্ণার নির্দিষ্ট জায়গার দিকে তাকিয়ে দেখেই সে আনন্দে আত্ম-হারা হয়ে যায়। দেখে সে পরীক্ষায় প্রথম হয়েছে। উত্তেজনায় সুখেন উঠতে যেতেই কৃষ্ণা তাড়াতাড়ি তাকে চেপে ধরল। বলল—না, না, তুমি উঠ না। বাবা তোমাকে এখন উঠতে নিষেধ করেছেন না?

'তুমি যে কি বলো কৃষ্ণা'—বলে সুখেন এক রকম জোর করেই উঠে বসল। 'আজ আমার এত আনন্দেও কি বিছানায় শুয়ে থাকতে পারি? তোমরা হাজার বললেও আজ কোন কথা শুনছি না। আমার যে কি আনন্দ হচ্ছে তোমাকে বোঝাতে পারব না। আজ....'

সুখেন থেমে যেতেই কৃষ্ণা বলে—'থামলে যে? তোমার কি শরীর খারাপ করছে?' সুখেন বলে—'না কৃষ্ণা, শরীর আমার ঠিক আছে।' একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বার হয়ে আসে সুখেনের বুক থেকে। একটু চুপ করে থেকে সে উঠে দাঁড়িয়ে যায় মায়ের ফটোর দিকে, প্রণাম করে তাঁকে। আবার ফিরে এসে বিছানায় বসে বলে—বাবা কোথায় কৃষ্ণা, তিনি কি কোথাও গেছেন?

কৃষ্ণা বলে—'হ্যাঁ, বাবার সঙ্গে কোথায় যেন গেলেন একটু আগে।' সুখেন আবার বলে—'জান কৃষ্ণা, আজ আর একজন এখানে থাকলে খুব খুশী হত আমার এই আনন্দে। সে কে জান—সে কল্পনা।' কল্পনার কথা বলতেই সুখেনের মনে পড়ে তার জীবনের প্রথম আনন্দ সংবাদ দিতে এসে দেখেছিল এই ঘরের ঐ জানালায় বসে কল্পনা কাঁদছে আর তার সে আনন্দ ব্যর্থ করে তারা চলে গেছিল। আজ সুখেন জানেও না কল্পনা কোথায় আছে, কত বড় হয়েছে। হয়ত কল্পনা তাকে একেবারে ভুলে গেছে, মনে পড়ে না এখানকার কথা। ভাবতেই উদাস হয়ে যায় সুখেন. আর কৃষ্ণা তার মনের ভাব বুঝে তাড়াতাড়ি বলে—কল্পনার নাম অনেক শুনেছি আমি, কিছু কিছু জেনেওছি। জ্বরের ঘোরে তুমি প্রায়ই কল্পনার নাম করেছ, আমাকে কল্পনা বলে ডেকেছ। কিন্তু সব কথা জানতে পারিনি। এতদিন জানতে চাইনি কারণ দেখেছি কল্পনার কথায় তুমি দুঃখ পাও। তাই জিজ্ঞাসা করিনি কিছু, আজ আমাকে বলবে সব কথা ?

সুখেন বলে—'শুনবে তুমি ? আচ্ছা, বলছি সব তোমাকে। দোতালায় সবটা ভাড়া নেওয়ায় দেখতে পাচ্ছ. অনেক গুলো ঘর আমাদের কোন দরকার লাগে না। তাই তোমাদের মত কল্পনারা এখানে আমাদের সঙ্গে থাকত।' খুব ফাঁকা মনে হওয়ায় আর তখন বাবার প্র্যাকটিশ তেমন ভাল না চলায় বাবা ওদেরকে ভাড়া দিয়েছিলেন কয়েকটা ঘর। একলা থেকে হাঁপিয়ে উঠেছিলাম তাই একজন সঙ্গী পেয়ে আমি খুবই খুশী হয়েছিলাম। আমার নিজের কোন বোন নেই তাই কল্পনাকে সে আসনে বসিয়ে সাধ মিটিয়ে নিতে লাগলাম। মা কল্পনাকে নিজের মেয়ের মত মানুষ করতে লাগলেন, কল্পনা ওর নিজের মায়ের কাছে তেমন থাকত না। ছোট্ট সংসারে দু'জনে ভাইবোনের মত মানুষ হতে লাগলাম। বাবার প্র্যাকটিশও কল্পনা আসার কিছুদিনের মধ্যে বেশ জমে উঠায় পয়মন্ত মনে করে ভালবেসে ফেললেন। কোর্ট থেকে ফিরেই কল্পনাকে দেখতে না পেলে, তার ছোট্ট হাতে কিছু না কিছু উপহার না তুলে দিতে পারলে অস্থির হয়ে উঠতেন। কল্পনার অন্যায়

আব্দারে বা তার দুষ্টামিতে বিরক্ত হয়ে শাসন করলে মায়ের কাছে বকুনি খেতাম। তিনি বেশী রেগে গেলে কল্পনাই আবার আমার হয়ে মাকে বলত, মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করত। এমনি আনন্দে আমরা দিন কাট্যাচ্ছিলাম। আমাদের সংসার দেখে ভগবানেরও বোধ হয় হিংসা হল, না হলে এমন করে আঘাত দিয়ে আমাদের সংসার ভেঙ্গে দিলেন কেন? আমার যেদিন ম্যাট্রিক পরীক্ষার ফল বার হল দেখলাম আমি প্রথম হয়েছি। সে কি আনন্দ? মাকে খবর দিয়েই ছুটলাম কল্পনাকে খবর দিতে। দেখলাম এই ঘরের ঐ জানলায় বসে সে কাঁদছে। জিজ্ঞাসা করে জানলাম সেদিনই তারা দেশের বাড়ী চলে যাচ্ছে। মুহূর্ত্তে সব অন্ধকার হয়ে গেল, জীবনের প্রথম সাফল্যের সংবাদ যেমন আনন্দ দিয়েছিল, ঠিক তার থেকেও বেশী দুঃখে সব আনন্দ নিমেষে কোথায় যেন হারিয়ে গেল। আমার স্কুলের শিক্ষক ও বন্ধুরা সকলে সেদিন আমাকে অভিনন্দন জানাতে এলেন, কিন্তু তাদের দেখেও দেখলাম না। আমার মধ্যে প্রচণ্ড একটা ঝড়ের আলোড়নে আমাকে যেন হতবাক্ করে দিয়েছিল। বোধহয় ফেল করলেও তত দুঃখ পেতাম না। কল্পনা যে নিজের বোন নয়, ও যে কোনদিন চলে যাবে তা আমি ভাবতে পারিনি, তাই আঘাত আকস্মিক ছিল বলেই আমি সে আঘাতে পঙ্গু হয়ে গিয়েছিলাম।' বলতে বলতে সুখেনের দুচোখ জলে ভরে যায়। বলে —আজ যদি ও থাকত তাহলে কত আনন্দ পেত আর ও থাকলে মা বোধহয় এমন করে অসময়ে আমাদের ছেড়ে চলে যেতেন না।

কৃষ্ণা তাড়াতাড়ি এ প্রসঙ্গ বন্ধ করতে বলে উঠে—সে কথা ঠিক্ সুখেনদা। কিন্তু আজ তুমি সেই পুরানো দুঃখের জন্য কাঁদছ কেন? আজ তোমার এতবড় জয়ের মধ্যেও সেই পুরানো নিষ্ঠুর দুঃখের জয় হবে? তোমাব গৌরবে আমার বুক ফুলে উঠেছে আর তুমি সামান্য স্নেহের মোহে কাঁদছ? জীবনটা স্বপ্ন নয় সুখেনদা, আঘাত-সংঘাত জীবনে থাকবেই। তা না হলে জীবন যে হয় মিথ্যা, অসম্পূর্ণ। আনন্দের স্থান নিরুপন করতে পাবি আঘাত আছে বলেই। কিন্তু সে আঘাতকে বড় ভেবে অকারণ দুঃখ করা উচিত নয়।' সুখেন তীব্রস্বরে

বলে উঠে—'ও কথা বল না কৃষ্ণা। কল্পনাকে ভোলা যায় না, ভুলতে পারা যায় না তার ভ্রাতৃপ্রেম, স্নেহ-মমতা। তার সে আয়ত চোখের দৃষ্টি কি ভুলে থাকা যায়? কৈশোরের সুখ স্মৃতি কোন মানুষই ভুলে থাকতে পারে না, যে বলে আমি ভুলে গেছি সে হয় মিথ্যা বলে আর না হয় তার জীবনে তেমন কোন স্মৃতি ছিল না। স্কুল থেকে বাড়ী ফিরেই দেখতাম কল্পনা আমার জন্য বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে, আর আমাকে দেখলেই আনন্দে চীৎকার করে উঠত। ফিরতে দেরী হলে ও অস্থির হয়ে উঠত আর বাড়ী ফিরলেই অনুযোগ করত—আমার বুঝি এখনও ক্ষিদে পায়নি। তার সব কথা এখনও আমার মনে আছে, তা ভুলে যেতে পারিনি। নূতনের আবিলতায় পুরানোকে ভুলে যাওয়ার মাঝে কোন সার্থকতা নেই, আছে অহমিকা। কল্পনার কথা তোমার কাছে হয়ত অবান্তর, হাস্যকর মনে হতে পারে কিন্তু আমার জীবনে যার স্থান ছিল একদিন অনেক উচ্চে আজ তাকে অস্বীকার করব কি বলে? আর কেনই বা অস্বীকার করব?'

কৃষ্ণা আহতস্বরে বলে—'আমি সেকথা বলিনি সুখেনদা, আমি বলছি দুঃখকে বড় করে না দেখতে। আর এখন তুমি অসুস্থ, এখন ও সব ভাবলে তোমার শরীর আরও খারাপ হবে। একটু চুপ করে থেকে কৃষ্ণা আবার বলতে আরম্ভ করে—তুমি তোমার নিজের দুঃখটা বড় করে দেখছ সুখেনদা, কিন্তু দেখ তোমার থেকেও কতবড় দুঃখ মানুষ সহ্য করছে নীরবে। দুঃখটা বড় করে দেখলে, দুঃখকে প্রাধান্য দিলে দুঃখ কমে না সুখেনদা, বরং বেড়ে যায়। আমি একজনকে দেখেছি দুঃখকে অস্বীকার করতে, কিছুতেই তারকাছে পরাজয় স্বীকার না করতে। শুনবে তুমি সুখেনদা তার কথা? তবে শোন, তখন আমি মফঃস্বলের একটা স্কুলে পড়ি। আমাদের এক সহপাঠীকে আমরা খুব রাগাবার চেষ্টা করতাম। সে বয়সে মানুষকে আঘাত করে আনন্দ পেতেই সকলে ভালবাসে, বোঝে না তার দুঃখ, তার ব্যথা। মেয়েটা অনেকটা চীনা-নেপালীদের মত দেখতে ছিল, তাই আমরা ওকে চায়নাগার্ল বলে রাগাতাম। আসলে ওর নাম ছিল করবী মুখার্জী।

আমি ওকে দেখলেই চায়না বলে ডাকতাম আর তাতে যে ও খুব ব্যথা পেত তা ওর মুখ দেখলেই বোঝা যেত। মেয়েটা লেখাপড়ায় ভাল না হলেও খেলাধূলা, আবৃত্তি-অভিনয়ে খুব ভাল ছিল। স্কুলের প্রতিটি অনুষ্ঠানে ও এগিয়ে যেত। যদিও আমি ওকে খুব রাগাতাম তবু কি জানি কেন আমরা দুজনেই দু'জনকে ভালবাসতুম। আমাদের কথায প্রথম প্রথম ও খুব রাগ করত কিন্তু পরে চুপ করে থাকত। নীরবে কাতর দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত যেন বলতে চাইত---আমি তো তোমাদের কোন ক্ষতি করিনি তবু কেন আমাকে দুঃখ দিচ্ছ? করবী খুব ভাল গল্প লিখতে পারত, স্কুলের ম্যাগাজিনে ওর অনেক গল্প ছাপা হয়েছে। নূতন কোন গল্প লিখলেই আমাকে না দেখিয়ে থাকতে পারত না। স্কুলের স্পোর্টস্-এ ও প্রায় সব বিষয়েই প্রথম হত দেখে অনেকে হিংসা করত। তাই একদিন করবী আমাকে বলল—"আমি আর স্পোর্টস্-এ নাম দেব না কৃষ্ণা।" আমি অবাক হয়ে কারণ জিজ্ঞাসা করতে ও বলল—"আমি ফার্স্ট হই বলে অনেকে আমাকে দেখতে পারেনা, হিংসা করে। তাই ঠিক করেছি আর নাম দেব না।" আমি অনেক বলেও রাজী করাতে পারিনি। একদিন স্কুল যাচ্ছি এমন সময় করবী তাড়াতাড়ি আমাকে তার বইগুলো ধরতে দিয়ে ছুটে গেল এক বুড়ী ভিখারীর কাছে। কি দেখলাম জান? করবী বুড়ীকে দুহাতে তুলে নিল, এতটুকু সংকোচ করল না। বুড়ীর মুখদিয়ে তখনও রক্ত উঠেছে। আমরা সভয়ে করবীকে বললাম—'কি করছিস্ তুই? ওর যে যক্ষ্মা হয়েছে?' করবীর সে দৃষ্টি আমি আজও ভুলিনি। ও যেন অন্য করবী, সেই শান্ত মেয়েটি নয়। দুচোখে আগুন ঝরিয়ে বলল—'তা জানি। তোদেরকে এখন আমি ছোঁব না, একেও তোদের ছুঁতে হবে না। তোরা ভাল মেয়ের দল স্কুলে পড়তে যা আমি একে হাসপাতাল নিয়ে যাচ্ছি।" বলেই একটা রিক্সা করে বুড়ীকে নিয়ে চলে গেল। সেদিন থেকে আমি ওকে শ্রদ্ধা করতে লাগলাম, আরও ভালবেসে ফেললাম।

সেদিন বিকালে আমাদের বাড়ীতে করবী এলে তাকে সবার সঙ্গে

আলাপ করিয়ে দিলাম। ওর কাছে ক্ষমা চেয়ে ওকে প্রিয় বান্ধবী করে নিলাম। বাড়ী যাবার সময় করবী বলল—"যক্ষ্মা ওয়ার্ডের দশ নম্বর বেডে বুড়ীকে ভর্ত্তি করেছি, তোর বাবাকে একটু দেখতে বলিস।" করবীকে বলতে চেয়েছিলাম এসব ঝামেলা করবার তার কি প্রয়োজন ছিল, কত লোকই পৃথিবীতে এভাবে মরছে। কিন্তু তার সরল সুন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে বলতে পারিনি।

করবীকে তার বাড়ীতে কে কে আছেন জিজ্ঞাসা করায় ও বলেছিল —আমি কাকার কাছে থাকি বাড়ীতে কাকা-কাকীমা, তাঁদের ছেলে অঞ্জন আর মেয়ে খুকু।

বলেছিলাম—তোর মা-বাবা কোথায় থাকেন ?

প্রশ্ন করেই বুঝেছিলাম অজ্ঞাতসারে ওকে খুব আঘাত দিয়েছি। ওর মুখটা ব্যথায় বিবর্ণ হয়ে উঠল, ক্ষীণ কণ্ঠে বলল—বাবা নেই, মা পাগল। তারপর একটু হেসে সহজভাবে বলল—কি রে অবাক হলি ? শুনবি সব কথা। তবে শোন্—

তখন স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হয়েছে। বাংলা দেশে স্বদেশমুক্তির সংকল্পে হাজার হাজার ছেলে ফাঁসী যাচ্ছে, স্বেচ্ছায় জেলে যাচ্ছে! সে জোয়ারে কত প্রাণ বলি হল, কত পরিবার ধ্বংশ হল, কত মেধাবী ছাত্র অকালে শেষ করল তাদের জীবন তার ইতিহাস পড়লে এখনও রক্তে আগুন ধরে। আমার বাবাও সে জোয়ার থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারেননি, ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন সে আন্দোলনে। তখন বাবা এম, এ পড়তেন। এ কথা মায়ের কাছে শুনেছি। থাকল পড়াশোনা, দেশ স্বাধীন করবার মুক্তি যজ্ঞে যোগ দিলেন তিনি। বিদেশী শাসকদের তাড়িয়ে দেশমাতৃকার মুক্তি সাধন করতে, পরাজয়ের কালিমা মুছে জয়টিকা পড়বার ইচ্ছায় দলে দলে সংগ্রাম করছে, আহুতি দিচ্ছে জীবন। প্রাণের দাম তখন কেউ হিসাবের মধ্যে রাখত না। প্রাণ যাক্ আসুক স্বাধীনতা পবিত্র স্বাধীনতা। প্রাণের দাম তার তুলনায় অতি তুচ্ছ। ক্ষুদিরাম ফাঁসীর দড়ি ফুলের মালার থেকেও বেশী গৌরবের প্রমাণ করেছেন, বাঘা যতীন বুড়ি বালামের প্রাঙ্গনে

দেখালেন সশস্ত্র বাহিনী তা সে যত বিপুলই হোক্ না কেন পুতমন্ত্র রক্ষায় তাঁরাও যুদ্ধ করতে পারেন নির্ভিক্ ভাবে। আর তাই বাংলার গ্রামে গড়ে ওঠেছিল বিপ্লবী সংঘ। ইংরাজ তখন সন্ত্রস্ত, রাজ্যভয়ে ভীত। চারিদিকে তীব্রদৃষ্টি রেখেছে সে আর সামান্য আভাস পেলেই গ্রেপ্তার করে, ফাঁসী দিয়ে নিজের প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রাখতে চাইছে। দার্জিলিং-এর একটা জায়গায় বাবাবা তখন লুকিয়ে বোমা তৈরী করছেন। যেমন করেই হোক্ ইংরাজ তাড়াতেই হবে, স্বাধীনতা চাই এই তাঁদের ব্রত। কেমন করে একথা ইংরাজরা জেনে ফেলল। সশস্ত্র সৈন্য বাবাদের আখড়া অবরোধ করল, দলের দু'চারজন ধরা পড়ল। কিন্তু বাবাকে ধরতে পারল না। কয়েকজন পালাতে গিয়ে আহত হল, বাবাও পালাতে গিয়ে আহত হলেন। পায়ে একটা গুলি লাগল, কিন্তু তাতে ভ্রূক্ষেপমাত্র না করে ছুটে এসে একটা বস্তির মধ্যে ঢুকে পড়েন। বস্তির লোকরা বাবাকে লুকিয়ে রাখতে রাজী হয়। সেই সময় আমার মা বাবাকে সেবা যত্নে সারিয়ে তোলেন। মায়ের সেবায় আর তাঁর ভালবাসায় বাবা তাঁকে বিয়ে করলেন। আমার মা নেপালী মেয়ে। বাবা কিন্তু সেজন্য কোন সংকোচ করেন নি। বাবা জাতি ভেদকে অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করতেন। তাঁর মুখে শুনেছি—মানুষের মধ্যে ভেদ নেই, সকলেই সমান। তবে শুধুমাত্র একটা ভেদ আছে সাহসী আর ভীরুর। যে ভীরু সে দুর্বল, সে করুণার পাত্র। দাদার জন্ম হল। বাবা কিন্তু গোপনে তখনও আন্দোলন চালাচ্ছিলেন। কিছুদিন পরে মা-বাবা দুজনেই ধরা পড়লেন। বিচারে পাঁচ বছর জেল হল। দাদা মামাদের কাছে রইলেন আর আমার জন্ম হল জেলে। জেল থেকে বেড়িয়ে বাবা মা ও আমাকে নিয়ে তাঁর বাড়ীতে গেলেন। কিন্তু অন্যজাতীতে বিয়ে করেছেন বলে কেউ তাঁদের গ্রহণ করল না। তাঁরা সমাজ ভয়ে নিজেদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়কে বাড়ীতে স্থানদিতে অস্বীকার করলেন। বাবাও রাগ করে মাকে নিয়ে দার্জিলিংয়ে ফিরে এলেন। জেল থেকে বার হয়ে বাবা খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। ডাক্তার বলল যক্ষ্মা। আমার মনে আছে একদিন বাবার মুখ দিয়ে রক্ত

উঠতে দেখে আমি ভয়ে চিৎকার করে উঠেছিলাম। কিছুদিন পরেই বাবা মারা গেলেন আর সে শোকে মা পাগল হয়ে গেলেন। কাকা মাঝে মাঝে খবর নিতেন, টাকা পাঠাতেন। বাবা মারা যাবার পর কাকা মা ও আমাকে বাড়ী নিয়ে গেলেন সকলের বাধা তুচ্ছ করে। দাদা মামাদের ওখানে থেকেই পড়তে লাগল। মা কিন্তু আর ভাল হলেন না, দিন দিন তাঁর পাগলামি বাড়তে থাকায় শেষে তাঁকে বেঁধে রাখাহত। আমার খুব কষ্ট হত কিন্তু কোন উপায় ছিল না। পরে আমার মনের কথা বুঝতে পেরে কাকা তাঁকে রাঁচীতে পাঠিয়ে দিলেন। সেই থেকে মা ওখানেই আছেন, জানিনা এখন কেমন আছেন।

বলতে বলতে কেঁদে ফেলে করবী। একটু পরে সামলে নিয়ে বিচিত্র হাসি হেসে বলে—তোরা আমাকে ঠাট্টা করিস চীনাগার্ল বলে আজ বুঝলি ত কেন আমাকে ও রকম মনে হয়। যাক্ সে কথা। আমি কাকার কাছেই মানুষ হতে লাগলাম। কাকা আমাকে খুব ভালবাসেন কিন্তু কাকিমা ঠিক তার উল্টো। কাকিমা আমাকে একেবারেই দেখতে পারেন না, সর্বদা বকাবকি করেন। পারলে আমার পড়া ছাড়িয়ে দিতেন শুধু কাকার ভয়ে তা পারেন না। কাকা বুঝতে পারেন সব। তাই বলেন—'দুঃখ করিস না মা, আমি থাকতে কেউ তোকে বিশেষ কিছু করতে সাহস করবে না। কিন্তু মা ভয় হয় আমি মারা গেলে তোর কি হবে ভেবে। তুই তাড়াতাড়ি পাশ করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে শেখ মা।'

কাকার মুখ চেয়েই কাকিমার সব অত্যাচার চুপ করে সহ্য করি। তাঁর মুখখানা মনে পড়লেই সব দুঃখ ভুলে যাই। শুধু ভাবি কি বিচিত্র এই জগৎ। একদিকে স্নেহ প্রবাহিনীর স্বচ্ছ সলিল ধারা আর অন্যদিকে দয়ামায়া হীন নিষ্ঠুরতা। এই দুয়ের পার্থক্য কি বিরাট, কিন্তু নিশ্চিত অবস্থিতি। কাকার স্নিগ্ধ স্পর্শ, তাঁর স্নেহ আমাকে দেয় আনন্দের দোলা আর কাকিমার অত্যাচার, তাঁর তীব্র কথার আঁচড় আমার বুকে শেলের মত বেঁধে। কাকিমা কাকাকেও মাঝে মাঝে কথা শোনাতে ছাড়েন না, তুমুল ঝগড়া হয় আমাকে কেন্দ্র করে। কাকা কখনও গরম হয়ে

কাকিমাকে বলেন করবী আমার রোজগারে খায় পড়ে তোমার রোজগারে নয়। কখনও বুঝিয়ে বলেন ওর কেউ নেই, আমরা কাকা-কাকিমা হয়ে যদি ওকে না দেখি না মানুষ করে তুলতে চাই তাহলে কে ওকে দেখবে? মনে কর করবীও আমাদের মেয়ে।

তখনকার মত চুপ করলেও এক-আধদিনের মধ্যেই কাকিমা আবার নিজের মূর্ত্তি ধরেন। কাকা বাড়ীতে না থাকলে মারতে পর্যন্ত ছাড়েন না! কাকা মাঝে মাঝে দুঃখ করে আমাকে বলেন—'রোজগার বেশী থাকলে তোকে বোর্ডিং-য়ে রাখতুম, এত কষ্ট দিতাম না। কিন্তু কি করব মা আমার সে পথ বন্ধ, কষ্ট হলেও কোন রকমে সহ্য কর।' কাকার মুখের দিকে তাকিয়ে তাঁকে কষ্ট না দিতেই শুধু এখানে আছি তা না হলে চলে যেতাম দাদার কাছে না হয় অন্য কোথাও। কিন্তু আশ্চর্য কি জানিস্ দাদাকে আমি একেবারেই ভুলে গেছি, অন্য যে কেউ দাদা বলে এসে দাঁড়ালে আমি প্রতিবাদ করতে পারব না। কাকার কাছে শুনেছি দাদা এখন বড় হয়েছে—অনেক বড়।

কৃষ্ণা বলে—সেই থেকে করবী আমার প্রাণের বন্ধু হয়ে গেল দুজনে নানা কথায় দিন কাটাতে লাগলাম। কিন্তু কিছুদিন পর এক ঝড়ো হাওয়ায় আমাদের সংসার বিপর্যস্ত হয়ে গেল, সব শান্তি মুহূর্ত্তে কোথায় চলে গেল। দাদা মারা গেল। দাদার তখন সুনামে আমরা গর্ব করতাম। দাদার মৃত্যুর কয়েক দিনের মধ্যে মাও চলে গেলেন। বাবা সে আঘাতে আর ওখানে থাকতে পারলেন না, চলে এলেন কলকাতায় আমাকে আর দিদিকে সঙ্গে নিয়ে। কৃষ্ণা চুপ করে গেল এবার, যেন সেই বিভীষিকা স্মরণে কথা হারিয়ে ফেলেছে।

সুখেন তন্ময় হয়ে শুনছিল এতক্ষণ। এবার কৃষ্ণাকে জিজ্ঞাসা করে —তারপর?

কৃষ্ণা সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে আবার বলতে থাকে—তারপর আমরা চলে এলাম এখানে, আমাদের দুজনের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল।

সুখেন জিজ্ঞাসা করে —তোমার সাথে আর কোনদিন দেখা হয়নি?

কৃষ্ণা আনমনা হয়ে উত্তর দেয়—হয়েছিল। বলেই আবার চুপ

করে যায়। তার চিন্তা বাস্তবের সীমা ছাড়িয়ে চলে যায় দূরে। স্থান কাল ভুলে কৃষ্ণা নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে জানলার বাইরে দূরের আকাশের দিকে।

সুখেন ডাকে—কি হল কৃষ্ণা, চুপ করলে যে? বল কোথায় দেখা হল, কি দেখলে?

কৃষ্ণা একটু লজ্জা পেয়ে যায়। বলে—কিছুদিন আগে কলেজ থেকে আসছি এমন সময় মনে হল কে যেন আমার নাম ধরে ডাকছে। পিছনে তাকিয়ে দেখলাম সত্যিই তাই, একটু এগিয়ে গেলাম। কিন্তু চিনতে পারলাম না। ও আমার অবস্থা দেখে হেসে বলল—'কিরে চিনতে পারছিস্ না, আমি করবী।' কিন্তু ওর হাসি দেখে চিনেছি, একটু মোটা হয়ে গেছে তাই প্রথমটা চিনতে পারিনি। জড়িয়ে ধরতেই করবী অভিমানে কপট রাগ দেখিয়ে বলল—যা, আর দরদ দেখাতে হবে না। চিনতেই পারিস না, একেবারে ভুলে গেছিস তুই।

কিন্তু ততক্ষণে আমি ওকে একরাশ প্রশ্ন করে ফেলেছি। আমার প্রশ্ন শুনে বলল— দাঁড়া, সব প্রশ্নের উত্তর কি এক কথায় দেওয়া যায়, একটু সময় দে। আমি ওকে নিয়ে এলাম আমাদের বাড়ীতে। বেশ কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে একটু চাঙ্গা হয়ে করবী বলল—কলকাতায় এসেছি স্কুলের কাজে। আমি এখন একটা স্কুলের চাকরী নিয়েছি। তুই চলে আসার মাস ছয়েক পর কাকা কি একটা কাজে বাইরে গেলেন প্রায় দশ-পনের দিনের জন্য। কাকিমা যেন এই সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। তিনি উঠতে-বসতে আরম্ভ করলেন অত্যাচার-প্রহার। অসহ্য হলেও কাকার মুখ চেয়ে, তাঁর স্নেহের কথা ভেবেই চুপ করে থাকলাম। কিন্তু কাকিমা যেন মরিয়া হয়ে আমার পিছনে লাগলেন। একদিন আমার মা-বাবার নামে নানা কটুকথা বলে তীব্র-ভাবে আক্রমণ করলেন। আমি আর চুপ করে থাকতে পারলাম না, প্রতিবাদ্ করলাম। ব্যাস্ আগুনে যেন ঘী পড়ল। কাকিমা দপ্ করে জ্বলে উঠলেন তারপর তাঁর পায়ের শ্লিপার দিয়ে মারতে মারতে বাড়ী থেকে বার করে দিলেন। অতিবড় দিব্বি দিয়ে বললেন আমি যেন

আর কোনদিন তাঁর বাড়ী না ঢুকি। আমার সঙ্গে থেকে তাঁর ছেলে-মেয়েরাও নাকি বিপথে যাচ্ছে। অঞ্জন আমাকে খুব ভালবাসত, তাই তিনি আমার উপর আরও রেগে ছিলেন। কাঁদতে কাঁদতে চলে এলাম এক বন্ধুর বাড়ী। তোর মনে আছে মঞ্জুকে ? সেই মঞ্জুর বাড়ী। মঞ্জুর মা-বাবা আমাকে আশ্রয় দিলেন। তারপর একদিন তাদের কাছ থেকে কিছু টাকা নিয়ে পাড়ি দিলাম দাদার উদ্দেশ্যে দার্জিলিং-এর দিকে। কাকিমা আমাকে এক কাপড়ে বার করে দিয়েছিলেন, বাড়তি জামা-কাপড় নিতে দেন নি। শুধু নিয়েছিলাম দাদার ছোট বেলার একটা ছবি। সেই ছবি মাত্র সহায় করে একদিন এসে পোঁছালাম দার্জিলিং-এ। সেখানে পৌঁছে ঘুরতে লাগলাম বস্তীতে বস্তীতে। নেপালী পল্লীর একজন বয়স্কা মহিলা আমাকে আশ্রয় দিলেন আমার অবস্থা দেখে। সেখানে থেকে খোঁজ করতে লাগলাম দাদাকে। কোন নেপালী ছেলে পেড়িয়ে গেলেই ছবির সঙ্গে মেলাতে থাকতাম। শেষকালে সেই বয়স্কা মহিলাই খোঁজ এনে দিলেন দাদার। জানলাম দাদা খুব ভাল কাজ করে! শুনেই মনটা আনন্দে ভরে উঠল। কিন্তু পরক্ষণেই আবার মুষড়ে পড়লাম। দাদা যদি আমাকে অস্বীকার করে ? কোন দিন দেখেনি আমাকে, সুতরাং আজ না চিনতে পারাই ঠিক। মন প্রস্তুত করতে লাগলাম। কিন্তু ওখানকার কয়েকটা বদমাইশ ছেলে আমাকে নানাভাবে অপমান করতে লাগল। প্রথমে প্রলোভন দেখিয়ে সুবিধা করতে না পেরে তারা ভয় দেখাতে সুরু করল। সেসব আমি গ্রাহ্য করতাম না কিন্তু দেখলাম আমার আশ্রয়দাত্রীও বেশ বিপন্ন হয়ে পড়েছেন তাদের উৎপাতে। তাই একদিন গেলাম দাদার সঙ্গে দেখা করতে। দাদা তখন বাইরে বার হচ্ছিল। আমি অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে আলাপ করলাম বন্ধুর মত। জিজ্ঞাসা করলাম—তোমার সঙ্গে একটু আলাপ করতে পারি কি ? আমার কথা শুনে দাদা কেমন অবাক হয়ে গেল। কারণ আমি বাংলায় কথা বলছিলাম। দাদা কনভেণ্টে পড়লেও বাংলা শিখেছিল তাই আমার দিকে তাকিয়ে বলল তোমার নাম কি ? নাম শুনে বলল—তোমার নাম শুনে মনে হচ্ছে তুমি

বাঙালী। আমিও বাঙালী অবশ্য। কিন্তু তোমাকে তো কোনদিন দেখিনি? তুমি কি এখানে থাক? কোথায় পড় তুমি?

সেকি কঠিন পরীক্ষা, কি কঠিন দ্বন্দ্ব! একবার ভাবি পরিচয় দেই, আবার ভাবি যদি দাদা অবিশ্বাস করে? যদি পাগল ভাবে? পৃথিবীতে আর কোনদিন কি কোন সহোদর ভাই-বোন এমন পরিস্থিতিতে পড়েছে? এমন ভাবে পরিচয় দিতে হয়েছে কি কোন বোনকে? নানা চিন্তায় মন-তোলপাড় করে দিল। কি ভাবে আরম্ভ করব এই ভাবতেই আমার সব কথা যেন হারিয়ে গেল? দাদা আমার অবস্থা দেখে বেশ একটু আশ্চর্য্য হয়েই জিজ্ঞাসা করল—কি হল?

নিজেকে সংযত করলাম। যা হবে হোক্ আর ফেরা যায় না। আমি আস্তে আস্তে নিজের কথা বলতে আরম্ভ করলাম। যেই বাবার নাম বলেছি অমনি দাদা আনন্দে চিৎকার করে আমাকে জড়িয়ে ধরল। দাদার সেকি আনন্দ! কৃষ্ণা, মানুষ যদি স্বর্গের চাঁদও হাতে পায় তা হলেও বোধ হয় এত আনন্দ পাবে না। তখন সূর্যের লাল আলোটুকু পাহাড়ের চূড়ায় যেন মুকুটের মত শোভা পাচ্ছে, কি সুন্দর মুহূর্ত্ত। যদি সে সময় কেউ আমাদের ভাইবোনের মিলন দেখত তাহলে সে নিশ্চয়ই অবাক হয়ে যেত। দাদা আমার দুঃখের কথা শুনে কাঁদতে কাঁদতে বলল—কেন তুই আগে চলে আসিস নি?

সেদিন থেকে আমার জীবনের কালো অংশটুকু সরে গেল, যেন অস্তগামী সূর্য্য আমার দুঃখে দুঃখী হয়ে তার রাঙা আলোয় আমার জীবন রাঙিয়ে দিয়ে গেল। দাদার সঙ্গে তার বাসায় গেলাম। সেখানে থাকে দাদা, দাদাকে যে মানুষ করেছিল সেই বুড়ি আর সাত-আট বছরেব একটি ছেলে। দাদার কাছে জানলাম ও বড়মামার ছেলে। দাদ আমাকে ইংরাজী মিডিয়ামে ভর্তি করল স্কুলে। দাদার কাছে ছিল বাবার একটা ছবি, দেখলাম আমার বাবার যৌবনরূপ। পাশ করলাম ম্যাট্রিক ভালভাবেই। দাদা আমার আপত্তি সত্বেও ভর্ত্তি করল কলেজে। কিন্তু ভাল লাগল না, ছেড়ে দিয়ে ট্রেনিং নিলাম। তারপব

থেকে শিক্ষিকা জীবন যাপন করছি। দাদার বিয়ে দিয়েছি। একবার যাস্ আমার কাছে, খুব ভাল লাগবে তোর।

করবী দু-তিন-দিন আমাদের কাছে থেকে গেল। তুমিও বোধ হয় তাকে দেখে থাকবে, এই বাড়ীতেই তো সে এসেছিল। কাল ওর চিঠি পেয়েছি দু'চারদিন পরেই ওর বিয়ে। যাবার জন্য কত করে লিখেছে। তোমার অসুখ না হলে হয়ত যেতাম, কিন্তু তোমার অসুখে কি করে যাই ?

কোন কথাই তখন সুখেনের কানে যায় না। সে ভাবে কৃষ্ণা তো তার প্রিয়বন্ধুর দেখা পেয়েছে, জেনেছে তার জীবন কথা। আমি কি পাব কল্পনার দেখা কোনদিন। আবার দেখতে পাব কল্পনাকে, আদরের বোনকে। হয়ত দেখব কল্পনার বিয়ে হয়ে গেছে, দিব্যি গিন্নী হয়ে উঠেছে। দুঃখের মাঝেও হাসি আসে সুখেনের। সেই কল্পনার বিয়ে হয়েছে, সংসারী হয়েছে ভাবতেই হাসি পায়। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবে না, হয়ত এখনও বিয়ে হয়নি। বিয়ে হলে কি বিয়ের সময়ও তাকে মনে পড়ত না একটুও ? একটা খবরও কি দিত না কল্পনা ?

এমন সময় দীনেশবাবু কৃষ্ণার বাবার সঙ্গে ঘরে ঢুকেই বললেন—তোমার খবর জেনেছি সুখেন। খুব খুশী হয়েছি আমি।

ডাক্তারবাবু তাকে জিজ্ঞাসা করলেন সে কেমন আছে। উত্তরে সুখেন বলে—খুব ভাল আছি। তবু কৃষ্ণার ধমকে একটুও উঠে বসতে পাই না। আপনি একটু বলে দিন তো ওকে অত কড়াকড়ি নিয়ম একটু শিথিল করতে।

হাসতে হাসতে ডাক্তারবাবু বলেন—আর দু'চারদিন বিশ্রাম নাও সুখেন, শরীরে বল পাবে।

সুখেন কাতর স্বরে বলে—তবু কৃষ্ণাকে একটু ধমক দিন। না হলে ও বোধহয় ডাক্তারী করবার এমন সুযোগ পেয়ে তার সর্বশক্তি নিয়োগ করা ছাড়বে না।

দীনেশবাবু ও ডাক্তারবাবু হাসতে হাসতে বাইরে যান।

॥ ৯ ॥

প্রথমটায় ওকালতি করবার ইচ্ছা ছিল না সুখেনের কিন্তু যখন দেখল দীনেশবাবুর খুব ইচ্ছা সে তাঁর চেম্বারে বসে তখন শেষে রাজী হয়ে ল পড়তে লাগল। দীনেশবাবু প্রথম যখন তাঁর ইচ্ছা জানান তখন সুখেন রাজী হয়নি। কিন্তু যখন দেখল দীনেশবাবু তাঁর চেম্বারে আর কেউ বসবে না ভেবে খুব দুঃখ পেয়েছেন তখন সুখেন পাশ করার পর নিজে থেকেই বাবাকে বলল সে ল পড়বে। দীনেশবাবু বলেছিলেন—নিজের মন বুঝে নাও সুখেন। আমি তোমাকে জোর করে এ লাইনে আনতে চাই না। যদি সত্যিই রাজী হয়ে থাক, মন থেকে সাড়া পাও তা হলেই এ লাইনে এস, না হলে তোমার যে লাইনে খুশী সে লাইনে যাও। জোর করে কোন জিনিষ কেউ করতে গেলে সে সফল হয় না, তাই তোমাকে বলছি ভাল করে ভেবে তবেই ল পড়।

সুখেন তাঁর কথায় হেসে বলেছিল—বুঝেছি বাবা, নিজের মন বুঝেছি বলেই তো ল পড়তে চাচ্ছি। তোমার সুখেন নিশ্চয়ই তোমার সম্মান রাখবে বাবা।

আনন্দে দীনেশবাবুর দু'চোখ সজল হয়ে উঠেছিল। তিনি ধরা গলায় বলেছিলেন—তা জানি সুখেন। তোমার যাত্রাপথে আমার আশীর্বাদ সবসময় আছে জানবে।

দীনেশবাবুর সঙ্গে ডাক্তারবাবুর চুক্তি হয়ে গেছে। কৃষ্ণার সঙ্গে

সুখেনের বিয়ে দিয়ে দু'জনের সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ঠ করে জীবনের বাকি দিনগুলি আনন্দে কাটিয়ে দেবেন।

সেদিন সুখেন কি একটা বই পড়ছিল এমন সময় কৃষ্ণা ঘরে ঢুকেই বলল—চল সুখেনদা।

সুখেন বলল—কোথায় ?

কৃষ্ণা বলে—'বোটানিক্যাল গার্ডেন। অনেকদিন ধরে যাব যাব মনে করছি, চল আজ।' সুখেনও একটু বেড়াবার ইচ্ছায় রাজী হয়ে গেল। কংক্রীট্ শোভিত মহানগরীর বাইরে শ্যামল তরু রাজীর জগতে গিয়ে হাঁপিয়ে উঠা মনকে একটু সতেজ করতে দু'জনে চলে বোটানিক্যাল গার্ডেনের দিকে। চলার আনন্দে দু'জনে বিভোর একটা করে গাড়ী, ট্রাম তাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছে আর সুখেন দেখে একে অপরকে ছাড়িয়ে চলে যাবার নেশায় স্পীড্ একটু একটু করে বাড়িয়ে দিচ্ছে। সুখেনের মনে হয় সংসারের পথেও এমনি কত গাড়ী মিছিল করে চলেছে একটুও থামবার অবকাশ নেই, শুধু চল আর চল। থামলেই হবে ছন্দপতন, অ্যাক্সিডেণ্ট্, স্তব্ধতা। সুতরাং থামা চলবে না, যেতেই হবে জোরে আরও জোরে। পার যদি তবে কাউকে, পেছনে ফেলে এগিয়ে যাও দ্রুত, না হলে পড়ে থাক পিছনে। কেউ দেখতে আসবে না, কেউ তোমার জন্য থামবে না একটুও, করবে না তাদের গতিরোধ। তোমার এগিয়ে যাবার জন্য একমাত্র সহায়ক তোমার স্পীড্ আর তোমার চালনা। স্পীডের মাথায় চালনা ঠিক না হলেই পতন অনিবার্য। চিন্তায় বিভোর সুখেনের হাত কখন যে কৃষ্ণার কোলে পড়েছে তা খেয়াল করেনি সুখেন, কৃষ্ণাও জানায় না কিছু। শুধু নিজের অনুভূতিতে বুঝেতে চেষ্টা করে সুখেনের মনের ভাষা।

গার্ডেনের কাছাকাছি আসতেই সুখেনের খেয়াল চাপে রাস্তায় একটু হাঁটতে। গাড়ী থামিয়ে ভাড়া মিটিয়ে দেয় সে তারপর হাঁটতে থাকে আস্তে আস্তে। হঠাৎ সুখেন থমকে দাঁড়ায়, কৃষ্ণার দিকে তাকিয়ে বলে—দেখছ ঐ বুড়ীকে। ওকে দেখে আমি চমকে গিয়েছিলাম।

অনেকটা সুমুর মার মত দেখতে। উঃ, সুমুর মার কথা যেন আর ভাবা যায় না।

কৃষ্ণা একটু অবাক হয়ে বলে—কেন? সুমু কে সুখেনদা?

সুখেন বলে—চল ওখানে বসে সব কথা বলব তোমাকে। দুজনে গার্ডেনে প্রবেশ করে। সবুজের সমারোহে খুশীর ছোঁয়া লাগে দুজনের মনে। একটু আগেই যে দুঃখে সুখেন চঞ্চল হয়ে উঠেছিল প্রকৃতির প্রাণের স্পর্শে তা' দূর হয়ে যায়।

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপ করে থাকে, অনুভব করে প্রকৃতির শান্তি। ক্লান্ত বৈচিত্র্যহীন জীবন এই সতেজ সবুজ প্রকৃতির খুশীর ছোঁয়ায় পূর্ণ হয়ে উঠে। একটু সতেজ হতেই কৃষ্ণা সুখেনকে জিজ্ঞাসা করে সুমুর কথা।

সুখেনও তন্ময় হয়ে অনুভব করছিল এই শান্তি, কৃষ্ণার কথায় সম্বিত ফিরে পেয়ে বলে—ও, হ্যাঁ? সুমুর কথা তোমাকে এখনও বলা হয়নি। সুমুর ভাল নাম সুমন্ত সান্যাল। আমাদের সঙ্গে স্কুলে পড়ত সুমু। গরীবের ছেলে সুমু স্কুলে আসত ছেঁড়া জামা কাপড় পড়ে, পায়ে কোনদিন জুতো দেখিনি। তার মা লোকের বাড়ী রান্না করে কোনরকমে তাকে মানুষ করছিলেন। আমি দেখেছি আমরা তাঁদের বাড়ী গেলে কি খুশীই না হতেন, আনন্দে তাঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠত। বলতেন—আমরা গরীব, তাই তোমাদের ভাল-মন্দ কিছু খাওয়াতে পারব না, কিন্তু আমি আশীর্বাদ করছি তোমরা বড় হও, মানুষ হও। আমার সুমু সেদিন বড় হবে, নিজে রোজগার করতে পারবে সেদিন কোন কষ্টই থাকবে না আর আজ যে কষ্ট করছি তাও সেদিন ভুলে যাব। তোমরাও দেখ বাবা আমার সুমু যেন মানুষ হয়ে উঠে।

সুমুর বাবা ছিলেন শিক্ষক, সারাজীবন শুধু শিক্ষকতা করে কাটিয়েছেন। সত্যিকারের দরদ দিয়ে তিনি পড়াতেন, বোঝাতে চাইতেন। মেধাবী ছাত্র পেলে প্রাণ দিয়ে তাকে পড়াতেন। আর গরীব ছাত্রদের একটা দল প্রতিদিন সন্ধ্যায় তাঁর কাছে আসত পড়বার জন্য। বিনা পয়সায় নিজের বাড়ীতে এই সব গরীব ছাত্রদের পড়াতেন

তিনি। সংসারের শত প্রয়োজনেও তিনি কোন ছাত্রের কাছে হাত পাতেন নি। বলতেন—আমি শিক্ষক, ব্যবসাদার নই। আমার শিক্ষায় যদি একটি ছাত্রও আমার আদর্শ বুঝতে পারে, সেই আদর্শে নিজে অনুপ্রাণিত হয় তাহলে সার্থক আমার শিক্ষকতা, আমার জীবন। ভাবীকালের শিক্ষকরা আমার কর্মে যদি উৎসাহ পায়, যদি বুঝতে পারে শিক্ষক জাতির মেরুদণ্ড, দেশের প্রাণ প্রতিষ্ঠার প্রধানতম সহায়ক তাহলে আজকের এই দুঃখভোগ সার্থক হবে আর তোমরাও হবে গর্বিত। সংসারের স্বচ্ছলতার দিকে দৃষ্টি রাখতে গিয়ে আদর্শ-চ্যুত হতে পারব না আমি। সমস্ত কিছু স্বার্থের বিনিময়ে দেশের ভবিষ্যতদের পথকে উজ্জ্বল রাখতে হবে।

সুমুর মা মাঝে মাঝে রাগ করতেন। বলতেন—যদি আজীবন শুধু দুঃখই পেতে হয় তাহলে স্বার্থকতা কোথায় বাঁচার? একমাত্র ছেলেকে যদি ভাল জামা-কাপড় পড়তে দিতে না পারি, যদি তার ইচ্ছামত ভাল খাবার দিতে না পারি তাহলে মা হিসাবে আমি কি অপরাধী নই? এইটুকু বয়সে যখন জীবন ভোগ করে সকলেই তখনও শুধু পাবে উপদেশ আর অবহেলা? আর তুমিই বা কি? নিজের ছেলেকে, নিজের সংসারকে একটু ভাল ভাবে চলতে দেবে না? তুমিও তো পার টিউশানী দু' একটা করে সংসারকে একটু স্বচ্ছল করতে।

সুমুর বাবা বলতেন—আমি মরণজয়ী শিক্ষক হতে চাই সুমুর মা, ভোগী পুরুষ নয়। এই স্বার্থান্বেষী জগতে দেখাতে চাই স্বার্থই সবথেকে বড় নয়, স্বার্থত্যাগ করেও সমাজে মাথা উঁচু করে বাঁচা যায়। সুমুকে আমি দামী পোষাক বা ভাল খাবার দিতে পারি না সত্য, কিন্তু তাকে দেব মানুষ হবার শিক্ষা। যেদিন সমাজে সুমু মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে শিখবে সেদিন কি মনে থাকবে তার এই তুচ্ছ দুঃখের কথা। দেখ ঐ রাস্তার ধারে সহায় সম্বলহীন কত মানুষ রয়েছে। তাদের কিছু নেই কিন্তু তবুও তারা মানুষ! তারাও ভগবানের সৃষ্টি এই আকাশ-বাতাস প্রাণ ভরে উপভোগ করছে, তা থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করবে কে? সমাজে ওদেরও একটা স্থান আছে। আর আমরা তো ওদের থেকে

অনেক ভাল আছি। ওই সহায়-সম্বলহীন হয়েও যদি ওরা বেঁচে থাকে তা হলে আমরাই বা পারব না কেন? কি দরকার অর্থের? অর্থ আমাদের কিছুটা বাহ্যিক সুখ দিতে পারে, দিতে পারে বিলাসের উপকরণ কিন্তু পারে কি জীবনে শান্তি এনে দিতে? জীবনধারণের মান বাড়ান যায় অর্থ দিয়ে কিন্তু পারে কি সেই জীবনের আদর্শ মন্ত্র দিতে। সে মন্ত্রের সন্ধান পাওয়া যায় শিক্ষায়, অর্থে নয়। দেখাতে পার আজ যারা বড়লোক, যারা ধনকুবের তারা সুখী, তারা আদর্শ মানুষ? পাবে না তাদের মধ্যে শান্তি খুঁজে, দেখবে তারা তোমার থেকেও অসুখী। তাই আমি মনে করি জ্ঞানের আলো এই ছোট ছোট শিশুদের অন্তরে প্রবেশ করলে ওরা নিজেরা পাবে জীবনের পথ খুঁজে। স্বার্থকে বড় করে দেখলে কষ্ট পাবে, তার থেকে ভগবান যা দিয়েছেন তা দিয়ে সন্তুষ্ট থাক। তাতে আর কিছু যদি নাও পাও তা হলেও পাবে শান্তি—যা অর্থের বিনিময়ে পাওয়া যায় না। আত্মতৃপ্তিই শান্তির পথ, তাতেই জীবনের সার্থকতা। আর সে আত্মতৃপ্তি পাবে জ্ঞানের মাধ্যমে। কাজেই সুমুকে যেভাবেই হোক্ মানুষ করতে হবে, লেখাপড়া শেখাতে হবে।

সুমুর মা কতকটা বুঝে ছিলেন, কতকটা না বুঝতে চাইলেও প্রতিবাদ নিষ্ফল জেনে চুপ করে থাকতেন। তাই মৃত্যুর পর যখন দেখলেন সুমুর বাবা শুধু মাথা গুঁজে থাকবার মত ঘরটি ছাড়া আর কিছুই রেখে যাননি তখন অবাক হয়ে ভাগ্যের কাছে দোষারোপ করেন নি, চেষ্টা করেছেন সুমুকে মানুষ করতে। কঠোর পরিশ্রম করে পড়ার খরচ চালাতেন তিনি। তাঁর দুঃখে সুমু প্রায়ই বলত—পড়াশোনা ছেড়ে চাকরী করব। তোমার দুঃখ দূর করব।

কথা শুনে রাগ করতেন তিনি। বলতেন—এত সব বড় বড় কথা তোকে কে শেখাল? এসব তোকে ভাবতে হবে না। যেমন করেই হোক্ আমি তোর পড়ার খরচ চালাব কিন্তু তোকে মানুষ হতেই হবে। এই একটি মাত্র আশায় আমি বেঁচে আছি, সব দুঃখ সহ্য করেছি। তোর বাবার শেষ ইচ্ছা ছিল তুই মানুষ হবি, আর সে ইচ্ছা আমি নষ্ট হতে দেব না।

সুমুর মা আমাকে বলতেন—সুমু তোমাদের বাড়ী গিয়ে কত ভাল ভাল খাবার খেয়ে আসে আর আমি তোমাকে কিছু দিতে পারি না। আমার সুমু বড় হলে তোমায় প্রাণ ভরে খাওয়াব।

কিন্তু কৃষ্ণা, মানুষের আশা পূর্ণ হয় খুব কম। ম্যাট্রিক্ পরীক্ষার কিছুদিন পর সুমু জ্বরে পড়ল। বেশ কিছুদিন পর একদিন কাশতে কাশতে মুখ দিয়ে উঠে এল রক্ত। ডাক্তার দেখান হল, এক্স-রে হল, জানা গেল টি, বি। দুটো ফুসফুসই আক্রান্ত হয়েছে এই কঠিন রোগে। আমরা চমকে উঠলাম এ সংবাদে। নিজেদের মধ্যে চাঁদা তুলে ওর চিকিৎসা করাতে লাগলাম। শুনলাম দুঃখের সংসারে চিরদিন কাটিয়ে ইদানিং ও সকাল-সন্ধ্যায় রোজগার করত একটা কারখানায় মজুর খেটে। কঠোর পরিশ্রমে এই রোগ ধরিয়েছে। সুমুর মা এই অসুখের সংবাদে একেবারে ভেঙ্গে পড়লেন শেষে তার দিকে আর আমরা তাকাতে পারি নি। এখন দেখা হলেই হাত ধরে বলেন-'সুমু বাঁচবে তো? যেমন করে পার ওকে ভাল করে দাও বাবা।' সুমু এখন কাঁচরাপাড়া যক্ষা হাসপাতালে আছে। সেদিন দেখে এলাম অনেকটা ভাল। কিন্তু সুমুর মার কাছে খুব কম যাই, দেখলেই সান্ত্বনা দেবার ভাষাও হারিয়ে ফেলি। আজীবনের আশার পথে এই আঘাত যে তাঁকে কি ভয়ানক লেগেছে তা তাঁকে দেখলেই বোঝা যায়। দূর থেকে যতটা পারি সাহায্য করতে চেষ্টা করি। জানো তুমি, কি দুঃখ সুমুর মায়ের! এখন একমাত্র সান্ত্বনা তাঁর ছেলে ভাল হয়ে উঠবে। কৃষ্ণা, বাগানে যদি একটা ভাল ফুলের গাছ ছোট থেকে তিল তিল করে বড় হয়ে উঠার পর ঠিক কুঁড়ি ধরবার সময় যদি দেখ পোকায় গাছটা কেটে দিয়েছে তাহলে তোমার কিরূপ ব্যথা লাগবে বল তো? আর এত গাছ নয়, একমাত্র ছেলে! বুকের রক্ত-মাংস দিয়ে গড়া তাঁর সন্তান! মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে বিধবা মার আশা সফল হত, সার্থক হত সকল পরিশ্রম। কিন্তু ভগবানের এমনি বিধান যে তাঁর এত পরিশ্রম এত আশা সবই আজ প্রায় নষ্ট হতে চলেছে। মনে আছে তার পরীক্ষার ফল বার হলে সে পাশ

করেছে জেনে কয়েক জন বন্ধু সুমুর মাকে খবর দিতে গিয়েছিল কিন্তু সেকথা শুনে তিনি নাকি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন।

কৃষ্ণা, জীবনের অনেকগুলো বছর কেটে গেল, অনেকটা পথ অতিক্রম করলাম। কিন্তু যতই চলেছি, বয়স যতই বাড়ছে দেখছি নিত্য নূতন রূপে এই পৃথিবীকে। অভিজ্ঞতার মিছিল ভিড় করে দাঁড়াচ্ছে আমার সামনে। নূতন নূতন অভিজ্ঞতার স্মৃতি দিয়ে পুরনোকে চেনা যায় না, বোঝা যায় না। চলার পথে যারা এসেছে দেখেছি তাঁরা একে অপরের থেকে কত ভিন্ন, কত স্বতন্ত্র। একজনকে অপরজন থেকে সহজেই আলাদা করে নেওয়া যায়, কিন্তু কাউকে অবহেলা করা যায় না। প্রত্যেকের আছে স্বতন্ত্র স্বত্বা।

বলতে বলতে সুখেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে, ভুলে যায় কৃষ্ণার উপস্থিতি। ভাবে কি বিচিত্র এই সংসার! মানুষ জন্মেছে লক্ষ্মীর আশীর্বাদ লয়ে, কিন্তু মাঝে মাঝে কেন মনে হয় বুঝিবা সে আশীর্বাদ মিথ্যা, শুধু সান্ত্বনা মাত্র। সে কি সত্যই সান্ত্বনা বাক্য? না মানুষ নিজেই সে আশীর্বাদ ভুলে নিজের দুঃখ সৃষ্টি করে? চিরন্তন সত্য উপেক্ষা করতে চায় বলেই পায় বেদনা, আশা ভঙ্গের তীব্র যন্ত্রনা? সুখেনের সামনে সমস্ত জগৎ যেন মুছে যায় শুধু সামনে বকুল গাছটি ছাড়া। আপন চিন্তায় বিভোর সুখেন শুধু সামনের দিকে চেয়ে থাকে। তার চোখের সামনে একটা নাম না জানা পাখী বারে বারে আসছে আর গাছের ডালে একটু বসে বা শুধু একটা চক্কর দিয়ে চলে যাচ্ছে। অনেকক্ষণ একদৃষ্টে সেদিকে তাকিয়ে থাকে সুখেন। হঠাৎ তার মনে হয় এই একটু আগেই সে যে প্রশ্নের উত্তর খুজঁছিল তা পেয়েছে এই পাখীর কাছে। নিজের মনেই সুখেন বলে উঠে—হ্যাঁ, পেয়েছি।

কৃষ্ণা এতক্ষণ ধরে সুখেনের ভাবান্তর লক্ষ্য করছিল। সুখেনের এই আকস্মিক কথায় একট বিস্মিত হয়ে বলে—কি সুখেনদা, কি পেয়েছ?

কৃষ্ণার কথায় সংজ্ঞা পায় সুখেন। সে যে এতক্ষণ তার কথা ভুলে নিজের চিন্তায় বিভোর হয়েছিল সে কথা ভেবে লজ্জা পায়। বলে—

কিছু মনে কোর না কৃষ্ণা, নিজের চিন্তায় একটু আনমনা হয়ে গিয়েছিলাম। দেখ এই পাখীটা বার বার একই জায়গায় ফিরে আসছে, যেন কিছুতেই তার মায়া ত্যাগ করে চলে যেতে পারছে না। কেন জানো ? ওখানে ওর বাসা ছিল, কেউ হয়ত সে বাসা ভেঙ্গে দিয়েছে বা এমনি হয়ত ভেঙ্গে গেছে। অবশ্য এসব আমার অনুমান মাত্র। ও বাসার স্মৃতি পাখীটা ভুলতে পারছে না, পুরানো স্মৃতির টানে সে বার বার গাছটার কাছে আসছে। হয়ত সে জানে এসে আর কোন লাভ নেই কিন্তু তবু থাকতে পারছে না। প্রীতির আকর্ষণ এমনি হয় কৃষ্ণা। জানে ব্যথা পাবে বেদনা পাবে কিন্তু তবু থাকতে পারে না, বার বার মনে পড়ে পুরানো কথা।

কৃষ্ণা বুঝতে পারে সুখেনের অভিব্যক্তি। বলে—কি লাভ তাতে। যে চলে গেছে তার স্মৃতি মনের মধ্যে বার বার টেনে এনে মন আর বিবেককে ভারাক্রান্ত করার কোন মানে হয় না। পুরানো স্মৃতি যদি শুধু বেদনা দেয়, শুধু বিবেককে বিক্ষুব্ধ করে তাহলে সে চিন্তায় সার্থকতা কি ? সাধ করে দুঃখ ভোগ করতে কেউ চায় না।

—বুঝি কৃষ্ণা, অকারণ দুঃখ ভোগে কোন মানে হয় না, কোন লাভ নেই তাতে। কিন্তু কি করব আমি, ভুলতে যে পারি না। কল্পনার স্মৃতি আমার জীবনের সঙ্গে মিশে আছে, কি করে তাকে আলাদা করে দেব বল ? চেষ্টা করেছি, অনেক বার ভুলে থাকতে চেয়েছি কিন্তু জিততে পারিনি। বরং ভুলতে গেলেই বার বার তার কথা মনে পড়ে আর নিজে ক্ষত-বিক্ষত হই। আমার শিশুমনে সে যে গভীর রেখা কেটে দিয়েছে তার দাগ এ জীবনে মিলিয়ে যাবে না। সন্ধ্যার স্তিমিত আলোকের মাঝে হঠাৎ একফালি চাঁদ এসে রচনা করে আলোর বন্যা আর কল্পনা আমার জীবনে তার স্মৃতি দিয়ে পুরানো দিনের মধুর জীবনকে মনে পড়িয়ে দেয়। চেষ্টা করেও ভুলতে পারি না তাকে।

কৃষ্ণা বুঝতে পারে সুখেনের অন্তর্দ্বন্দ্ব তাই চুপ করে থাকে। কিন্তু তার মনেও তর্কের ঝড় উঠে। ভাবে যা কোনদিন আর ফিরে আসবে না, আসতে পারে না কেন বার বার সেই অসম্ভবের দিকে সুখেন ছুটছে ?

একি সত্যি ভুলতে পারছে না বলে না মিথ্যা সেই স্মৃতি আঁকড়ে ধরে থাকবার তীব্র বাসনায় আর লোকের কাছে নিজের দুঃখ প্রচার করে সহানুভূতি লাভের প্রার্থনায় ? সুখেনদা তাকে কেন্দ্র করে নিজের জীবন গড়ে তুলতে চেয়েছিল কিন্তু তা না হওয়ায় কি এই দুঃখ ? না হলে পাতানো বোনের জন্য কে কবে এত হাহাকার করেছে ? নিশ্চয়ই সুখেনদা চেয়েছিল কল্পনাকে বিয়ে করতে কিন্তু সে চলে যাওয়ায় তা ব্যর্থ হয়েছে আর নিজের সে কামনা পরাজিত হয়েছে বলেই শুধু তার স্মৃতি আঁকড়ে ধরে থাকতে চায়। না হলে কই কল্পনা তো ভুলে গেছে সুখেনদাকে। এত বছরের মধ্যে একটা চিঠি দিয়েও তার খোঁজ নেয়নি। কল্পনা কি খবই সুন্দরী ? তার থেকেও সুন্দরী কল্পনা ? হয়ত তাই, না হলে সুখেনদা কেন তাকে এড়িয়ে চলতে চায় ? কেন সে পারল না কল্পনার স্মৃতি সুখেনের মন থেকে মুছে দিতে ? অপমানিত, পরাজয়ের তীব্র যন্ত্রণায় কৃষ্ণার সমস্ত শরীর উত্তেজিত হয়ে উঠল, মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল না কিছুতেই কল্পনার কাছে হার মানবে না, তাকে আরও দৃঢ় ভাবে বাঁধতে হবে যাতে কল্পনার সাধ্য না থাকে সুখেনকে তার কাছ থেকে কোনদিন ছিনিয়ে নেয়। জয়ী তাকে হতেই হবে, সে পারবে না সুখেন কে ছেড়ে দিতে। ঈর্ষার আগুনে কৃষ্ণার সমস্ত দেহমনে জ্বালা ধরে গেল। সে ভুলিয়ে দেবে কল্পনার কথা, যেমন করেই হোক্ কল্পনার কথা আব ভাবতে দেবে না সুখেনকে। তার সমস্ত কিছু দিয়ে সুখেনের মনজয় করে নেবে, কোন স্থান থাকতে দেবে না কল্পনার জন্য। উত্তেজনায় অস্থির হয়ে হয়ত কিছু বলে বসত কিন্তু সুখেনের দিকে তাকাতেই তার সমস্ত উত্তেজনা শান্ত হয়ে গেল। সুখেনের সরল সুন্দর মুখে নেই কোন কুটিলতার ছাপ, তাব মুখ বেদনাক্ত কিন্তু কমনীয়। কৃষ্ণা লজ্জা পায় তার এই কুৎসিত চিন্তায়। ভেবে দেখে সত্যিই যদি সুখেন কল্পনাকে অন্য কোন ভাবে চিন্তা কবে থাকত তা হলে কৃষ্ণার কাছে কল্পনার কথা বলতো না। কল্পনাকে সুখেন সত্যিই নিজের বোন মনে করে ভালবাসে, তোর সে ভালবাসা কামনার পঙ্কিলতায় কদর্য নয়, তার ভালবাসা নির্মল।

সেখানে কোন মলিনতার স্থান নেই। নিজের কুৎসিত চিন্তায়, কামের জ্বালার বহিঃপ্রকাশে কৃষ্ণা নিজেই সংকুচিত হয়, নিজেকে ধিক্কায় দেয়। ঈর্ষা যে কত কদর্য কত নগ্ন তার পরিচয়ে কৃষ্ণা নিজেকে খুব ছোট মনে করে। আত্মগ্লানিতে সে চোখ নত করে নেয়, বলতে পারে না কোন কথা।

অনেকক্ষণ পরে নিজেকে তিক্ত কঠোর সমালোচনায় শাসন করে কিছুটা প্রকৃতিস্থ হয় কৃষ্ণা। সুখেন তখনও কি যেন চিন্তায় বিভোর। সুখেনের বেদনাক্ত মুখ দেখে কৃষ্ণা বোঝে তার ব্যথা তাই সান্ত্বনা না দিয়ে বরং তাকে তার চিন্তা থেকে অন্য দিকে মন আকর্ষণ করতে কৃষ্ণা বলে—দেখ সুখেনদা কি সুন্দর! কৃষ্ণচূড়ার গাছে লাল লাল ফুলগুলো যেন দিনের শেষ সূর্য্যের সাথে মিতালি পাতিয়েছে। দুজনেই একই রংয়ে নিজেদের রাঙিয়েছে যেন দুই সখী একই রঙের শাড়ী পরেছে তাদের অভিন্নতা একে অপরের কাছে প্রকাশ করতে।

সুখেন বলে—সুন্দর বলেছ কৃষ্ণা। খুব ভাল লাগছে আমার এ দৃশ্য। সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর সূর্যদেব যেন চলেছেন বিশ্রাম নিতে আর দেখ তার সাথে সাথে অন্য সকলেও যেন কাজ ছেড়ে বিশ্রাম নিতে চলেছে। সূর্য্য যেন কাজের প্রতীক, তিনি থাকাকালীন কেউ নিতে পাবে না বিশ্রাম, সকলকেই কাজ করতে হবে।

—তোমার পরীক্ষার তো আর দেরী নেই সুখেনদা, পরীক্ষার পর কি করবে ঠিক করেছ?

—দেখ কৃষ্ণা, ভেবেছিলাম ওকালতিটা খুব ভাল, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে সেখানে সব থেকে বেশী ব্যভিচার। যে যত বেশী সুন্দর করে সাজিয়ে গুছিয়ে মিথ্যা বলতে পারবে জয় তারই। দোষী জেনেও মিথ্যা কথায় তাকে নির্দ্দোষী প্রমাণ করতে হবে, খুনীর সাফাই গেয়ে তাকে মুক্ত করতে হবে, আর একজন নিরপরাধ সরল লোক প্রমাণিত হবে অপরাধী হিসাবে। চমৎকার আইন, আর চমৎকার বিচার! যত বেশী অপরাধীকে নির্দ্দোষী বলে প্রমাণিত করতে পারব তত বেশী হবে নাম ডাক, প্রতিষ্ঠালাভ। এ যেন মিথ্যার কাছে বুদ্ধির সততার পরাজয়।

অর্থের লোভে একটা জঘন্য খুনী আসামীর হয়েও সাফাই গায়তে হবে, অসামাজিক লোকের সহায়তা করতে হবে। যে যত বেশী অপরাধীকে বাক্ চাতুরীর সাহায্যে নিরপরাধ প্রমাণ করতে পারবেন, আইনকে ভেঙ্গে-চুরে নতুন ব্যাথায় মুখর হয়ে অপরাধীকে শাস্তির হাত থেকে রক্ষা করতে পারবেন তিনিই মোটা টাকা ফী পাবেন, দামী পোষাকে, গাড়ীতে নিজের অহংকার প্রকাশ করবেন। ভাবতেও আশ্চর্য্য লাগে টাকার লোভে নিজের মনুষ্যত্ব কেমন করে লোকে বিক্রী করতে পারে! এ যেন মিথ্যার বেসাতি সাজিয়ে খদ্দের ডেকে বলা এস আমাব পণ্য কিনে নাও, দেখ আমার মিথ্যা খাঁটি নির্ভেজাল!

—কিন্তু সকলেই কি তাই? সৎলোক কি কেউ নেই? আর তাছাড়া মেসোমশাই তাঁর জায়গায় তোমায় বসিয়ে নিজে অবসর নিতে চান। এখন তুমি আপত্তি করলে তিনি খুব ব্যথা পাবেন।

—তোমার কথা অস্বীকার করছি না, কিন্তু উপায় নেই। যাকে মন থেকে গ্রহণ করতে পাবব না তা করতে আমি রাজী নই কোন মতেই। বাবা আঘাত হয়ত একটু পাবেন কিন্তু তাঁকে বুঝিয়ে বললে আমার বিশ্বাস তিনি অমত কববেন না। তা ছাড়া আমি কিছুটা এ লাইনেই থাকব, সুতরাং আশাকরি নিশ্চয়ই তিনি আমার পথে সহায়ক হবেন। আমি বিচারক হতে চাই। অবশ্য ব্যারিষ্টারী পাশ করতে চাই আমি তারপর প্র্যাকটিস না করে বিচারক হব।

কৃষ্ণা বলে—আচ্ছা তুমি পাববে অপরাধীকে বিনা দ্বিধায় শাস্তি দিতে? শাস্তি দিতে তোমার প্রাণ কাঁদবে না?

—না, প্রাণ কাঁদবে কেন? অপরাধী যদি বিনা দ্বিধায় অপরাধ করতে পারে তাহলে আমি কেন পারব না তাকে কঠিন শাস্তি দিতে? অন্যায় করবে আর তার শাস্তি পাবে না?

কৃষ্ণা একটু হেসে বলে—আচ্ছা ধর, আমি যদি অন্যায় করি। পারবে আমাকে শাস্তি দিতে?

সুখেন চমকে উঠে কৃষ্ণার কথায়, কিন্তু পরক্ষণেই কঠিন স্বরে বলে—নিশ্চয়ই. নিশ্চয়ই পারব। বিচার অন্যায়ের বিরুদ্ধে, কোন ব্যক্তি

বিশেষের জন্য নয়। বিচারক সকলের কাছে সমান, তার কাছে শুধু প্রভেদ দোষী আর নির্দ্দোষীর। সুতরাং বিচার করব তোমার অপরাধের, তোমার নয়। অন্য সকলকে যে শাস্তি দিতাম তোমাকেও তাই দেব। বিচারকের আসনে প্রীতির স্থান নেই, মমতার স্থান নেই, নেই কোন করুণা বা কৃপার স্থান। কঠোর কঠিন নির্মম হৃদয়ে শাস্তি দিতে হবে সব অপরাধীকে, রক্ষা করতে হবে নিরপরাধকে, দমন করতে হবে দুর্বিনতকে, স্বচ্ছ পবিত্র করতে হবে সমাজ জীবনকে। সুতরাং সত্য-রক্ষায় তোমাকে শাস্তি দিতে হলেও উপায় নেই, মেনে নিতে হবে তাকে।

কৃষ্ণা একটু আহত হল সুখেনের কথায়, কিন্তু আহত হলেও সুখেনের দৃপ্ত কথায় মনের একটা দিক আনন্দে ভরে গেল। অন্তরের গভীর প্রীতিতে তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সুখেনের সততা, তার নির্ভিক কঠিন মনের পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হয় কৃষ্ণা। কোমল মুখের পরে সংযমের আর আত্মবিশ্বাসের ছাপ দেখে বিশ্বাস হয় সুখেনের নিষ্ঠায়, তার নারীমন শ্রদ্ধায় ভক্তিতে প্রণাম জানাল সুখেনের পায়ে। গোধূলী লগ্নের আবীর মাখা সূর্য্যের ছোঁয়া লাগে তার মনে।

সুখেন বলে—চল কৃষ্ণা, বাড়ী যাওয়া যাক্। আজ খুব আনন্দ পেলাম এখানে কংক্রীট্ সভ্যতার ছায়া না দেখে। আজকাল বাড়ীর সাথে সাথে মানুষগুলো পর্য্যন্ত কংক্রীট্ জমানো হয়ে গেছে। হৃদয় বলে কোন কিছু তারা মানতে চায়না। অনেকে শেষ পর্য্যন্ত পারে না হেরে যায় কিন্তু তবু স্বীকার করে না হৃদয়ের দাবী। যেন সে দাবী অবান্তর, অবাঞ্ছিত। মুখোশ পরা ভদ্রতা আর সৌখিন আভিজাত্য—তাদের মানুষ রাখেনি। দম্ভ আর বিলাস তাদের স্বাভাবিক সত্বাকে দূরে ঠেলে দিয়েছে, তাই তারা অশান্ত। আকাঙ্খার শেষ নেই তাদের, বাহ্যিক অভাব না থাকলেও তারা সেই কাল্পনিক অভাবের তাড়নায় শুধু দৌড়ে বেড়াচ্ছে আর সে প্রতিযোগিতায় সফল না হলেই তলিয়ে যাচ্ছে সমাজের গভীর অন্ধকার গহ্বরে। কিন্তু তবু নেশাগ্রস্তের মত প্রতি-যোগিতায় নাম দিচ্ছে। কি আশ্চর্য্যই না এদের জীবন!

॥ ১০ ॥

দীনেশবাবু ভাবছিলেন সুখেনকে বিলাত পাঠাবেন ব্যারিস্টারী পড়তে। ভিতরে ভিতরে সব ঠিক করেই রেখেছেন, শুধু রেজাল্ট বার হলেই হয়। ইচ্ছা বিলাত পাঠাবার আগে কৃষ্ণার সাথে বিয়েটা দিয়ে দেবেন। তাহলে সুখেন চলে গেলেও তাঁর খুব একটা কষ্ট হবে না। একলা থাকতে খুব ভয় দীনেশবাবুর, একলা থাকবার কথা ভাবলেই ভীষণ অস্থির হয়ে উঠেন তিনি। মনে মনে অভিযোগ করেন মৃতা স্ত্রীর উদ্দেশ্যে। আজ তিনি বেঁচে থাকলে তাঁকে এতসব ভাবতে হত না, উদ্‌ভ্রান্ত হতে হত না কোন কিছুতেই। অথচ সব ভার তাঁর উপর চাপিয়ে দিয়ে তিনি নিজে চলে গেলেন দূরে, দায়িত্ব দিলেন প্রচুর কিন্তু করলেন না সহায়তা। মাঝে মাঝে ভাবেন বিলাতে পাঠাবেন না সুখেনকে, সে যখন বিচারক হতে চায় তখন এখনই রেজাল্ট বার হলেই ঢুকে পড়ুক চাকরীতে। কিন্তু ছেলের ইচ্ছাকে বাধা দিতে বিবেক নিষেধ করে, একমাত্র ছেলের বড় হবার পথে তিনি কেমন করে বাধা হয়ে দাঁড়াবেন? না হলে প্রথম যখন সুখেন তাঁকে প্র্যাকটিশ্ করবে না বলেছিল তখন তিনি রাগ করেছিলেন। বলেছিলেন—তাহলে আর ব্যারিস্টার হবার দরকার নেই বরং এখন থেকেই কমপিটেটিভ্ এগজামিন দিয়ে কাজে লেগে যাও। আর যদি আমার কথা শোন তাহলে বিলাতে যাও। ভালকরে পাশ করে এসে এখানে প্র্যাকটিশ আরম্ভ কর। আমার মক্কেল ছাড়া আরও অনেক মক্কেল পাবে, দুদিনেই বড় হতে পারবে।

উত্তরে সুখেন বলেছিল—প্র্যাকটিশ না করলে কি ব্যারিষ্টার হতে

নেই, বিচারক হতে হলেও তো জ্ঞান দরকার। বাবা আমি মনে করি জীবনে বড় হওয়া মানে প্রচুর ব্যাঙ্ক ব্যালান্স্ দামীগাড়ী আর প্রাসাদসম বিরাট অট্টালিকা নয়, বড় হওয়া মানে আদর্শবান হওয়া। আর আদর্শ জিনিষটা মূলতঃ এক হলেও তার বিভিন্ন রূপ আছে, সুতরাং একজনের আদর্শ অপরের কাছে বাতুলতা মনে হতে পারে কিন্তু অন্তরের বিশ্বাস কাউকে জোর করে ঘুচিয়ে দেওয়া যায় না। তাই আমি যা আদর্শ বলে গ্রহণ করেছি তা থেকে জোর করে আমাকে অন্যপথে কেউ আনতে পারবে না। আমাকে বাধা দেবেন না আপনি, দেখবেন সৎ, ন্যায়নিষ্ঠ বিচারক হিসাবে একদিন আমি সমাজে স্থান করে নেবই। আপনার আশীর্বাদ পেলে সে পথে আমি সহজেই চলতে পারব।

সুখেনের একান্ত ইচ্ছার কাছে দীনেশবাবু পবাস্ত হন। বোঝেন একে বাধা দেওয়াও বৃথা তাই নিজের ইচ্ছাকে দমন করবেন তিনি। মনে মনে আহত হন কিন্তু পুত্রের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন ভেঙ্গে দিতে চান না। কিন্তু তিনি নিজেও একজন উকিল, তাঁকেও কি সুখেন তাঁর কাজের জন্য মনে মনে ঘৃণা করে? পিতা হয়ে পুত্রের ঘৃণা সহ্য করা কত বড় মর্মান্তিক! কত বড় লজ্জার! কিন্তু সুখেন পিতাকে অবমাননা করতে, অগ্রাহ্য করতে তো শেখেনি? তবে কি সুখেন শুধু তাঁর পেশাকে ঘৃণা করে, তাঁকে নয়? এ নিয়ে সুখেনকে কিছু জিজ্ঞাসা করা যায় না, কিন্তু মনের মধ্যে একটা অস্বস্তি অনুভব করেন। ডাক্তারবাবুকে জিজ্ঞাসা করা যায়, কৃষ্ণাকেও জিজ্ঞাসা করতে পারেন তিনি, কিন্তু সে ইচ্ছা হয় না। পুত্রেব কাছে নিজের পরাভব অপরের কাছে স্বীকার করা যায় না। তা ছাড়া আব ক'দিনই বা তিনি আছেন? কৃষ্ণার সংগে সুখেনের বিয়েটা হয়ে গেলেই কোন তীর্থস্থানে চলে যাবেন জীবনের বাকী দিনগুলো কাটাতে। সে প্ল্যানও ডাক্তারবাবুর সংগে হয়ে আছে। ডাক্তারের সংগে তাঁর জীবনের একটা অদ্ভুত মিল আছে। দুজনেই ভাগ্যের বলি, তবু দুজনেই সে পরাজয় অস্বীকার করেছেন।

সুখেনের সাথে বিয়ে দেবার ইচ্ছায় অনেকেই তাঁদের মেয়ের জন্য চেষ্টা করেছেন, অনেক প্রখ্যাত ধনী, অনেক অন্তরঙ্গ বন্ধু। কিন্তু দীনেশবাবু রাজী হন নাই তাঁদের কথায়। পণ প্রথার তিনি বাস্তবিক বিরোধী, সুতরাং ধনী পিতার নগদ টাকা যৌতুক তা'ছাড়া স্বর্ণলংকার, গাড়ী-বাড়ী সব প্রলোভনই তিনি এককথায় ফিরিয়ে দিয়েছেন—আমি ছেলে বিক্রী করব না,—এই বলে। মুস্কিল হয়েছিল তাঁর বন্ধুদের বেলায়। তাঁরা চেপে ধরেছিল তাঁকে। এমন কি পুত্রবধূ ঠিক করা আছে বলেও রেহাই পাননি তিনি। তাঁরা নমিতাদেবীর নাম করে বলেছেন উনি তাঁর মেয়ের সংগে সুখেনের বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। তখন একটু অসহায় হয়েছিলেন, কিন্তু মত দেননি। কৃষ্ণাকে তিনি দেখেছেন, চিনেছেন। তার ব্যবহারে তিনি আনন্দিত হয়েছেন। ছোট্ট এই মেয়ের কর্ম নিষ্ঠা আর সেবা যত্ন তাঁকে মুগ্ধ করেছে। তাছাড়া সুখেনও তাকে জেনেছে। সুতরাং কৃষ্ণাকে বাদ দিয়ে আর-কাউকে পুত্রবধূরূপে কল্পনা করতেও তিনি পারেন না। কৃষ্ণা তাঁকে জয় করে নিয়েছে সম্পূর্ণভাবে। মায়ের মত স্নেহ আর মেয়ের মত মমতা, একাধারে কল্যাণময়ী ও সেবিকারূপে কৃষ্ণা তাঁর আপনজন হয়ে গেছে। তাঁর সংসারের সব কিছু চলে কৃষ্ণার নির্দ্দেশে—তার আন্তরিকতায় নেই কোথাও সামান্যমাত্র বিশৃংখলা। তাই শত প্রলোভন, বিভিন্ন অনুরোধ তিনি ত্যাগ করে কৃষ্ণাকেই তাঁর পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করতে স্বীকৃত।

বিচিত্র এই জগতের ততোধিক বিচিত্র রূপরেখা দীনেশবাবু লক্ষ্য করেছেন। দেখেছেন সামান্য স্বার্থের জন্য সকলেই উদগ্রীব, নিজের উদ্দেশ্য সফল করতে যে কোন ছলনা পর্যন্ত অবলম্বন করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেনা তারা। কিন্তু এসব বিন্দুমাত্র আঁচড় কাটে না তাঁর মনে। কাল নিরবধি ভেসে চলেছে সময়ের রথে। এই সময়ের মাঝে কত মানুষ আসছে এই পৃথিবীর সুন্দর প্রাঙ্গণে—কেউ আনন্দ করছে, কেউ দুঃখে কাতর। কিন্তু কোন কিছুই স্থায়ী নয়। পৃথিবীর রঙ্গালয়ে মানুষের অভিযান বিচিত্র। সেই বিচিত্র

অভিযানের মাঝে প্রত্যেকের অভিনয়ে আছে স্বতন্ত্র স্বত্বা। রূপ ও অরূপে বিভেদ বৈষম্য আছে। আলোর পাশে যেমন অন্ধকারের সমাবেশ তেমনি সমাজের মাঝে দুঃখ-আনন্দের প্রত্যাহিক অবিচ্ছিন্ন গতি আছে। এ গতি চিরন্তন যুগ হতে যুগান্তরের পথে চলেছে এই রূপরেখার সমাবেশে। দীনেশবাবু প্রেরণা পেয়েছেন ডাক্তারের জীবন-যাত্রার স্বরূপ দেখে। মাঝে মাঝে অবাক হয়ে ভাবেন কেমন করে ডাক্তার এখনও সমাজে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছেন, কেমন সহজ ভাবে দুঃখকে বরণ করে নিয়েছেন। সুখেনকে দেখেছেন এই সহজ ভাবটি সেও আয়ত্ব করতে ব্যগ্র। দুঃখকে তিনিও ভয় করেন না, কিন্তু পুত্রের কাছে নিজের নীতির, নিজের জীবনযাত্রা যাপনের উপায়কে হেয় বলে ভাবতে কষ্ট হয়—সে পরাজয়ে আছে শুধুমাত্র আত্মগ্লানি। তিনি নিজে জানেন পয়সা রোজগার করতে গিয়ে অনেক সময় ন্যায়কে অন্যায় বলতে হয়েছে, হয়ত সত্যিকারের দোষীকে মুক্ত করে বিনা অপরাধে নিরপরাধকে সাজা দিতে বাধ্য করেছেন, হয়ত বিধবার সামান্য বাস্তুটুকু পর্যন্ত অন্যায় প্রলোভনের কাছে হার স্বীকার করেছে তাঁরই সচেষ্ট বুদ্ধির কৌশলে। কিন্তু তবু তিনি জানেন সাধারণভাবে অন্যায়ের পক্ষ তিনি সমর্থন করতে চাননি। পুরানো দিনের অভাবের সংসারে যে কাজ তিনি করেছেন মানুষ হিসাবে তিনি তাতে তৃপ্ত হতে পারেন নি। শুধু পয়সা রোজগারের তীব্র নেশায় মাঝে মাঝে অন্যায়কে সমর্থন করতে বাধ্য হয়েছেন। কি আশ্চর্য মোহ এই পয়সার! এই মোহের গতি দুর্বার—কোন কিছুতেই মেটে না পয়সার পিপাসা। লক্ষপতি চায় কোটিপতি হতে, সাধারণ মানুষ চায় দু'মুঠো ভালমন্দ খেয়ে-পরে বেঁচে থাকতে। তাই কেউ নয় তৃপ্ত। ছোট থেকে বড় সকলেই ভাবে কি ভাবে আরো বেশী টাকা রোজগার করা যায়—কি করে জীবনধারণের মাপকাঠি আরো উন্নত করা যায়। কিন্তু সে আশা পূর্ণ হওয়া মাত্র আরো উন্নত হবার আকাঙ্খায় পাগল হয়ে উঠে। শেষে কেউ পায় না শান্তি—যা সত্যিই দুর্মূল্য।

দীনেশবাবু জীবনের সায়াহ্নে বিচার করতে বসেছেন নিজেকে,

সমস্ত বিশ্বজগতকে। তাঁর ফেলে আসা দিনের কোনটা হয়ত আনন্দের আবার কোনটা মর্মান্তিক। নিজের জীবনের সাথে মিলিয়ে দেখছেন জগতের আর সকলকে। আসামীর কাঠ-গড়ায় নিজেকে দাঁড় করিয়ে বিবেককে দিয়েছেন বিচারের ভার। মন কাজ করছে জুরীর। স্মৃতির রোমন্থনে নিজেকে যাচাই করতে চান সংকল্প ও সততার কষ্টিপাথরে। আজও বসে বসে দীনেশবাবু অতীত দিনের চাওয়া-পাওয়ার হিসাব নিকাশ করছিলেন, সুখেন গেছে তার এক বন্ধুর সংগে দেখা করতে এমন সময় কৃষ্ণা ঘরে প্রবেশ করল। দীনেশবাবুকে একলা বসে ভাবতে দেখলে রাগ করে কৃষ্ণা। দীনেশবাবুও তার রাগের কথা জানেন আর তাই কৃষ্ণাকে ঘরে ঢুকতে দেখলেই সাবধান হয়ে যান। তার কড়া শাসন মেনে নিতে বাধ্য হন। আজ খুব বেশী চিন্তিত ছিলেন তাই কৃষ্ণার আগমন টের পাননি। ঘরে ঢুকে কৃষ্ণা দীনেশবাবুকে চুপ করে বসে থাকতে দেখেই প্রশ্নটা একটু চুপ করে থাকল তারপর বেশ রাগত হয়েই দীনেশবাবুকে বলল—মেসোমশাই ফের আজেবাজে চিন্তা করছেন? কতদিন বারণ করেছি না? এত কি যে ভাবেন বুঝি না? আর আমার কথা যদি না শুনতে চান তাহলে অবশ্য আর আমি কোনদিন কিছু বলব না, কিন্তু যদি আমাকে সত্যিই নিজের মেয়ের মত ভালবাসেন তাহলে আমার কথা আপনাকে শুনতেই হবে।

দীনেশবাবু অপ্রস্তুতস্বরে বললেন—না মা, কিছু ভাবিনি। চুপ করে বসেছিলাম তাই........

—তাই যতসব বাজে ভাবনা ভাবতে হবে বুঝি?

দীনেশবাবু আরো কুণ্ঠিত হয়ে বললেন—না, না, আজে বাজে নয়। এই ভাবছিলাম সুখেন তো এবার বিলাত যাবে, তখন আমি কি করে একা একা........

কথা শেষ করতে দিল না কৃষ্ণা। বেশ একটু ঝাঁঝের সঙ্গে বলল—আবার ওই সব কথা? সুখেনদা গেলেও আমরা তো থাকব, না আমরাও ওই সঙ্গে চলে যাচ্ছি? তবে আমার সেবা যদি আপনার

পছন্দ না হয় তাহলে অন্য কথা। তাই যদি হয় তবে বলে ফেলুন আমি আজই বাবাকে নিয়ে অন্য কোথাও চলে যাচ্ছি।

দীনেশবাবু অধীর হয়ে বলেন—আমি কি তাই বলছি, না বলতে পারি ? তুমি আমার কতখানি তা তুমি তো জান কৃষ্ণা। শুধু শুধু আমার উপর রাগ কোর না। তুমি আছ বলেই সুখেনকে পাঠাতে পারছি। তবে বুঝতে পারছ সুখেন আমার কতখানি, সেই সুখেনকে দূরে পাঠাতে মন একটু অস্থির তো হবেই মা। জান মা আজ যদি তিনি থাকতেন তাহলে আমাকে এতসব কিছুই ভাবতে হত না। সব ভার আমার উপর দিয়ে নিজে চলে গেলেন আর আমি শুধু এই সুখেনের মুখ চেয়ে সে ভার বহন করছি। তুমি আসায় আমি অনেকটা নিশ্চিন্ত।

কৃষ্ণা নিজের প্রসঙ্গে কোনকথা উঠলেই চঞ্চল হয়ে পড়ে, তাড়াতাড়ি সে প্রসঙ্গ বন্ধ করে দেয়। তাই তাড়াতাড়ি বলে উঠল—তবে আপনি শুধু শুধু চিন্তা করে শরীর খারাপ করছেন কেন ? ওসব আপনি ভাবতে পাবেন না, এই আমার আইন জারী হল। এবার ভাবতে দেখলেই আমি অন্য কোথাও চলে যাব।

কৃষ্ণার কথায় হেসে ফেলেন দীনেশবাবু। বলেন—না, আর ভাবব না। আর আমার পাগলী মা যেন রাগ করেও চলে যেতে না পারে তার ব্যবস্থা করছি। এমন ভাবে বেঁধে রাখব যে রাগ হলেও এখানে থাকতে হবে।

দীনেশবাবুর কথা শুনে লজ্জায় লাল হয়ে উঠল কৃষ্ণা। তাঁর কথার আসল মানে বুঝে কৃষ্ণা ছুটে ঘর থেকে চলে গেল আর তার চলে যাওয়া দেখে দীনেশবাবু হো হো করে হেসে উঠলেন।

নিজেকে একটু সামলে নিয়ে কৃষ্ণা আবার যখন এ ঘরে এল দেখল সুখেনের সঙ্গে দীনেশবাবু কথা বলছেন। সুখেনকে দেখে সে আর ঘরে ঢুকল না ফিরে চলে গেল। একটু পরে সুখেনের ঘরে গিয়ে গোছাতে লাগল। এই সময় মধ্যে নিজেকে সামান্য একটু প্রসাধনে আর হাল্কা নীল রংয়ের শাড়ীতে চমৎকার সাজিয়ে নিয়েছে। সুখেন ঘরে এসেই

কৃষ্ণার এই বিশেষ সাজ দেখে একটু অবাক হয়েই বলে উঠে—কি ব্যাপার কৃষ্ণা, হঠাৎ এত সাজ কেন ?

সুখেনের মুখে এ কথা শুনে কৃষ্ণার কান পর্যন্ত লাল হয়ে যায়। তার মনে হয় সে বোধ হয় ধরা পড়ে গেছে। সুখেন বোধ হয় বুঝতে পেরেছে তার মনের কথা না হলে সুখেন তো কোনদিন এমনি ভাবে কথা বলে না ? সে নিজেই আগে কতদিন সুন্দর করে সেজেছে, দেখাতে চেয়েছে সুখেনকে তার রূপ, তার যৌবন। কিন্তু সুখেন সে সব বুঝতেই পারে নি। সুখেনের নিস্পৃহ ভাব দেখে তার রাগ হত, জিদ বেড়ে যেত। নিজেকে আরও অপরূপ করে সাজিয়ে সুখেনের কাছে ঘোরা ফেরা করেছে, কিন্তু সুখেন ভুলেও তার দিকে তাকিয়ে তার এই সাধনাকে জয়ী করত না। কৃষ্ণা সত্যিই সুন্দরী, কলেজ জীবনে অনেকে তার রূপে আকৃষ্ট হতে চেয়েছে অনেক বান্ধবী তাকে ঈর্ষার দৃষ্টিতে দেখেছে, অনেকে মুগ্ধ চোখে তার রূপের:প্রতি তাদের অন্তরের শ্রদ্ধা জানিয়েছে। আর তাই সেই সব বান্ধবীদের চাটুবাক্যে, তাদের তৃপ্তির ভাব চোখে মুখে প্রতিবিম্বিত হতে দেখে তার মনে কখন একটু অহংকারের ভাব এসেছিল। সে যে সুন্দরী এবং সকলেই তা স্বীকার করে একথা কৃষ্ণা জানত বলেই নিজের সম্বন্ধে একটু অহংকার ছিল। কিন্তু তার সেই ধারণা বদলাল সুখেনের আচরণে। অনেক করেও সে সুখেনকে এদিকে আকর্ষণ করতে পারেনি। তখনই সে প্রথম ঈর্ষা করতে আরম্ভ করল কল্পনাকে। তাকে সে দেখেনি কিন্তু তার ধারণা হয়েছিল সুখেনকে সে যখন কোনদিন সামান্য মাত্র আকর্ষণ করতে পারল না তখন সে নিজে নিশ্চয়ই কল্পনার মত সুন্দরী নয়। কল্পনার রূপ সুখেন দেখেছে বলেই হয়ত কৃষ্ণাকে সে সুন্দরী ভাবে না। নিজের এই পরাজয় সহজে মানতে চায় নি কৃষ্ণা। প্রায়ই সুখেনের কাছে এসে বলেছে—'দেখ তো সুখেনদা, কোন শাড়ীটা আমাকে মানাবে।' সুখেন তখন হয়ত বলেছে —'যেটা খুশী পর, সবগুলিই তোমাকে মানাবে।' কিন্তু কৃষ্ণা মনে মনে ভেবেছে এ সুখেনের এড়িয়ে যাওয়া কথা।

আসলে সুখেন এ সব তেমন বুঝতে পারত না, আর বেশী সাজ

গোছ সে তেমন পছন্দও করে না। তাই এ বিষয়ে একটু নিস্পৃহ থাকত সুখেন অথচ কৃষ্ণা সে কথা না বুঝে নিজের উপরেই রাগ করত। শেষে অনেক ক্ষোভে দুঃখে কৃষ্ণা সাজগোছ করা একরকম ছেড়েই দিয়েছে। তাই আজ হঠাৎ সুখেনের মুখে এ কথা শুনে কৃষ্ণা লজ্জায় আনন্দে চঞ্চল হয়ে উঠল। মনে হল আজ তাব প্রচেষ্টা সার্থক, আনন্দেব শিহরণে কৃষ্ণার সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হল। অথচ আজ বেশী কিছু সাজেনি সে। সুখেনের প্রশ্নে তাব মুখের দিকে তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিল। সুখেন তার অপ্রস্তুতের ভাব লক্ষ্য করে নিজে লজ্জিত হল। বলল—কিছু মনে কোর না কৃষ্ণা, আজ সত্যিই তোমাকে খুব সুন্দর মনে হচ্ছে তাই বলে ফেললাম। কিন্তু ব্যাপার কি শুনি?

কৃষ্ণা বলে—এমনি ইচ্ছা হোল তাই। কেন সাজতে নেই বুঝি? সুখেন কৃষ্ণার প্রশ্নে একটু বিব্রত হয়ে বলে—না, না, তা বলছি না তবে বেশী সাজগোছ আমার তেমন ভাল লাগে না। কিন্তু আজ তোমাকে সত্য বার বার দেখতে ইচ্ছা করছে।

কৃষ্ণা কপট রাগ করে বলে—ফের? ও কথা আর বললে আমি কিন্তু চলে যাব।

সুখেন বলে—না, তোমাকে যেতে হবে না। তুমি বরং আমাব জন্য এক কাপ চা করে নিয়ে এস, আজ কিছুটা আড্ডা দেওয়া যাক্।

কৃষ্ণা চলে যাবার পর সুখেন বারান্দায় একটা চেয়ারে বসে পড়ে। আজ তার মন খুশীতে পূর্ণ। একটু আগেই পুরানো এক বন্ধুর সঙ্গে হটাৎ দেখা রাস্তায়, আর তার সাথে নানা গল্পে মন বেশ হাল্কা মনে হচ্ছে। আড্ডার আমেজ এখনও যায়নি তাই আর একটু আড্ডা দেবার ইচ্ছা। কৃষ্ণা আসবার আগে সে চুপ করে সেদিনের আনন্দ মুহূর্ত্তগুলি স্মরণ করবার চেষ্টা করে। মন চলেছে তার গতি নিয়ে। কখনও আবেগের বন্যায় দুর্বার, কখনও বা কোন অবাস্তর প্রহেলিকাব সীমা অতিক্রমের প্রয়াসে ব্যর্থ হয়ে। এই চিরন্তন গতির মুহূর্ত্তে দিক্ হারিয়ে কি করবে সেই ভাবান্তরের আবর্তে একবার খোঁজে তার পথেব নিশানা আবার পরের মুহূর্ত্তে দৃষ্টি ভঙ্গীর এক অপূর্ব আলোড়নে মনে হয়

সব কিছু পূর্ণ। কাল চলেছে দুর্বার গতিতে আপন ছন্দে নিজের গতিপথে। মানুষের দুঃখ-সুখে তার গতি স্তব্ধ হয় না, হয় না কোন ছন্দপতন। গতিপথে নেই মানুষের চঞ্চল বা আবেগময় মুহূর্ত্তের কোন পর্যালোচনা। বন্যার জল যেমন তীব্রবেগে একদিকে উৎসারিত তেমনি এ জগতে কত বৈচিত্রের রূপরেখা সীমিত জীবনের ছায়ায় মূর্ত। যেখানে আশা-আকাঙ্খার মাঝে আনন্দের সীমারেখা সেখানে আবেগের মূর্চ্ছণা প্রকাশ পায়—যা চলেছে যুগ হতে যুগান্তরের রেখায়। সুখেন অনেক দিন পর পুরানো বন্ধুর দেখা পেয়ে, তার সঙ্গে নানা আলোচনা করে তৃপ্ত, সেই তৃপ্তমনই সন্ধান দিয়েছে কৃষ্ণার লাবণ্যর। সুখেনের চোখে কৃষ্ণা দেখা দিয়েছে অন্যরূপে, তাই তার সঙ্গে একটু গল্প করে তার সান্নিধ্য কামনা করছে সুখেন। নিজের কামনার রূপ ধরা পড়ে না তার কাছে। জীবনের মধ্যে এমন অনেক মুহূর্ত সকলের জীবনেই আসে যা অনেকটা অব্যক্ত, অনেকটা আলো আঁধারী। মনের অনুভূতি ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না, হয়ত এর কিছুটা নিজেও বুঝতে পারে না।

কৃষ্ণা চায়ের পেয়ালা হাতে সুখেনের কাছে এসে বলে—আজ যে বড় খুশী-খুশী মনে হচ্ছে, কি ব্যাপার ?

সুখেন চায়ের পেয়ালাটা নিয়ে বলে—আঃ, বাঁচালে। অনেকক্ষণ ধরে চা খাব মনে করছি। একটু বস চা-টা খেয়ে তারপর বলছি। পেয়ালাটা শেষ করে বলে—ব্যাপার কি জান ? আজ অনেকদিন পর দেখা হল এক পুরানো বন্ধুর সঙ্গে। জানতো পুরানো বন্ধু আর পুরানো জুতো দুইই সকলের আনন্দ দেয়। অবশ্য উপমাটায় তুমি আপত্তি করতে পার, আর পুরানো জুতো সকলের আনন্দ দেবে কি করে প্রশ্ন করতে পার। তবে আমি বলি কি পুরোনো জুতো মানে কিছুটা ব্যবহার করা একেবারে ছেঁড়া, তালিমারা নয়। নূতন জুতো সকলকে একটু অস্বস্তি দেয় কিন্তু পুরানো বা কিছুটা ব্যবহার করা জুতো দেয় স্বস্তি, রক্ষাকরে পথের কাঁটা থেকে। আর পুরানো বন্ধুকে বিশ্বাস করা যায়, আলাপে তৃপ্তি পাওয়া যায়, কারণ তাকে চেনা আছে। সেইরকম এক অন্তরঙ্গ বন্ধুকে দেখলাম আজ। এখন একটা

মেডিক্যাল কোম্পানীর রিপ্রেজেণ্টটেটিভ্ হয়েছে। আগে অবস্থা ভাল ছিল না তাই বেশীদূর পড়তে পারেনি, এখন বেশ কয়েক শ' টাকা মাইনে পাচ্ছে। তার সঙ্গেই এতক্ষণ গল্প করছিলাম। অনেকদিন পর দু'জনের দেখা হওয়ায় বেশ প্রাণখুলে গল্প করা গেল আর তার রেশ এখনও আছে বলেই আমাকে খুশী-খুশী মনে হচ্ছে তোমার। একই আদর্শে দীক্ষা নিয়েছিলাম দু'জনে। আজ দু'জনে অনেক পরিকল্পনা করা গেল। সে নিজে এ বিষয়ে কতদূর সফল হবে বা তার কথা সে রাখবে কিনা জানিনা, তবে এ বিষয়ে সে খুব উৎসাহ দেখাল। আমার পরিকল্পনা শুনে খুব উৎসাহ দিল আমাকে, আর তাই আমার মন আনন্দে পূর্ণ হয়ে গেছে।

কৃষ্ণা বলে—তা পরিকল্পনাটা কি আমরা জানতে পারি না? অবশ্য বলতে যদি বাধা না থাকে।

সুখেন বলে—বাধা থাকবে কেন? তোমাকে বলব বলেই তো ডাকলাম। এ বিষয়ে তোমার মতামতটাও জানা যাবে। জান কৃষ্ণা, আজ সমাজে যারা অবহেলিত, যারা সব থেকে বেশী অপমান আর অত্যাচার সহ্য করতে বাধ্য হচ্ছে তারাই সমাজের মেরুদণ্ড। দু'চারজন ধনী সমাজে নিজের আত্মগরিমার প্রচারের মোহে এই গরীবদের বাঁচার অধিকারটুকু পর্যন্ত অস্বীকার করতে চায়। সংখ্যায় বেশী হলেও এরা আজ একজোট হয়ে দাঁড়াতে পারছে না, ভীরুর মত শুধু পড়ে পড়ে মার খাচ্ছে আর তাদের বুকের রক্ত শোষণ করে নিজের বিলাসিতা মেটাচ্ছে ঐ ধনীর দল। এমন কেউ আজ নেই যে ডাকদিয়ে এই শোষিতদের এককরে অন্যায়ের প্রতিবাদ করাতে পারে, শেখাতে পারে বাঁচার অধিকার ও প্রয়োজন দুইই আছে তাদের। কালোবাজারী, মুনাফাখোর, জালিয়াৎ শিল্প-পতি আর ব্যবসাদার, ঘুষখোর সরকারী কর্মচারীদের সহায়তায় এই দুর্বল সরল লোকদের পশুর মত জীববধারণ করতে বাধ্য করেছে, টাকার প্রাচুর্য্যে মানুষের করছে অপমান। নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির চেষ্টায় সমস্ত দেশটা অন্ধকারে ঠেলে দিয়ে, গরীবদের দুর্দশা-কাতর মুখে মিনতির বাণী শুনে অহংকারে, শক্তির অপব্যবহারে দাঁত বার

করে হাসে আর দামী গাড়ী চড়ে মুখে সৌখিন সহানুভূতি দেখিয়ে তাদেরকে আরো শোষণ করার পরিকল্পনা করে। অন্যায়ের বিচার চেয়েও ঠিক বিচার পায় না এই গরীবের দল, টাকার কাছে বিক্রী হয় তাদের মনুষ্যত্ব। আমি চাই সে অন্যায়ের ঠিক বিচার করতে হবে, প্রকৃত অপরাধীকে তার প্রাপ্য শাস্তি দিতেই হবে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম হবে কোনপ্রকার আপোষহীন। মনে আছে তোমার নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সে উদ্দীপ্তবাণী—"অত্যাচারীকে শাস্তির বিধানে আপোষ-হীন সংগ্রাম করাই আমাদের জীবনের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত।"—আচ্ছা কৃষ্ণা, বলতে পার অন্যায় জেনেও তা স্বীকার করা কি সম্ভব? দেখ সমাজে কি ব্যাভিচার চলেছে অবাধে আর আমরা তার প্রতিকার করা দূরে থাক উল্টো তাই দেখে হাসছি। বুঝি না আমার জীবনের কি মূল্যবান অংশ এরজন্য চিরকালের মত নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আমি চাই সত্যি বিচার করতে, বিচারকের আসনে বসে বিচারের প্রহসন করা নয়। পৃথিবী জানুক আজও সকলকে টাকা দিয়ে কেনা যায় না, সত্যের দাম এখনও আছে। যে অন্যায়ের এবং অত্যাচারের দুষ্ট কীট জাতির জীবনে প্রবেশ করেছে যতটা পারি সেই কীটের ধ্বংস করবার শপথ নিয়েছি আমি। অন্যায় করলেই—তা সে যেই হোক্ না কেন—তার শাস্তি দিতে আমি বদ্ধ পরিকর।

কৃষ্ণা সুখেনের এই উত্তেজিত কথা শুনতে শুনতে নিজেও উত্তেজিত হয়ে উঠে। বলে—সারাদেশ যখন সেই বন্যায় নিমগ্ন তখন তুমি একা চেষ্টা করে কি করতে পার?

সুখেন দৃঢ় স্বরে বলে—যতটুকু সম্ভব ততটুকুই করব। সারাদেশের পরিবর্তন এতে আসবে না সত্যি কিন্তু তবু কয়েকজন তো পাবে উচিৎ দণ্ড। হয়ত একের এ আদর্শ অন্যকেও প্রেরণা দেবে। আর আমি একা নই, এমন অনেকেই আছেন যাঁরা সত্যি দোষীকে শাস্তি দিতে কার্পণ্য করেন না। আর যাঁরা মনে মনে চাইলেও কিছুটা দুর্বলতায় শাস্তি দিতে ভয় পান তাঁরা মনে বল পারেন, দৃঢ় হবেন অন্যায়ের প্রতিকারে। সত্যি কৃষ্ণা, দুঃখ হয় এই ভেবে যে একজন সরল সাধারণ

মানুষ অন্যায় ভাবে উৎপীড়িত হচ্ছে অথচ তার প্রতিকার করতে পারছে না। আই আজ প্রতিটি যুবককে এক হয়ে এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে, এর উচিত শাস্তি দিতে হবে। প্রত্যেকের ভাবা উচিত এ আমার দেশেব আমার আপনজন। তোমাকেও দীক্ষা নিতে হবে এই নবমন্ত্রে! যে টুকু পার যতঅল্পই তা হোক্ না কেন তা তোমাকে করতেই হবে। অন্যায়ের কাছে হাবমানতে পাবে না। পার কি তুমি তোমার নিজের ভাই-বোনের উপর কেউ অত্যাচার করলে মুখবুজে তা সহ্য করতে? পার কি সেই অত্যাচারীর সাফাই গেয়ে বেড়াতে? না, পার না তা, তোমার বিবেক বাধা দেবে তোমাকে। তেমনি এক মায়ের গর্ভে জন্মে যদি আমরা অভিন্ন হই তা হলে এক দেশে জন্মে কেন হব না একত্র? কেন একে অপবের দুঃখে তার পাশে দাঁড়াব না? কেন চেষ্টা করব না তার যন্ত্রণার উপশম হতে সাহায্যে করতে। একবার ভাব আমি আর আমার দেশ এক, তা হলে দেখবে কোথা থেকে তুমি প্রেরণা পাবে, বল পাবে। আর তা হলে জয়ী তুমি হবেই। বাধা, তা সে যত বড়ই হোক্ না কেন তার মধ্যে তুমি তোমার পথ করে নিতে পারবে। তোমাকে তোমার আদর্শপথে আরো কয়েকজনকে টানতে হবে তোমার বান্ধবীদের সততা আর নিষ্ঠার অঙ্গীকারে একত্র করতে হবে। আমি চাই তোমার সহযোগিতা, তোমার প্রেরণা।

—বেশ, দিও তুমি দীক্ষা তোমার মন্ত্রে। যতটুকু পারি চেষ্টা করব তোমাকে সাহায্য করতে। কিন্তু এই বিরাট ব্যাভিচার দূর্ করা আমাদের মত দু'একজনের কাজ নয়, সম্ভবও নয়।

—কৃষ্ণা, সফলতা অর্জন একটু কঠিন ঠিকই, কিন্তু অসম্ভব নয়। আমরা দু'একজনে সমাজের আমুল সংস্কার করতে পারব না ঠিক, কিন্তু প্রতিজ্ঞা করতে পারব অন্যায় আমরা করব না, অন্যায় দেখলে তার প্রতিকার যদি নাও করতে পাবি তবু দৃঢ় কণ্ঠে প্রতিবাদ করব। সমাজ সংস্কারক না হতে পারি সমাজ হিতৈষী হব। নিজেরা সততা আর কর্তব্য, ধর্ম আর ন্যায়, অলসতা বিমুখ কর্ম আর সব রকম স্বার্থ বর্জন করে নিজেদের চরিত্র গড়তে পারব। দেখবে কৃষ্ণা সব সাফল্য একবারে

না পেলেও একদিন কিছুটা সাফল্য পাব। আর নিজেরা যদি নিজেদের গড়তে পারি তাহলে সেই তো আমাদের বিরাট সাফল্য, বিরাট জয়।

সুখেনের নির্ভিক্ সংকল্প বাক্য, তার কঠিন কর্তব্য পথে অবিচল থাকবার ইচ্ছা কৃষ্ণাকে উজ্জীবিত করে। মানুষের প্রতি সুখেনের ভালবাসা, সকল প্রলোভন ত্যাগ করবার মত দৃঢ়তা, সততার প্রতি তার একান্ত নিষ্ঠা দেখে শ্রদ্ধায় তার চরণে প্রণাম জানায় কৃষ্ণা। শপথ করে সুখেনকে সাহায্য করে তার চলার পথে বন্ধু হবার।

কয়েকদিন হল সুখেনের রেজাল্ট্ বার হয়েছে। তার কৃতিত্বে সকলেই আনন্দিত ; বাড়ীর সকলে তার সাফল্যে গর্বিত। সব থেকে আনন্দিত কৃষ্ণা ক'দিন ধরে সুখেনকে একমুহূর্ত বিশ্রাম করতে দেয়নি। থিয়েটার, সিনেমা, এখানে ওখানে বেড়ান নিয়ে সে ছুটে বেড়িয়েছে। সুখেন কিছু বলতে গেলেই শাসন করতে চায়, বলে—আর তো কয়েক দিনের মধ্যে বিলাত চলে যাবে, একটু হৈ-হৈ করে নি এখন। তা ছাড়া তোমার সাফল্যে একটু আনন্দ না করলে চলবে কেন, মনে থাকা চাইতো এই দিনের স্মৃতি। এখন তোমার কোন কথা শুনতে চাই না, শুনব না।

কৃষ্ণার পাগলামীতে সুখেন হাসে কিন্তু বাধা দিতে পারে না। তারা দু'জনেই ছোট বয়সে মাতৃহারা, দু'জনেই এ বিষয়ে সমান দুঃখ পেয়েছে। তাই তাদের মিল সত্যিকারের বন্ধুর মত। সুখেন জানে কৃষ্ণা তাকে ভুলিয়ে রাখতে চায় আনন্দের মাঝে। ভয় করে সুখেন একটু একলা থাকলেই হয়ত পুরানো দুঃখের রোমান্থন করবে। সুখেনের দুঃখে সে নিজেও দুঃখ পাবে, তাই সে সুখেনকে ভাববার এতটুকু সময় দিতে রাজী নয়। সুখেনও চায় না কৃষ্ণাকে ব্যথা দিতে, তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়ে অশান্তি সৃষ্টি করতে। তা ছাড়াও সুখেন জানে কৃষ্ণার দাবী আছে আর সে দাবী তার বাবা ও কৃষ্ণার বাবার সমর্থনেই গড়ে উঠেছে। সে নিজেও কি পারবে সে দাবী উপেক্ষা করতে ?

কয়েকদিন আগে দীনেশবাবু তাকে বিয়ে করবার জন্য বলেছিলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল বিলাত যাবার আগে বিয়েটা হয়ে যাক্। সুখেন জানে

তাঁর ইচ্ছা, কাকে তিনি পুত্রবধূ করতে চান তাই বলেছিল—'এখন নয় বাবা। ফিরে এসে বিয়ে করতে অমত করব না। আর তা ছাড়া কৃষ্ণা তোমার কাছে থাকবে, তোমার খুব একটা অসুবিধা হবে না।' মনেমনে সুখেন আর একটা কারণও বুঝতে পারে। দীনেশবাবু আসলে কেন বিলাত যাবার আগে বিয়ে দিতে চান তা বুঝতে পারে সুখেন। সব অভিভাবকই ছেলেকে বিয়ে না দিয়ে বিলাত পাঠাতে ভয় পান, একটা ভয় থাকে তাঁদের মনে। সুতরাং দীনেশবাবুর আগ্রহ দেখে কৌতুকবোধ করলেও একটু অভিমান হয় তার বাবার উপর। সে কি পারে বাবার মনে আঘাত দিয়ে এক শ্বেতাঙ্গিনীকে ঘরে আনতে? আর তা ছাড়া সে মনে মনে নিজের দেশের, নিজের জাতির বদলে শ্বেতাঙ্গিনী বিয়ে করার বিরোধী। তাই বাবাকে অসংকোচে আশ্বাস দিতে পারে।

দেখতে দেখতে যাবার দিন এসে গেল। সে দিন সকাল থেকে সকলের মুখ আসন্ন বিদায়ের আভাসে গম্ভীর। দীনেশবাবু অতিকষ্টে নিজেকে সামলে রেখেছেন, কিন্তু তাঁর মুখ দেখলেই হৃদয়ের ভাষা বুঝতে পারা যায়। আর কৃষ্ণা? সকাল থেকেই চেষ্টা করছে সহজ হবার কিন্তু বারবার চোখে জল এসে যাচ্ছে। যাবার সময় হতেই সুখেন দীনেশবাবুকে প্রণাম করে বলল—বাবা আপনি ভাববেন না। দেখতে দেখতে বছর কেটে যাবে আবার ফিরে আসব। আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমি জয়ী হতে পারি।

দীনেশবাবু সজল চোখে তাকে বুকের মধ্যে ধরে বললেন—আশীর্বাদ করছি তুমি সফল হও। কিন্তু প্রতি সপ্তাহে চিঠি না পেলে আমি খুব ভাবব, ঠিকমত চিঠি দিও। আর সাবধানে থাকবে, কোন দরকার হলেই আমাকে জানাবে। অনেক আশা নিয়ে থাকব সুখেন। স্নেহের টান যে কত বড় আজ বুঝতে পারছি আমি, কিছুতেই ছেড়ে দিতে মন চায় না। নেহাৎ তুমি চলেছ আরো লেখাপড়া শিখে মানুষ হয়ে দাঁড়াতে তাই নিজেকে প্রবোধ দিয়েছি। স্নেহের টান যত বড়ই হোক্ তোমার সাফল্যের পথকে পিচ্ছিল করে দিতে কি পারি? আজ তোমার মা

থাকলে দেখতেন তাঁর সুখেন মানুষ হয়ে দাঁড়াবার অদম্য ইচ্ছায় বিলাত যাচ্ছে—কি খুশীই না হতেন তিনি। তুমি তাঁকে প্রণাম কর সুখেন, তাঁর আশীর্বাদ চাও তোমার যাত্রাপথে। বলতে বলতে দীনেশবাবুর দু'চোখ দিয়ে জল ঝরে পড়ে।

সুখেন কৃষ্ণার সন্ধানে গিয়ে দেখে কৃষ্ণা বিছানায় শুয়ে শুয়ে কাঁদছে। সুখেন তাকে ডেকে বলে—আজ তুমি কাঁদছ কেন? তুমি আজ হাসিমুখে বিদায় দাও। তুমি তো আমাকে প্রেরণা দেবে প্রতিজ্ঞা করেছ তা হলে শুধু শুধু কাঁদছ কেন?

কৃষ্ণা সুখেনের কথায় চেষ্টা করে সহজ হবার কিন্তু কিছু বলতে গিয়েও বলতে পারল না। শুধু ঠোঁট দুটো থর থর করে কেঁপে উঠল।

সুখেন কৃষ্ণার অবস্থা বুঝে বলল—আমি চলে গেলে আমার কাজ তো তোমাকেই করতে হবে কৃষ্ণা। তুমি যদি নিজে দুর্বল হও তাহলে ি ক করে কাজ করবে। আর তোমার হাসিমুখ না দেখে গেলে বিলাত গিয়েও আমি সুখ পাবনা। আমায় হাসিমুখে বিদায় দাও তুমি।

কৃষ্ণা অনেক কষ্টে একটু সামলে নিয়ে বলে—তোমার যাত্রাপথে বিঘ্ন সৃষ্টি করব না। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছি তুমি বড় হয়ে ফিরে এস। তুমি যে ক'দিন থাকবে ততদিন তোমার কাজ আমি করবার চেষ্টা করব। জানিনা কতদূর পারব তবে চেষ্টা করে যাব নিশ্চয়ই তা সে যত কঠিনই হোক্ না কেন।

সুখেনের মুখে ফুটে উঠে তৃপ্তির হাসি। কৃষ্ণা তাকে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াতেই বলে—আশীর্বাদ করছি তোমাকে আমি। আমি জানি তুমি পারবে, নিশ্চয়ই পারবে। আর যদিও একথা তোমাকে বলা বাহুল্য তবু বলছি বাবাকে তুমি একটু দেখো। আমি না থাকলে খুব কষ্ট হবে তার, তুমি তাঁকে সান্ত্বনা দিও। তুমি আছ বলেই এত নিশ্চিন্ত মনে যেতে পারছি আমি। তোমার উপর আমার অনেক ভরসা, অনেক আশা। আমার সাফল্যের সবটুকু কৃতিত্ব তোমার।

বিদায় নিয়ে চলে যায় সুখেন।

॥ ১১ ॥

বিলাত থেকে ফিরে এসেছে সুখেন। ভালভাবেই পাশ করেছে পরীক্ষায়। ফিরে এসেই চাকরী পেয়েছে মালদায়। কাজে জয়েন করেই সুখেন তার এতদিনের সংকল্পের বাস্তব রূপ দেবার চেষ্টা করতে লাগল। মনে মনে খুশী সুখেন নিজের ব্রত উদ্‌যাপনের সুযোগ পেয়ে। এতকম বয়সে আর কেউ ওখানে জজ হয়ে আসেনি, তাই সকলেই বিস্মিত। প্রথমটা সকলেই তার বয়সের প্রতি কটাক্ষ করে আক্ষেপ করত। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যে তার বিচারের দক্ষতা আর শানিত বুদ্ধির প্রশংসায় সকলেই পঞ্চমুখ হয়ে উঠল। সকলেই বলতে লাগল বয়স কম হলে কি হয় এমন চমৎকার বিচারক তারা দেখেনি। শুধু সাধারণ লোকই নয় কোর্টেও অনেকে তার প্রশংসা করতে থাকে। সামান্য আরদালীরা এতদিন নিজেদের মানুষ বলে ভাবত না। ভাবত তারা শুধু হুজুরের হুকুম তামিল করতে আর তাঁদের সেবা করে ধন্য হবার জন্যই তাদের বাঁচা। কিন্তু সুখেন প্রথম থেকেই তাদের সঙ্গে সহজ ভাবে মিশতে চেষ্টা করল। প্রথমটায় তারা অনভ্যস্ত স্নেহে অস্থির হত। ভাবত এ কেমন জজ সাহেব? কেউ যা করে না এ কেন তা করতে চায়? সন্দেহ করত, মতলব খারাপ বলে ধারণা করত। কিন্তু পরে নিজেদের ভুল বুঝতে পারে তারা, আর সেই থেকেই তারা সুখেনকে শুধু মাত্র জজ সাহেব হিসাবে নয় মানুষ হিসাবেও ভালবাসতে শিখল। অবশ্য তারা সুখেনকে মানুষ ভাবত না—তাকে দেবতা বলে পূজা করত। সুখেনের জন্য কিছু করতে পারলে নিজে ধন্য মনে করে, তার জন্য বোধহয় হাসতে হাসতে জীবন দিতে পারে।

অন্যদিকে উকিল-মোক্তাররা সুখেনের প্রতি অসন্তুষ্ট। বার-লাইব্রেরীতে তার নামে নানা কথা হয়। নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে—ছোক্‌রা জজ নিয়ে ভারী মুস্কিল হল দেখছি। কেউ অন্য কোন কথা বললে শুনতে চায় না, শুধু আইন জানে। আইন ছাড়া কোন কথা বলতে গেলেই আপত্তি করবে।

ধীরেশবাবু ওখানকার একজন নামজাদা উকিল। অন্য জজরা ওঁকে একটু বিশেষ খাতির করতেন, হয়ত মনে মনে একটু ভয়ও করতেন। অন্য উকিলরা তাঁর প্রতিপত্তিতে ঈর্ষা করলেও মনে মনে তাঁকে শ্রদ্ধা করে। তারা বলে আগে যিনি ছিলেন তিনি নাকি ধীরেশবাবুর কথায় উঠা-বসা করতেন। কিন্তু এহেন বাঘা উকিল স্বপ্নেও ভাবেন নাই এই ছোকরা জজ তাঁকেও ধমক দেবে। তাই সেদিন এক সাক্ষীকে কিছুতেই জব্দ করতে না পেরে সাক্ষীকে ঘোরাবার ইচ্ছায় আজে বাজে প্রশ্ন করতে আরম্ভ করলেন। সাক্ষী খুব জোরের সঙ্গে তাঁর সব তর্কজাল ছিন্ন করে তাঁকে বিপদে ফেলছিল। তাই তার সেন্টিমেণ্টে আঘাত দিতে চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু তিনি প্রশ্ন কবার সঙ্গে সঙ্গে সুখেন বলে উঠে—Don't bit about the bush. Please come to the point. ধীরেশবাবু তখনও সুখেনকে বুঝতে পারেন নি, তাই একটু হেসে পুনরায় সাক্ষীকে বাজে প্রশ্ন করলে। সঙ্গে সঙ্গে সুখেন বলে উঠল—বাজে কথা বলে অনর্থক সময় নষ্ট করবেন না। হয় ঠিক ঠিক প্রশ্ন করুন না হয় ছেড়ে দিন। এটা আদালত মনে রাখবেন।

ধীরেশবাবু অপমানে লজ্জায় মাথা নীচু করেছিলেন। মামলায় হেরে গেলেও এত অপমানিত ভাবতে পারেন না। তিনি কিনা এই আইন ব্যবসায়ে মাথার চুল পাকিয়ে ফেললেন আর একটা ছোকরা জজ তাঁকে আইন শেখাতে চায়? এই প্রবীণ বয়: তাঁকে হার স্বীকার করতে হবে এক সবে কেতাবী বিদ্যা শেষ করা ছোকরা জজের কাছে? তাই তাঁর রাগ সব থেকে বেশী জজ সাহেবের উপর, অথচ প্রকাশ্যে বেশী কিছু বলতে পারেন না। তাঁর মনে হয় অন্য উকিলরা তাঁকে অপদস্থ হতে দেখে খুশী হয়েছে। নিজের সম্মানে আঘাত লাগায় ধীরেশবাবু

সুখেনকে জব্দ করবার চেষ্টা করেন। অপরের কাছে সখেদে বলেন —নূতন জজ হয়েছে তাই মেজাজ দেখাচ্ছে। দাঁড়াও, একটু বয়স হোক্ তখন দেখবে….

শেষ করেন না তিনি। ঐ পর্যন্ত বলেই থেমে যান। কারণ মনে মনে তিনি জানেন সুখেন সত্যিই আইন জানে। আইনের জটিল মার-প্যাঁচের মধ্যেও সূক্ষ্ম বিচার করতে পারে। কিন্তু স্বার্থ মানুষকে বিচার শূন্য করে। ধীরেশবাবুও আপন স্বার্থে এবং অপমানের লজ্জায় সুখেনকে পরাজিত করবার নেশায় মেতে উঠলেন। প্রথমটা নিজস্ব পন্থায় আলাপ জমাতে গিয়েছিলেন, কিন্তু সেখানেও সুখেনের আগ্রহের অভাব দেখে কিছুটা দমিত হলেন। কিন্তু সব থেকে বেশী অপমানিত হলেন যেদিন বাজার থেকে পাকা পাঁচসেরী মাছ কিনে নিয়ে গিয়ে নিজের বাড়ীর পুকুরের মাছ বলে দিতে গিয়েছিলেন সেদিন। সুখেন তাঁকে কড়া কথায় ফিরিয়ে দিয়েছিল, তাঁর কোন কথাই শুনতে চায়নি। মুখ চুন করে ফিরে এসেছিলেন তিনি। কাউকে এ বিষয়ে কিছু বলতে চাননি, কিন্তু কেমন করে অনেকেই ব্যাপারটা জেনে ফেলল। আর খোঁচা দেবার এমন সুযোগে অনেকেই সামনা সামনি না হলেও আড়ালে তাঁর নামে বিদ্রূপ করতে লাগল। ফলে ধীরেশবাবুর আক্রোশ আরো বেড়ে গেল। এতদিন প্রকাশ্যে সুখেনের নামে কিছু বলেন নি, কিন্তু এবার অপমানের জ্বালায় সামান্য ভদ্রতাটুকু পর্যন্ত বিসর্জন দিয়ে সুখেনের নামে নানা কুৎসা রটনা করে বেড়াতে লাগলেন। আর এ বিষয়ে তাঁকে কিছুটা সাহায্য করতে লাগলেন কোর্টের পেস্কার সতীশবাবু। সতীশবাবু সুখেনের কড়া ব্যবহারে আর তার কাছে বকুনি খেয়ে দু'পয়সা রোজগার না করতে পেয়ে নূতন জজ সাহেবকে একেবারে দেখতে পারতেন না। তাই দু'জনে আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলেন সুখেনের নামে অপবাদ দিয়ে, কুৎসা রটনা করে তাকে ওখান থেকে বদলী করতে।

হয়ত তাঁদের যোগসাজগে কিছু একটা হোত, কারণ সুখেন নিজেও এই কুৎসায় যথেষ্ট অপমানিত হয়ে বদলী করবার আবেদন করত, কিন্তু একটা জটিল কেস সে সময় তার কোর্টে চলছিল। আসামী একজন

বিখ্যাত জমিদার, যথেষ্ট প্রভাবশালী। নিজের এক প্রজাকে গুলি করে হত্যা করেছে বলে বাদী বিচার চায়। অবশ্য কেসটা বর্তমানে পুলিশই চালাচ্ছে। কিন্তু এই প্রভাবশালী জমিদার সাজা না পেয়ে মুক্তি পাবে বলেই সকলের ধারণা, আর কেসটা ঘুরিয়ে দেবার জন্য আসামী পক্ষ থেকে জোর তদ্বির চালাচ্ছে। জুরীদের মধ্যে অনেককে আসামী পক্ষ ইতিমধ্যে হাতকরে নিয়েছে। শুধু জজ সাহেবের কাছে কোন প্রস্তাব করবার সাহস করেনি। আর সুখেন তাদের তদ্বিরের কথা শুনেই আরো কঠোর হল, প্রতিজ্ঞা করল অপরাধীকে সাজা দেবেই। সেজন্যই বদলীর কথা ভুলে প্রাণ দিয়ে কেসটা বিচার করতে লাগল। কোর্ট প্রত্যেক দিনই লোকে লোকারণ্য থাকে। সেদিকে দৃষ্টি দিয়ে সুখেন ভাবে এ বিচার আসামীর নয় এ বিচার তার।

সেদিন শেষ সাক্ষীকে জেরা করা হবে। এই একটি মাত্র সাক্ষীকে আসামী পক্ষ হাত করতে পারেনি। অঘোর পণ্ডিত বয়সের ভারে শীর্ণ কিন্তু উজ্জ্বল চোখে কঠোর সংকল্প। তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন আসামী দেবেন্দ্রনাথকে খুনের সময়ে। তাই তাঁর সাক্ষ্য সমস্ত কেসটা ঘুরিয়ে দিতে পারে। বয়সের অভিজ্ঞতায় আর দরিদ্র হলেও আত্ম-মর্য্যাদা সম্পন্ন নির্ভিক হওয়ায় প্রচুর টাকার প্রলোভন তিনি জয় করেছেন।

সরকারী উকিল সেদিন প্রথমে উঠেই বললেন—মাননীয় ধর্মাবতার, ন্যায় ও সত্যের নামে এই পূর্বপরিকল্পিত জঘন্য এবং নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের বিচার প্রার্থনা করে এই মামলা মহামান্য বিচারকের কাছে আবার উত্থাপন করছি। আজ হতে তিনমাস পূর্বে ৪ঠা আষাঢ় মৃত অবিনাশ জমিদার দেবেন্দ্রনাথের পুকুরে প্রাতঃকৃত্য করতে এসেছিল। আসামী দেবেন্দ্রনাথ সে সময় গাছের তলায় দাঁড়িয়েছিলেন। আমার শেষ সাক্ষী অঘোর পণ্ডিত স্বচক্ষে তা দেখেছেন। সুতরাং তাঁকে সাক্ষ্য দেবার জন্য উপস্থিত করবার আদেশ প্রার্থনা করছি।

শীর্ণ অঘোর পণ্ডিত কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে শপথ পাঠ করার পর সরকারী উকিল বললেন আপনার নাম ?

—অঘোর মজুমদার।

—আপনার পেশা কি ?

—গ্রামের পাঠশালায় ছোট ছেলেমেয়েদের পড়াই আমি।

—আচ্ছা, আপনি শেষ কখন মৃত অবিনাশকে দেখেছিলেন ?

—সেদিনই ভোরে। আমি ভোরে উঠে পূজার জন্য ফুল তুলতে যাই। ছোট থেকেই ভোরে উঠা আমার স্বভাব তাই সেদিন ভোরে ফুল তুলতে যাবার সময় দেখি অবিনাশ পুকুরের দিকে যাচ্ছে। আমাকে দেখেই প্রণাম করল।

—আচ্ছা, সে সময় আসামী দেবেন্দ্রনাথকে দেখেছিলেন কি ? তিনি তখন কি করছিলেন।

—দেবেন্দ্রনাথ একটু দূর গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিল। আমাকে দেখেই মুখটা ঘুরিয়ে নিল।

—তার হাতে কিছু দেখেছিলেন কি ? মানে বন্দুক ছিল কি ?

—দেবেন্দ্রনাথ একটু আড়ালে থাকায় আমি কিছু দেখতে পাইনি।

এ সময় আসামী পক্ষের উকিল ধীরেশবাবু লাফিয়ে উঠে বললেন—হুজুর, এ মিথ্যা কথা। দেবেন্দ্রনাথ সে সময় ঘরেই ছিল, কারণ কয়েকদিন যাবৎ সে অসুস্থ ছিল। আগের সাক্ষীরা এ বিষয়ে আপনাকে অবহিত করেছেন।

সুখেন তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বলল—আপনার সময় এলে জেরা করবেন, এখন বাধা দেবেন না।

সরকারী উকিল সাক্ষীকে বললেন—আচ্ছা, এ কেস সম্বন্ধে আপনি যা জানেন বা যা দেখেছেন সব বলুন।

অঘোর পণ্ডিত আস্তে আস্তে বলতে লাগলেন—আজ থেকে তিন মাস আগে ৪ঠা আষাঢ় ভোরে ফুল তুলতে গিয়ে দেখলাম দেবেন্দ্রনাথ একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে। তাকে কোন কথা না বলে আমি এগিয়ে যাই। একটু পরেই গুলির শব্দে আমি চমকে উঠি। সঙ্গে সঙ্গে একটা চিৎকার শুনে আমি সেদিকে দৌড়ে গিয়ে দেখি অবিনাশ মাটিতে শুয়ে ছট্‌ফট্ করছে আর দূরে জমিদার দেবেন্দ্রনাথ দৌড়ে পালাচ্ছে। আমি অবিনাশের কাছে গিয়ে দাঁড়াতে অবিনাশ স্তব্ধ হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি

তার গায়ে হাত দিয়ে বুঝলাম সে মারা গেছে। প্রথমটায় আমি খুব ঘাবড়ে গিয়েছিলাম, কিন্তু পরে ছুটে গিয়ে গ্রামের সকলকে খবর দি।

—আপনি আসামী দেবেন্দ্রনাথকে চিনতে পেরেছিলেন তো? ভুল হয়নি?

—না, ভুল হয়নি। আমি বৃদ্ধ হলেও দেবেন্দ্রনাথকে ঠিক চিনেছিলাম।

সরকারী উকিল তাঁর জেরা শেষ হয়েছে বলার সঙ্গে সঙ্গে আসামী পক্ষের ধীরেশ বাবু লাফিয়ে উঠে বললেন—আপনি ঠিক কটার সময় অবিনাশকে মৃত দেখতে পান?

—ঠিক সময় বলতে পাবব না, কেননা আমার কাছে ঘড়ি ছিল না।

—আচ্ছা, আপনি বলছেন দেবেন্দ্রনাথকে ছুটে পালাতে দেখে-ছিলেন। কিন্তু আপনি কি ঠিক চিনতে পেবেছিলেন?

—হ্যাঁ।

—আপনাব কাছ থেকে ঠিক কতটা দূরে মানে ঠিক ক' হাত দূবে তাকে ছুটে যেতে দেখেছিলেন?

—ঠিক বলতে পারছি না তবে আন্দাজ কুড়ি-পঁচিশ হাত হবে।

—অত দূর থেকে ঠিক চিনতে পারলেন?

—হ্যাঁ, আমি ঠিক চিনেছিলাম।

—আপনার বয়স তো কম হোল না, এখন পর্যন্ত পরিষ্কার দেখতে পান তাহলে?

একটু বিরক্ত হয়েই বেশ কঠিন স্বরে বললেন অঘোর পণ্ডিত—চিনতে আমার কষ্ট হযনি। এতটুকু বয়স থেকে যাকে দেখছি তাকে চিনতে সেদিন কোন অসুবিধা হয়নি। আমাকে মিথ্যা বলাবার চেষ্টা করবেন না, জীবনে আমি মিথ্যা বলিনি। নাহলে আজ মিথ্যা বলবাব জন্য কয়েক হাজার টাকা দিতে চেয়েছিল ওরা। আমি গরীব কিন্তু মিথ্যাবাদী নই।

একটু অপ্রস্তুত হলেও ধীরেশবাবু আবার চেষ্টা করতে লাগলেন অঘোর পণ্ডিতকে তাঁর পূর্বের বক্তব্য ভুল বলাতে, কিন্তু কোনভাবেই

সফল হতে পারলেন না। শেষে অঘোর পণ্ডিত জজ সাহেবের দিকে তাকিয়ে বললেন—আমি আর পারছিনা হুজুর। আমি অসুস্থ। এবার আমাকে বাড়ী যাবার নির্দ্দেশ দিন।

তাঁর কাতর প্রার্থনায় এবং কণ্ঠস্বরে সুখেন তাঁকে চলে যাবার আদেশ দিল। সকলেই বুঝল আসামী এবার আর মুক্তি পাবে না। জনতার মধ্যে একটা গুঞ্জরণ উঠল। এতদিন দেবেন্দ্রনাথ অনেক পাপ করেছে, তার অত্যাচারে সকলেই স্বন্ত্রস্ত। তার সাজা সকলের কাম্য। সেদিনের মত কোর্টের কাজ শেষ হল, সকলেই রায় দানের দিন শুনে চলে গেল।

সেদিন রায় বার হবে। সমস্ত আদালতে তিলধারণের স্থান নেই। সুখেন কোর্টে এলে জুরীরা নিজেদের মধ্যে কেস সম্বন্ধে আলোচনা করবার জন্য গোপনকক্ষে গেলেন। উপস্থিত জনতা উৎকন্ঠিত হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। প্রায় দু' ঘণ্টা পরে সকলে ফিরে এসে নিজের আসন গ্রহণ করলেন। ফোরম্যান সুখেনকে বললেন—নট্ গিল্টি।

সুখেন আশ্চর্য্য হয়ে গেল। অবাক হয়ে বলল—কি বলছেন?

ফোরম্যান বললেন—'আসামী নিরপরাধ। সুতরাং তাকে ছেড়ে দেওয়া হোক্।' সুখেন উত্তেজিত হয়ে বলে—না। আমার মতে আসামী দেবেন্দ্রনাথ দোষী, সুতরাং আইন অনুসারে বিচার করতে আমি বাধ্য। আমি ভারতীয় দণ্ডবিধি অনুসারে আসামীকে প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলাম। কিন্তু এ মামলার বিচার নির্ভর করছে জুরীদের উপর। তাই তাঁদের সঙ্গে একমত হতে না পারায় আমি আমার মন্তব্য জানিয়ে কেস হাইকোর্টে পুনর্বিচারে জন্য পাঠাচ্ছি। হাইকোর্ট যা বলবেন তাই হবে।

ফাইল থেকে চোখ তুলতেই দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল সুখেনের। চিরদিন আরাম আর বিলাসের মধ্যে কাটিয়ে মাত্র কয়েকদিনের হাজতবাসে মুখ শীর্ণ হয়ে গেছে, চোখের নীচে জমেছে গভীর কালি। কুঞ্চিত মুখের প্রতিটি রেখায়, চোখের রক্তভরাদৃষ্টিতে

সুখেনের প্রতি গভীর আক্রোশ। সহ্য করতে পারে না সুখেন সে দৃষ্টি, চোখ নামিয়ে নেয়।

কোয়ার্টারে চলে আসে সুখেন। জীবনে প্রথম খুনী আসামীর বিচার করতে বসে তার শাস্তির বিধান দিল প্রাণদণ্ড। ভেবেছিল একটা নৃশংস খুনীর প্রাণদণ্ড দিয়ে সে খুশী হবে, আনন্দিত হবে সমাজ থেকে একটা জঘন্য অপরাধীর অপসারনে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য মানুষের মন। সে যে কিসে সন্তুষ্ট তা' সবসময় বোঝা যায় না। সুখেন বুঝতে পারেনা কেন তার মন ভারাক্রান্ত, দুঃখে পরিপূর্ণ। কোয়ার্টারে ফিরতেই প্রথম দেখা হল দীনেশবাবুর সঙ্গে। দিন তিন-চার আগে দীনেশবাবু ডাক্তারবাবু ও কৃষ্ণাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন। সুখেন বলে —বাবা, আজ এই প্রথম আমার জীবনে একটা মস্তবড় অভিশাপ নিয়ে এলাম। আজ একটা খুনীর বিচারে তাকে প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়ে এলাম। অবশ্য জুরীরা আমার সঙ্গে একমত না হাওয়ায় কেসটা হাইকোর্টে পাঠাবার ব্যবস্থা করেছি, কিন্তু আমার আদেশ নাকচ হবেনা নিশ্চয়ই।

দীনেশবাবু একটু চমকে উঠলেও সামলে নিলেন। তিনি নিজে আইন ব্যবহারজীবী, সুতরাং প্রাণদণ্ডের অনেক রায় তিনি দেখেছেন। তবু নিজের ছেলে একজনকে প্রাণদণ্ড দিয়েছে শুনে একটু বিচলিত হলেন। সুখেনের মানসিক অবস্থা তিনি বুঝতে পেরেছেন তাই বললেন —তুমি নিজে আইনের দাস। আইন নিজেই বিচার করে আর বিচারক শুধু তার নির্দ্দেশদানে সহায়তা করে। একটু বিশ্রাম কর সব ঠিক হয়ে যাবে।

নিজের ঘরে এসে একটা চেয়ারে বসে পড়ে সুখেন। পোষাক খুলতেও ইচ্ছা হয় না তার। রণক্লান্ত যোদ্ধা যেমন শিবিরে ফিরে এসে নিজের ক্লান্তি অনুভব করে তেমনি অবসাদে আচ্ছন্ন হয় সুখেন। চায়ের ট্রে হাতে ঘরে ঢুকেই কৃষ্ণা সুখেনকে এভাবে বসে থাকতে দেখে অবাক হয়ে বলে—কি ব্যাপার, আজ পোষাক ছাড়নি এখনো? খুব জটিল মামলা বুঝি?

সুখেন কৃষ্ণার কথায় মুখ তুলে বলে—আজ একটা খুনের বিচারে আসামীকে প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়ে এলাম কৃষ্ণা।

শিহরে উঠে কৃষ্ণা সুখেনের কথায়। কম্পিত স্বরে উচ্চারণ করে —ফাঁসী।

সুখেন তারদিকে চেয়ে বলে—হ্যাঁ, ফাঁসীর হুকুমই আমি দিয়েছি।

কৃষ্ণা তখনো নিজেকে সামলে নিতে পারেনি তাই কম্পিত স্বরেই বললো—'উঃ, কি ভয়ানক! তুমি একটা লোককে মেরে ফেলবার আদেশ দিলে? কেন, কেন অন্য শাস্তি দিলে না?' বলতে বলতে কেঁদে ফেলে কৃষ্ণা।

সুখেন দৃঢ় স্বরে বলে—উপায় ছিলনা। যে অপরাধ সে করেছে তার একমাত্র শাস্তি প্রাণদণ্ড। আইন বড় নির্মম কৃষ্ণা, হৃদয়ের আবেগের স্থান সেখানে নেই। তাই অপরাধীর প্রাপ্য শাস্তি আমি দিয়েছি। তা'ছাড়া এ রকম আবো অনেক অপরাধ সে কবেছে, কিন্তু ধরা পড়েনি কোনবার। টাকাব জোরে সকলের মুখ বন্ধ করে অত্যাচার করছিল এই জমিদার। আমি তাকে বুঝিয়ে দিয়েছি টাকা দিয়ে সকলকে কেনা যায় না, টাকার পাহাড় দিয়ে অপরাধ চাপা দেওয়া সম্ভব নয়।

উত্তেজিত কৃষ্ণা বলে—কিন্তু প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলে কেন? মানুষকে হত্যা করা যদি অপরাধ হয় তাহলে যে আইন বলে তুমি প্রাণদণ্ডের নির্দ্দেশ দিলে সে আইন কেমন আমি বুঝতে পারি না। সে খুন করেছে স্বার্থে, আর তুমি তাকে খুন করছো সমাজের স্বার্থে। বুঝতে পারছি না কে দোষী, কে বেশী অপরাধী? ঈশ্বরের সৃষ্ট জীবকে নিজের স্বার্থে হত্যা করবার কোন অধিকার তোমাদের আছে? শুধু কি তাই? ভেবে দেখলে না আজ যাকে প্রাণদণ্ডের আদেশ তুমি দিয়ে এলে তারও বাবা, মা, স্ত্রী, পুত্র থাকতে পারে? তারও থাকতে পারে সুখের সংসার? তারা তোমার কাছে কি অপরাধ করেছে যে তাদের সংসারে আগুন ধরিয়ে দিলে? স্ত্রীর সিঁথির সিঁন্দুর মুছে ফেলে তাকে বিধবা করলে, পুত্রকে করলে পিতৃহারা? কোন অপরাধে বাবা-মার কোল থেকে তাদের সন্তানকে হত্যা করাবে তুমি? বল, বল, তাদের অপরাধ

কোথায়? একের অপরাধে কেন তারা পাবে চরম শাস্তি? রক্তের, বদলে রক্ত, প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ-এই কি তোমাদের আইন? বিচার করতে বসে বিচারক যদি অপরাধীর শাস্তি দিতে নিজেও অপরাধ করে তাহলে তার শাস্তি কি? উত্তর দাও আমার প্রশ্নের? বল কোন অপরাধে তুমি এতগুলো লোককে সাজা দিতে চাও? বল কেন····

আর সহ্য হয় না সুখেনের। কৃষ্ণাকে থামিয়ে দেয় আর্ত্ত চীৎকারে। তার সমস্ত মুখ থেকে যেন রক্ত চলে গিয়েছে, চোখ দুটি যেন করুণ মিনতি জানাচ্ছে। অশ্রুপূর্ণ চোখে বিকৃত স্বরে সুখেন বলে—থাম কৃষ্ণা। আব. পারছি না আমি। উপায় নাই। আমি জানি সব, কিন্তু বিচারক আমি। যতক্ষণ সে আসনে থাকব ততক্ষণ আইনের দাসত্ব আমাকে করতে হবেই। আমাকে ক্ষমা কর তুমি।

তার আর্ত্ত কণ্ঠস্বরে কৃষ্ণা চুপ করে। সুখেনের মনের জ্বালা বুঝতে পারে সে। কিন্তু সান্ত্বনা দিতে পারে না, হয়তো মনে মনে এখনও সুখেনকে ক্ষমা করতে পারে না। তাই একরকম ছুটেই চলে যায় কৃষ্ণা সুখেনের কাছ থেকে।

সুখেনের সামনে ভেসে উঠে এক নারীর মুখ। সে যেন তাকে বলতে চায় কেন তুমি আমার স্বামীকে ছিনিয়ে নিতে চাও? কেন কেন তুমি আমার জীবনকে নষ্ট করতে চাইছো? দু'হাতে মুখ ঢেকে সুখেন টেবিলে মাথা গুঁজে বসে থাকে। ভাবে এক স্বামী গরবিনী নারী স্বামী সঙ্গ ছাড়া হতে চলেছে! তার সিঁথির উজ্জ্বল সিঁন্দুর রেখা যেন সুখেন নির্মম হাতে মুছে দিতে চলেছে। আর বৈধব্য সম্ভাবনায় সেই সতী নারী অভিশাপ দিচ্ছে তাকে। বুঝতে পারে সুখেন শুধু সেই নারী নয়, কৃষ্ণাও যেন তাকে অভিশাপ দিতে চাইছে! তার বিচারকের উচ্চপদ যেন অভিশপ্ত।

॥ ১২ ॥

কয়েকমাস কেটে গেল। সুখেন কেসটা হাইকোর্টে পাঠিয়েছে পুনর্বিচার করতে। এদিকে দেবেন্দ্রনাথের পিতাও আপীল করেছেন। সুখেন যদিও পুনর্বিচারের জন্য কেসটা পাঠিয়েছে কিন্তু মনে মনে কামনা করছে হাইকোর্ট যেন তার রায় নাকচ করে দেন। একটা বেদনাময় অস্বস্তির মধ্যে দিন কাটছে তার। প্রতিদিন বিবেকের জ্বালায় সে অস্থির হয়ে উঠল। নিজের মনের অস্থিবতায় মেজাজও ইদানিং রুক্ষ হয়ে উঠেছে। কথায় কথায় আরদালী, পিয়ন বকুনি খায়। সুখেন বুঝতে পারে তার রুক্ষ ব্যবহার সকলকে অকারণে যন্ত্রণা দিচ্ছে, কিন্তু কিছুতেই আগের মত স্বাভাবিক হতে পারে না। সব সময় নিজেকে অপরাধী ভাবতে ভাবতে সুখেন মেজাজ হারিয়ে ফেলে। দীনেশবাবু কৃষ্ণা ও ডাক্তারবাবু যতদিন ছিলেন ততদিন কোনবকমে দিন কাটছিল তার। কিন্তু তাঁরা চলে যাবার পর সুখেন নিঃসঙ্গতায় দিন দিন বদলে যেতে লাগল।

সুখেন এতদিন ধরে যা কামনা করছিল তা হলো না, হাইকোর্ট তার রায়-ই বহাল রাখলেন। আপীল পর্যন্ত নাকচ করে দিলেন। এতবড় বিজয়ে আনন্দের পরিবর্তে সুখেন দুঃখে আতঙ্কে সেদিন তাড়াতাড়ি নিজের কোয়ার্টারে চলে গেল। তার এই সাফল্যে একটুও খুশী হতে পারল না। তাই সেদিন পাবলিক প্রসিকিউটার তার সঙ্গে দেখা করতে এসে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে যখন তার বিচারের প্রশংসা এবং সেই সঙ্গে কিছুটা তোষামোদ করতে লাগলেন তখন সুখেন স্থান কাল ভুলে বলে উঠল—চুপ করুন, আমাকে একটু একলা থাকতে দিন প্লীজ।

পাবলিক প্রসিকিউটার অবনীবাবু অবাক হয়ে যান তার ব্যবহারে। যে লোক জুরীদের সঙ্গে একমত হতে না পেরে নিজেই ফাঁসীর হুকুম দিয়েছে সেই আজ অমন করে চিৎকার করে উঠছে দেখে অবাক হয়ে যান তিনি। কিন্তু তার মানসিক অবস্থা দেখে কোন কিছু না বলে ধীরে ধীরে চলে যান।

সুখেন ভাবে এ যেন তার বিবেকের শাস্তি, আসামী দেবেন্দ্রনাথের নয়। অপরাধীর প্রাপ্য শাস্তি দিতে চেয়েছিল সে। সমাজকে শুদ্ধ করতে, তাকে অপরাধ মুক্ত স্বচ্ছ সুন্দর করতে চেয়েছিল। কিন্তু ভাবতে পারেনি অপরাধীর শাস্তির বিধান দিতে নিজেও বিবেকের যন্ত্রণায় কাতর হবে। উপায় থাকলে হয়তো প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রত্যাহার করে নিত, কিন্তু যে আদেশ একবার সে দিয়েছে তা যতবড় নির্মম হোক প্রত্যাহার করা সম্ভব নয়। সত্য কঠিন কঠোর, তাই সত্যপালনে অঙ্গীকারাবদ্ধ হতে হলে নিজেকে করতে হয় কঠিন। আসামী দেবেন্দ্রনাথের ফাঁসী হল যেদিন সেদিন সুখেনের মনে হল বিচারক সুখেনের আবির্ভাবে পূর্বের আনন্দ উচ্ছ্বসিত সুখেনের মৃত্যু হল। আজীবন সে অভিশাপ লাভ করবে এক স্বামী-সঙ্গ হারা বিধবার।

ফাঁসী হবার দিন সুখেন এজলাসে বসে কাজ করছে এমন সময় মৃত দেবেন্দ্রনাথের স্ত্রীর পক্ষ হতে উকিল মৃতদেহ সৎকারের আবেদন জানিয়ে তার অনুমতির জন্য দরখাস্ত পেশ করলেন। সুখেন অতিকষ্টে নিজেকে দৃঢ় করে দরখাস্তটি সহি করবার জন্য নিয়েই চমকে উঠলো। নীচের স্বাক্ষরের যে নাম সে দেখে তা অবিশ্বাস্য মনে হলেও কঠিন বাস্তব। কল্পনা দেবীর স্বাক্ষর দেখে সুখেনের মন অস্থির হয়ে উঠলো। একি সেই কল্পনা যে তার জীবনকেন্দ্রে আজও অম্লান স্মৃতিতে তার সমস্ত সাফল্যকে উৎসাহিত করছে? এ কি সেই যে তার শিশুমনে নিজের চিরস্থায়ী স্থান করে নিয়েছে? না, না, নিশ্চয়ই তা হতে পারে না, হয়তো নামেই শুধু মিল আছে? আর তাছাড়া কল্পনার বিয়ের খবর কি সে পেত না? এ নিশ্চয়ই একটা অবিশ্বাস্য যোগাযোগ। অতিকষ্টে নিজেকে সংযত করে স্বাক্ষর করে দেয় সেই

আবেদনপত্রে। সহি করেই জিজ্ঞাসা করে—কল্পনা দেবী কি এখানে এসেছেন ?

উত্তরে উকিলবাবু বলেন—হ্যাঁ, ঐ যে উনি দাঁড়িয়ে আছেন।

তাঁর অঙ্গুলিসঙ্কেতের দিকে দৃষ্টি দিতেই দেখে এক স্তব্ধ বিষাদগ্রস্ত নারী তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। সে দৃষ্টিতে অভিযোগ নেই আছে শুধু আগুন। যেন তার অগ্নিঝরা দৃষ্টি দিয়ে ভস্ম করে দিতে চায় সুখেনকে। যেন বলতে চায় আমার জীবন যেমন তুমি নষ্ট করে দিলে তেমনি তোমাকেও আমি ধ্বংস করে দিতে চাই। না, কোন ক্ষমা তোমাকে নয়। তুমি বিচারক তাই তোমার গর্বে তোমার অহংকারে ও ক্ষমতার অধিকারে আমার জীবন কলমের এক আঁচড়ে শেষ করে দিয়েছো। কিন্তু জেনে রাখ তুমিও অপবাধী। আমার স্বামীর অপরাধের থেকে কোন অংশে কম নয় তোমার অপরাধ। তুমি আমার কাছে অপরাধী। আর তার বিচার করবে তোমার বিবেক, তিল তিল করে অনুশোচনার জ্বালায় জ্বলবে তুমি।

সুখেন দেখে চিনতে পারে না তার হৃদয়পটে যার ছবি আছে সে কিশোরী কিন্তু এই পুর্ণ যৌবনা নাবীর তো কোন ছবি সে জানে না। প্রথমটায় একটু স্বস্তি পায় সুখেন কিন্তু পরক্ষণেই নিজের সংশয় নিরশন করতে আবার তাকিয়েই চমকে উঠে। কল্পনার মুখের একটা আঁচিল দেখতে পেয়েছে সে। এই তো সেই মিল। হ্যাঁ, ঠিক নাকের বাঁ দিকে বড় আঁচিল ছিল কল্পনার। তবে এ নিশ্চয়ই সেই। মনে হতেই সুখেনের সমস্ত মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায়, হাত-পা কাঁপতে থাকে থরথর করে। মনে হয় সে বুঝি এখনি পড়ে যাবে। নিজেকে প্রবোধ দেবার আর কোন উপায় নেই। আদালতের সমস্ত লোক জজসাহেবের অবস্থা দেখে বিস্মিত হয়ে যায়। কোনরকমে সুখেন উঠে দাঁড়িয়ে মাথা নীচু করে গাড়ীতে গিয়ে বসে। আরদালীকে বাড়ীতে যাবার কথা বলেই গাড়ীর মধ্যে দু'হাত দিয়ে মাথাটা চেপে ধরে সুখেন।

যাকে প্রাণের থেকেও বেশী ভালবাসে, যার স্মৃতি জীবনে প্রতিষ্ঠাদানে সহায়তা করেছে সেই কল্পনাকে রুঢ় আঘাত দিয়েছে সে ?

নিষ্ঠুর আঘাতে তার জীবন আজ মরুময়। ন্যায় বিচার করবার অহংকার করেছিল তাই কি ভগবান তাকে দিয়ে এতবড় আঘাত দিলেন? এ কি তার অহংকারের গর্বের বিচার? কল্পনা যদি কোন দিন তার কাছে কৈফিয়ত চায় তা হলে কি কৈফিয়ৎ সে দেবে? কোন যুক্তিতে শান্ত করবে তার বিবেকের বিদ্রোহ? কল্পনা হয়তো চিনতে পারেনি তাকে। কিন্তু তার দু'চোখে ছিল ঘৃণা আর অবজ্ঞা। সুখেন দেখেছে সেই অগ্নিময়ী মূর্তিকে আর দেখা মাত্র বুঝতে পেরেছে তার অপরাধের ক্ষমা নেই। সমাজসেবী হতে চেয়েছিল সে, চেয়েছিল সমাজকে যথাসম্ভব কর্তব্য, নিষ্ঠা, সততা আর স্নেহের বারিধারায় শুচি শুদ্ধ করতে। কিন্তু তার মুল প্রেরণার উৎস শুকিয়ে গেল। তার কঠোর কর্তব্যজ্ঞানই সে উৎসমুখকে বন্ধ করে দিল। এ তার সাফল্য নয়—এ তার পরাজয়। হত্যা করল বোনের অধিক কল্পনার জীবন। সে হত্যাকারী!

আর ভাবতে পারে না সুখেন। কৃতকর্মের অনুশোচনায় অগ্নিদগ্ধের জ্বালা অনুভব করে সবসময়। তার অবস্থা দেখে আরদালীরা ভয় পায়। সুখেনকে তারা ভালবেসেছিল মানুষ হিসাবে, মনিব হিসাবে নয়। তাই তারা চিন্তিত হয়, ব্যথিত হয়। কিন্তু বলতে পারে না কিছু।

ডি. এস. পি. প্রবীর গুপ্ত সুখেনের কলেজ জীবনের বন্ধু। সুখেনের রায় শুনে তাকে অভিনন্দন জানাতে এসে বলল—আমি তোমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি সুখেন। বাস্তবিক ঐ জমিদার দেবেন্দ্রনাথের অত্যাচারে সকলে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিল। কিন্তু টাকার জোরে সমস্ত চাপা দিয়ে অহংকার করে বেড়াত। আমি নিজেও অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু কিছু হয় নি। তাকে উচিত সাজা দেওয়ায় আমি খুশী হয়েছি, আনন্দিত হয়েছি বন্ধুগর্বে। May God Crown your effort with brilliant success.

সুখেন পারেনি এই উচ্ছ্বাস সহ্য করতে। চিৎকার করে বলে উঠেছিল—Please let me leave alone. I am tiard.

অবাক হয়ে গিয়েছিল প্রবীর সুখেনের ব্যবহারে। কিন্তু সে কিছু বলবার আগেই সুখেন আবার চিৎকার করে বলে উঠে—Will you go? তোমরা কি আমাকে মেরে ফেলতে চাও? চলে যাও এখান থেকে।

ভয় পেয়েছিল প্রবীর। তাই দীনেশবাবুকে সুখেনের মানসিক অবস্থা জানিয়ে তার কাছে চলে আসবার জন্য চিঠি দেয়।

দীনেশবাবু চিঠি পেয়েই চলে এসেছিলেন। প্রাণাধিক পুত্রের মানসিক অবস্থা দেখে আতংকিত হন। তাকে কোন কথা পর্যন্ত বলতে পারেন না প্রথমে। আরদালীদের কাছে সব খবর শুনেও বুঝতে পারেন না কেন সুখেন হঠাৎ এ রকম ব্যবহার করছে। তাই সেদিন সুখেন কোর্ট থেকে ফিরে এলেই তাকে সান্ত্বনা দেবার উদ্দেশ্যে বলেন—দেখ, এতটা নার্ভাস হলে চলবে না! তুমি আইনের পথে চলতে বাধ্য। সুতরাং অপরাধীকে শাস্তি দিতে ফাঁসীর হুকুম দিয়ে তুমি উচিত বিচার করেছ। এতটা উতলা হবার কোন প্রয়োজন নেই, তুমি একটু....

সুখেন অধৈর্য্য স্বরে তাঁর কথার মাঝে বলে উঠে—তুমি জান না বাবা আমি কি করেছি? আইন মানতে গিয়ে, ন্যায় বিচারক হবার লোভে আমি কল্পনার স্বামীকে ফাঁসী দিয়েছি তা জান?

চমকে উঠেন দীনেশবাবু কল্পনার নামে। মনের কোন এক দুর্বল স্থানে আঘাত লাগে তাঁর। তাড়াতাড়ি বলেন -কোন কল্পনা?

সুখেন একটা ক্লান্ত দীর্ঘশ্বাস চেপে বলে—কল্পনা কে বুঝতে পারছ না বাবা?

ভীষণ চমকে উঠেন দীনেশবাবু। অনেকক্ষণ কথা বলবার শক্তি-টুকুও তাঁর থাকে না। অনেক পরে একটুকু সামলে উঠলে বলেন—বুঝেছি। তাই তুমি এতবড় আঘাত পেয়েছ।

সুখেন তীব্রস্বরে বলে—হ্যাঁ, সেই কল্পনার স্বামীকে আমি ফাঁসী দিয়েছি বিচারক হিসাবে নাম পাব বলে। কল্পনার জীবনকে বলি দিয়েছি নিজের প্রতিষ্ঠা পথে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে। তার বুকের

রক্ত ঝরে পড়ছে আর সকলে আমার প্রশংসা করছে। বাবা, আমি অপরাধী—a murderer. আমার ক্ষমা নেই, কোন ক্ষমা নেই।

দীনেশবাবু সংযত হয়ে সান্ত্বনা দিতে চান পুত্রকে। তার আঘাতের পরিমান ও স্থান বুঝে শঙ্কিত হন। সুখেনকে তার অন্তর্দ্বন্দ্বের যন্ত্রনা থেকে মুক্তি দেবার জন্য বলেন—কিন্তু তুমি তো জেনেশুনে তার বিচার করনি। আর যদি তা করেও থাক তা হলেও তুমি বিচারক হিসাবে ঠিক কাজ করেছ। দুষ্ট পুত্রকে পিতা কি শাস্তি দেন না? সুতরাং কল্পনার স্বামীকে নিজের বোনের স্বামী হিসাবে না দেখে আসামীর দৃষ্টিতে দেখে তুমি আইনকে রক্ষা করেছ, অসহায় দরিদ্রদের অত্যাচার থেকে রক্ষা করেছ। আইন বড় কঠোর সুখেন, কিন্তু তার থেকেও বেশী কঠিন সেই আইনকে যথাযথ মেনে বিচার করা। সেন্টিমেণ্টাল হয়ে লাভ নেই, মনে রেখ তোমার বিচারের ফলে আজ ঐ অসহায় দরিদ্র প্রজারা তোমাকে আশীর্বাদ করছে। তুমি তাদের মুখে হাসি ফুটিয়েছ, আনন্দ দিয়েছ।

—বাবা, তাই ভে.বছিলাম এতদিন। কিন্তু আজ যখন সেই আইনের যথাযথ প্রয়োগ করলাম তখন দেখলাম বিচারক হলেও হৃদয় বলে একটা জিনিষ আমাকে বিপথে পরিচালিত করতে চেষ্টা করছে। কোন কিছুতেই শান্তি নেই। বিচারক হিসাবে যা আমি করলাম মানুষ হিসাবে তা কি করা সম্ভব? বিচারক কি বিবেকশূন্য? দশের হিত-সাধন করতে গিয়ে একজনকে যদি সেই মুক্তিযজ্ঞে বলি দিতে হয় তা হলে সেই একজন কি আমায় দোষ. করবে না?

দীনেশবাবু বলেন—তুমি কয়েক দিনের ছুটি নাও। এখন কিছুদিন বিশ্রাম নেওয়া উচিত। তুমি ছুটির জন্য কালই দরখাস্ত কর।

মনকে বিশ্রাম দেবার প্রয়োজন অনুভব করেই সুখেনকে বাড়ী নিয়ে আসেন তিনি। দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতায় সুখেনের মানসিক আঘাতের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারেন। পূর্বের দুঃখময় জীবনের কথা স্মরনে আতংকিত হন নুতন আঘাতের অশুভ ছায়ায়।

॥ ১৩ ॥

শ্বশুর বাড়ীতে আর থাকতে পারেনি কল্পনা, ফিরে এসেছে বাবার কাছে। স্বামীকে পেয়েছিল মাত্র তিনবছর। এই তিনটি বছর তার জীবনের সমস্ত আশা আনন্দ মেটাতে পারেনি। যৌবনের কামনা বাসনার নিবৃত্তি হয়নি এই কয়েক বছরের মধ্যে। কিন্তু নিষ্ঠুর বিধাতা এরই মধ্যে তার সীমন্ত শূন্য করে দিলেন আর সেই সঙ্গে শূন্য হয়ে গেল তার সমস্ত জীবন। এখন শুধু অতীত স্বপ্ন রোমন্থন করে যে কটা দিন বাঁচা যায় সে দিনগুলি তার দাবী তার আকাঙ্খা কোন কিছুকেই তৃপ্ত করতে পারবে না। সংসারের সমস্ত আনন্দ থেকে সে হলো বঞ্চিতা। বাঙ্গালী বিধবা যুবতী হলেও সংসারে অবহেলিত, অপমানিত। স্বামীকে হারিয়ে শ্বশুর বাড়ীতে বধূর আদর হারাল। সকলেই তার প্রতি অসন্তুষ্ট রুষ্ট। তাদের অনাদর আর অবজ্ঞার মধ্যে থাকতে পারে না কোন সন্থ স্বামীহারা বধূ। তাই চলে এসেছে বাবা-মার আশ্রয়ে।

কিন্তু এ কি হলো ? মাত্র তিন বছরের মধ্যে তার সন্থ জ্বলে উঠা দীপ নিভে গেল কার দোষে ? স্বামীর প্রজাদের উপর অত্যাচারে নিষ্ঠুর ব্যবহারে সকলেই তাকে অভিশাপ দেয় জানে কল্পনা। স্বামীর প্রতি তার পূর্ণ অধিকারও কোন দিন ছিল না কিন্তু তবু সে জানে স্বামী তাকে ভালবাসতো। দেবেন্দ্রনাথ অন্য মেয়েদের প্রতি একটু আসক্ত হলেও ভালবাসতো স্ত্রীকে। কিন্তু সেটুকু সৌভাগ্য বিধাতার সহ্য হলো না। বিধাতার বিচারে নির্দোষী পেল চরম শাস্তি। প্রথম যখন মামলার কথা শুনেছিল সেদিনও আশা ছিল ভরসা ছিল। একবারও ভাবেনি দেবেন্দ্রনাথের বিচার এবার যে করতে বসেছে সে নিষ্ঠুর হাতে তাকে চরম দণ্ড দেবে। বিচারকের কঠোরতার কথা শুনতে পেয়ে একটু

শঙ্কিত হয়েছিল। ভেবেছিল স্বামীকে এবার কারাবরণ করতে হবে। কিন্তু ভাবেনি বিচারক তাকে দেবেন মৃত্যুদণ্ড।

মৃতস্বামীকে নিয়ে আসবার অনুমতি আনতে গিয়েছিল সে নিজে। দেখেছে তরুণ বিচারককে তার আবেদন পত্র পড়ে বিচলিত হতে। কিন্তু সে পারে নি নিষ্ঠুর বিচারকের যুক্তি মেনে নিতে। প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ, রক্তের বদলে রক্ত নিতে হবে এ যুক্তি এ আইন সে মানে না। তাব মনে হয় স্বামীর যদি বিচার হয়ে থাকে হত্যার অপরাধে তাহলে কেন হবে না বিচার এই বিচারকের যে আইনের সাহায্যে হত্যা করল তার স্বামীকে? তাই পারেনি ক্ষমা করতে বিচারককে। সে দিয়েছে অভিশাপ—নিষ্ঠুর অভিশাপ। যে জীবন নষ্ট হলো বিচারকের লেখনীতে সেই ভাবেই নষ্ট হোক বিচারকের জীবন—এই কামনা করেছে সে।

কল্পনার মনে পড়ে স্বামীব জন্য সে প্রচর টাকা খরচ করেছে। প্রচুর টাকা দিয়েছে সাক্ষীদেব। কিন্তু কোনরকমেই অঘোর পণ্ডিতকে পারেনি তার স্বপক্ষে টানতে। কিনতে পারেনি অঘোর পণ্ডিতের সত্য। সে নিজে গিয়েছিল অঘোর পণ্ডিতের কাছে। স্বামীকে ছোটবেলায় তিনি পড়িয়েছেন জেনে নিজে গিয়েছিল তাঁর কাছে। কিন্তু সেই নির্ভিক মানুষটিকে কোন কিছুতেই তাঁর কর্তব্য চ্যুত করতে পারেনি। হেরে গিয়েছিল কল্পনা তাঁর কাছে। হেরে গিয়েছিল তাঁর দারিদ্র্যের কাছে। নাহলে যে মানুষ দু'বেলা ভাল করে খেতে পর্যন্ত পায় না সে এক কথায় প্রত্যাখান করে দশ হাজার টাকার প্রলোভন। সেই প্রথম বুঝতে পেরেছিল কল্পনা টাকা দিয়ে কেনা যায় না এমন মানুষও আছে এ সংসারে। অঘোর পণ্ডিতের সাক্ষ্য শুনে সে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল, ভয় পেয়েছিল। সেদিন বুঝতে পেরেছিল তার স্বামী এবার সাজা পাবেই।

সুদর্শন স্বামীকে পেয়ে কল্পনা তৃপ্ত হয়েছিল। জমিদারের ছেলে দেবেন্দ্রনাথ বি.এ. পাশ করে বিষয় সম্পত্তি দেখা শোনা করছিল। শিক্ষিত, বিত্তবান সুদর্শন স্বামী পেয়ে ভেবেছিল তার কুমারী জীবনের আরাধনা সার্থক। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই বুঝেছিল গোলাপের কাঁটা ফুলের মত কোমল নয়। তবু সান্ত্বনা ছিল তার মনে এই ভেবে স্বামী

মগুপ, অন্য স্ত্রী আসক্ত বলেও তাকে ভালবাসে। তাই স্বামীর সব অপরাধ ক্ষমা কবতে পেরেছিল নিঃসংকোচে। কিন্তু পারল না তাকে ধবে রাখতে। অল্পবয়সে প্রচুর টাকা আর কুসঙ্গীতে দেবেন্দ্রনাথ বিসর্জন দিয়েছিল চরিত্র আর পেয়েছিল অত্যাচার করবার স্পৃহা। তাই অবিনাশ যখন তাকে বাধ্য হয়েই একটু চড়া মেজাজ দেখিয়েছিল তখন সহ্য করতে পারে নি দেবেন্দ্রনাথ। চিরদিন মেজাজ দেখিয়ে এসেছে, সুতরাং অপরের মেজাজ সহ্য করা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই সুযোগ পেয়ে শোধ নিয়েছে অপমানের। কিন্তু ভাবতে পারে নি যে সে ধরা পড়ে যাবে আর শুধু তাই নয় অপরাধের শাস্তিও পাবে। টাকার ক্ষমতায় বিশ্বাসী দেবেন্দ্রনাথ গুলি করেছিল অবিনাশকে নিজেব অপমানের প্রতিশোধে। কিন্তু যে দিন তার সে ভুল ভাঙ্গল সেদিন কল্পনার মনে আছে শাস্তিব আশংকায বিবর্ণ হয়ে উঠেছিল দেবেন্দ্রনাথ। সে দিন স্বামীর ব্যাকুল প্রার্থনায় কল্পনা ছুটে গিয়েছিল অঘোব পণ্ডিতেব কাছে। স্বামীব চিৎকাব আজও কানে বাজছে কল্পনার। চিৎকার করে বলেছিল—'আমায এবার বাঁচাও কল্পনা। শুধু এই বারটি আমাকে রক্ষা কর। আমি কথা দিচ্ছি জীবনে আর কোনদিন কোন অন্যায় করব না।' কিন্তু পাবে নি কল্পনা তাকে বাঁচাতে।

দিনরাত ভাবনায় চিন্তায় কল্পনা শুকিয়ে যায়। শৈলেশবাবু দেখেন তাঁর আদরের মেয়ের মরুময় জীবন আর দোষী কবেন নিজের ভাগ্যকে। স্ত্রীর আপত্তি ছিল মেয়ের বিয়ে দেবাব ওখানে কিন্তু শৈলেশবাবু তাঁব কথায় বিদ্রুপ করেছিলেন। জিদ কবেই বিয়ে দিয়েছিলেন বড়লোকের ঘরে। একমাত্র মেয়ে সুখী হোক্ এই কামনায় টাকাব পবিমাণ দেখেছিলেন, দেখেন নি চরিত্র দোষ। কিন্তু কল্পনার বিধবা বেশ দেখে তিনি ভুল বুঝতে পাবেন। ভুল কবেছিলেন তিনি স্ত্রীর নিষেধ না শুনে। কিন্তু বড় দেরীতে ভাঙ্গল সে ভুল। কল্পনা দিন দিন না খেয়ে না ঘুমিয়ে অসুখ বাধিয়ে ফেলল। প্রথমটা সে চেপে রাখতে চেয়ে ছিল। ভেবেছিল বাবা-মাকে আর জ্বালাতন করবে না, বিব্রত করবে না। কিন্তু তা হলো না। অসুখ বাঁকা পথ ধরে বেড়ে চলতেই

শৈলেশবাবু অস্থির হয়ে উঠলেন। স্থানীয় ডাক্তাররা বললেন কলকাতায় নিয়ে যেতে। তাঁদের উপদেশ শুনেই শৈলেশবাবুর মনে পড়ে দীনেশবাবু সুখেনের কথা। তাঁর জিদে অনিচ্ছা থাকলেও শেষ পর্যন্ত যেতে রাজী হতে হলো কল্পনাকে। ঠিক হলো দীনেশবাবুর কাছেই উঠবেন তাঁরা। শৈলেশবাবুর স্ত্রীও খুশী হলেন নমিতাদেবীকে, সুখেনকে দেখতে পাবেন বলে।

কল্পনা খুশী হয় অনেকদিন পর তার শ্রদ্ধার দাদাকে দেখতে পাবার সম্ভাবনায়। অনেকটা সুখেনকে দেখবার ইচ্ছাতেই রাজী হয়েছিল কলকাতা যেতে। জীবনে তার প্রয়োজন নেই, কিন্তু মা-বাবার জন্য মৃত্যুও কামনা করতে পারে না কল্পনা। তাই ঠিক করল সুখেনকে বলবে তার দুর্ভাগ্যের কথা, উপদেশ চাইবে আর চাইবে বেঁচে থাকবার জন্য কাজের সন্ধান।

শৈলেশবাবুর টেলিগ্রাম পেয়ে খুশী হন দীনেশবাবু। সুখেনের মানসিক দ্বন্দ্ব তিনি জানেন। বুঝেছেন কল্পনার মুখ থেকে শুনতে চায় তার ক্ষমা। কল্পনা এলে সে সম্ভাবনা আছে। কল্পনা সুখেনকে ক্ষমা করবেই। সুখেন যেমন কল্পনার জীবনের জন্য অনুতপ্ত তেমনি কল্পনাও নিশ্চয়ই চাইবে সুখেনের সত্যরক্ষায় সাহায্য করতে। তাই তাদের আসার সংবাদে খুশী হন তিনি।

দুপুরে এসে পৌঁছালেন শৈলেশবাবু কল্পনা ও কুমুদদেবী। প্রথমটায় দীনেশবাবুকে চিনতে পারেন নি তাঁরা? চিনতে পারেন নি বৃদ্ধ দীনেশবাবুকে। কল্পনাই প্রথম চিনতে পারে দীনেশবাবুকে। ছুটে এসে প্রণাম করে বলে—একি চেহারা হয়েছে আপনার?

কল্পনাকে বুকে জড়িয়ে ধরে দীনেশবাবু বললেন—বয়স হয়েছে না? কিন্তু তোর শরীর এত খারাপ হল কেন?

কল্পনা উত্তর দিল না এ প্রশ্নের। একটু চুপ করে থেকে বলল—জ্যাঠাইমা কোথায়?

দীনেশবাবু একটু বিচলিত হয়ে বললেন—সে নেই। তোরা চলে যাবার কিছুদিন পর স্বর্গে চলে গেছে।

` শৈলেশবাবু ও কুমুদদেবী চমকে উঠলেন। কল্পনাও চমকে উঠল একথা শুনে।

অনেকক্ষণ পরে শৈলেশবাবু বললেন—সুখেনকে দেখছি না, সে কোথায় ?

সুখেনের নাম শুনে দীনেশবাবু একটু চমকে উঠলেন। আমতা আমতা করে বললেন—এই ত এখানে ছিল, কি জানি কোথায় গেছে ?

মনে মনে শংকিত হলেন দীনেশবাবু' একটা জটিল প্রশ্নের সমাধান হবে কি হবে না এই চিন্তায় তাঁর সমস্ত শরীর অবস হয়ে গেল। একবার চাইলেন কল্পনার দিকে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চোখ নামিয়ে নিতে বাধ্য হলেন। পারলেন না ঐ নিষ্পাপ করুণ মুখের দিকে তাকাতে। কিন্তু আজ ঐ যুবতী বিধবাই পারে তাঁর সকল চিন্তা থেকে তাঁকে রক্ষা করতে। তার একটা মুখের কথার উপর নির্ভর করছে তাঁর ছেলের, একমাত্র ছেলের জীবন। সুখেন কি পাবে তার ক্ষমা ? পারবে কি কল্পনা তাঁকে বাচাতে. তাঁর আদরের সুখেনের সত্যরক্ষার সহায়ক হতে ?

দীনেশবাবুর চিন্তাক্লিষ্ট মুখ দেখে কৃষ্ণা বুঝতে পারে তাঁর মনের দ্বন্দ্ব। সে কল্পনাকে টেনে নিয়ে যায় নিজের কাছে। শৈলেশবাবু ও কুমুদদেবীকেও বিশ্রাম করবার জন্য অনুরোধ করে কৃষ্ণা। তার কথায় দীনেশবাবুও কিছুটা সংযত হয়ে তাঁদেরকে বিশ্রাম করতে বলেন।

কৃষ্ণার সঙ্গে সকলের পরিচয় করিয়ে দিয়ে সবে দীনেশবাবু চেয়ারে বসেছেন এমন সময় সুখেন প্রবেশ করে ঘরে। উস্কো-খুস্কো একমাথা চুল, রুক্ষ রক্তবর্ণ চোখ প্রমাণ দিচ্ছে তার মনের অস্থিরতার। কিন্তু ঘরে ঢুকেই সে কল্পনাকে দেখে একেবারে পাথর হয়ে যায়। এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকে কল্পনার দিকে।

কল্পনা প্রথমটা দেখতে পায়নি সুখেনকে, কিন্তু কৃষ্ণা সুখেনকে ডাকতেই সে দেখতে পেল সুখেনকে। দেখেই চমকে উঠল কল্পনা। এই তো সেই লোক যাকে সে দেখেছে বিচারকের আসনে বসে থাকতে। হ্যাঁ, সেই লোক এ, কোন ভুল নেই। তবে কি সুখেনদাই সেই

বিচারক? তার স্বামীহন্তা! অকালে তাকে পড়িয়েছে বৈধব্যের সাজ! আর থাকতে না পেরে চিৎকার করে উঠে কল্পনা—'তুমি. তুমি সুখেনদা আমার স্বামীকে ফাঁসী দিলে?' বলেই অজ্ঞান হয়ে যায় কল্পনা। তার দেহটা আছাড় খেয়ে পড়ে সুখেনের পায়ের কাছে।

কল্পনার কথাশুনে সকলেই চমকে উঠেন। কিন্তু সে পড়ে যেতেই সকলে ছুটে আসেন তার কাছে। সুখেন তখনও চুপ করে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে কল্পনার মূর্চ্ছিত দেহের দিকে। কৃষ্ণার কথায় তার সংজ্ঞা আসে, কৃষ্ণা তাকে ঠেলে বলে—'তাড়াতাড়ি বাবাকে ডেকে আন সুখেনদা, চুপ করে দাঁড়িয়ে থেক না।'

ডাক্তাববাবুকে সঙ্গে নিয়ে যখন ফিরে এল তখনও কল্পনার জ্ঞান হয়নি। ডাক্তারবাবু তাকে পরীক্ষা করেই বললেন—ভয়ানক আঘাত পেয়েছে। তা ছাড়া বোধ হয় কল্পনা সন্তান বহন করছে। তাড়াতাড়ি একে হাসপাতালে পাঠাতে হবে। সুখেন, তুমি হাসপাতালে ফোন কর অ্যাম্বুলেন্সের জন্য।

তাঁর কথায় শৈলেশবাবু বললেন—সে কি? কল্পনা তো কিছু বলে নি। কিন্তু ডাক্তারবাবু বিপদ নেই তো কোন?

ডাক্তারবাবু তাঁকে সান্ত্বনা দেন কোনরকমে। হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করে তিনিও গেলেন সঙ্গে। শৈলেশবাবু দীনেশবাবুও গেলেন তাঁর সঙ্গে। সুখেনও গেল তাঁদের সঙ্গে হাসপাতালে। শুধু কৃষ্ণা থাকল কুমুদদেবীর কাছে।

হাসপাতালে নিয়ে যেতেই ওখানকার ডাক্তার পরীক্ষা করেই বললেন—অপারেশন করতে হবে। পেটের সন্তান নষ্ট হয়ে গেছে মনে হচ্ছে। সুতরাং বর্তমানে অপারেশন করে বাঁচাতে হবে এঁকে।

সকলে সম্মতি দিতেই কল্পনাকে নিয়ে যাওয়া হল অপারেশন থিয়েটারে। সুখেনের সে কি আর্তি! বারবার ডাক্তারদের বলে ওকে বাঁচিয়ে দিন ডাক্তারবাবু। যত টাকা লাগে আমি দেব, শুধু ওকে বাঁচিয়ে দিন আপনারা। যেমন করেই হোক্ ওকে বাঁচিয়ে তুলুন আপনারা।

কল্পনাকে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাবার প্রায় ঘণ্টা তিনেক পরে সার্জেনরা অপারেশন করে ফিরে এলেন। সুখেন ছুটে গিয়ে তাঁদেরকে ব্যাকুল ভাবে জিজ্ঞাসা করে—অপারেশন কেমন হোল? ও বাঁচবে ত?

ডাক্তারদের মধ্যে একজন তাকে অভয় দিয়ে বলেন—খুব সাকসেসফুল অপারেশন হয়েছে। কোন ভয় নেই, কয়েক ঘণ্টার মধ্যে জ্ঞান ফিরবে।

একটু পরে কল্পনার অজ্ঞানদেহটা স্ট্রেচারে করে কেবিনে নিয়ে গেল। সুখেন ঐ সঙ্গে কেবিনের দিকে যাচ্ছিল। কিন্তু ডাক্তারবাবু তাকে বারণ করলেন। তাঁর কথায় অনেকটা বাধ্য হয়েই সুখেনকে বাড়ী যেতে হোল। দীনেশবাবুও তার সঙ্গে বাড়ী গেলেন।

বাড়ী আসতেই কৃষ্ণা সুখেনকে অপারেশনের কথা জিজ্ঞাসা করে। কিন্তু সুখেন যেন শুনতেই পায় না তার কথা। অস্থির মনে সুখেন নিজের ঘরে গিয়ে চুপ করে বসে থাকে। কি যে সে ভাবছে তা সে নিজেই জানে না। তার চোখের সামনে শুধু ভাসে কল্পনার বিদ্রোহীরূপ।

ডাক্তারবাবুর কথামত দীনেশবাবু কৃষ্ণাকে পাঠিয়ে দিলেন হাসপাতালে। সেখানে সেই থাকবে ডাক্তারবাবুর সাথে কল্পনার জ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত। ডাক্তারবাবু দীনেশবাবুকে সুখেনের প্রতি কড়া নজর রাখতে বারবার বলে দিয়েছেন। বলেছেন—এখন ওর যে রকম মানসিক অবস্থা আপনি একটু নজর রাখবেন ওর দিকে। কোন কথা জিজ্ঞাসা করবেন না, আর এখন ওকে হাসপাতালে আসতে দেবেন না।

সমস্ত রাতটা কোনরকমে কাটল। কেউ একটুও কথা বলতে পারল না। পারল না কেউ আগের মত সহজ ভাবে কথা বলতে দীনেশবাবু বুঝতে পারলেন শৈলেশবাবুরাও আর আগের মত ব্যবহার করতে পারবেন না তাঁদের সঙ্গে। সৌহার্দ্যের সূতা ছিঁড়ে গেছে একটা কঠিন কঠোর আঘাতে। না হলে যে সুখেনকে এত ভালবাসতেন কুমুদদেবী তিনিও এখন পর্যন্ত কোন কথা বলেন নি সুখেনকে। আর সুখেনও পারেনি তাঁদের সামনে বার হতে।

পরের দিন সকালেই কৃষ্ণা ফোন করে জানাল জ্ঞান ফিরছে কল্পনার। সুখেন দীনেশবাবুর কাছে এ খবর পেয়েই ছুটে গেল হাসপাতালে। কিন্তু কেবিনে ঢুকতে পারল না। কোন রকমেই পারল না কল্পনার কাছে গিয়ে দাঁড়াতে। একটা অব্যক্ত বেদনার তীব্র ব্যথায় চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল কেবিনের সামনে। ডাক্তারবাবু বাড়ী আসতে গিয়ে কেবিন থেকে বার হয়েই তাকে দেখে অবাক হয়ে যান। বলেন—এখানে দাঁড়িয়ে আছ তুমি? কল্পনা এখন অবশ্য অনেকটা ভাল। তুমি দেখা করবে তার সঙ্গে?

সুখেন মলিন মুখে বলে—না, দেখা আমি করতে পারব না। কিন্তু আর কোন বিপদ নেই তো তার?

ডাক্তারবাবু অভয় দেন তাকে। বলেন—ভয় নেই কোন। চল এখন বাড়ী যাই, পরে আবার আসব।

কিন্তু সুখেন রাজী হয় না। সে বলে—না, আমি এখন একটু এখানেই থাকি।

কৃষ্ণা ইতিমধ্যেই কেবিন থেকে বেড়িয়ে এসে তাঁদের কথা শুনছিল। সে এবার এগিয়ে এসে বলে—তুমি এখানে থেকে কি করবে? আমি তো এখন আছি। এখন বাড়ী যাও পরে বাবার সঙ্গে আবার এস।

তার কথায় কিছুটা অনিচ্ছা থাকলেও শেষ পর্যন্ত বাড়ী যায় সুখেন।

কিছুতেই সহজ হতে পারে না সুখে । বাড়ী আসতেই শৈলেশবাবু তাকে জিজ্ঞাসা করলেন কল্পনার কথা কিন্তু কোন উত্তর না দিয়েই চলে গেল নিজের ঘরে। আত্ম-ধিক্কার আর আত্ম-সমালোচনায় সুখেন পারে না সহজ ভাবে সকলের সঙ্গে মিশতে। নিজেকে সব সময় মনে করে দোষী, আর তাই অপরাধী মন নিয়ে নিজে'ক ঘরে আবদ্ধ রাখে। মন আর বিবেকেব যুদ্ধে হয় পরিশ্রান্ত, পরাজিত।

তাই শেষটায় একরকম মরীয়া হয়েই সেদিন গেছিল কল্পনার কাছে। কল্পনা তখন গল্প করছিল কৃষ্ণার সঙ্গে। সুখেন আস্তে আস্তে গিয়ে দাঁড়াল কল্পনার মাথার কাছে। কৃষ্ণা সুখেনের আসার খবর

বলতেই কল্পনা দেখল সুখেনকে। তার চিরদিনের শ্রদ্ধার গর্বের দাদাকে। কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ কল্পনা অদ্ভুতভাবে চিৎকার করে উঠল—সুখেনদা, তুমি আমাকেও কেন মেরে ফেললে না ঐ সঙ্গে? কেন, কেন তুমি এ শাস্তি দিলে আমাকে? কি অন্যায় আমি করেছি, কোন অপরাধের শাস্তি দিলে তুমি আমায়? না, না, তুমি যাও, তুমি চলে যাও। না হলে তুমি আমাকেও মেবে ফেলবে। চলে যাও তুমি আমার সামনে থেকে। মানুষের প্রাণ নিয়ে গর্ব কর গিয়ে তোমার বিচারেব, তোমার বুদ্ধির। কিন্তু আমি তোমাকে ক্ষমা করব না, কোনদিন না। যে শাস্তি পেয়েছি তার শত সহস্র গুণ বড় শাস্তি তুমি পাবে—নিশ্চয়ই পাবে। আর তোমার সেদিনের সেই দুর্দশা দেখে আমি পাব শান্তি। দূর হও নিষ্ঠুর পিশাচ। তোমাব সঙ্গে কথা বলাও পাপ। দূর হয়ে যাও তুমি আনার সামনে থেকে।

তার চিৎকারে ছুটে আসেন ডাক্তার, নার্সরা। কল্পনা তখনও উত্তেজনায় থর থর করে কাঁপছে আর স্থানুর মত দাঁড়িয়ে আছে সুখেন। সুখেনকে দেখে বোগীর এ অবস্থা হয়েছে শুনে ডাক্তারবাবু সুখেনকে বললেন—আমাকে ক্ষমা করবেন, আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি আপনার উপস্থিতি যখন পেসেণ্টের কাম্য নয় তখন আপনি বাইরে যান। আর কোনদিন এ ভাবে তাঁকে বিরক্ত করবেন না।

সুখেনের কানে যায় না ডাক্তারবাবুর কথা। সে যেন তার সমস্ত বোধশক্তি হারিয়ে ফেলেছে। এত বড় নিষ্ঠুর আঘাত কল্পনা তাকে করতে পারে, অন্ততঃ তারই মুখের উপর এতবড় রূঢ় কথা বলতে পাবে তা সুখেন স্বপ্নেও ভাবতে পারে না। তাই একেবারে পাথরের মত নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সে।

ডাক্তারবাবু এবার তাকে বেশ একটু কঠিন স্বরে বললেন—দয়া করে বাইরে যান। না হলে পেসেণ্টের ক্ষতি হলে আপনাকেই দায়ী করব আমি।

কৃষ্ণা এতক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। এবাব আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে সুখেনের হাত ধরে তাকে বাইরে নিয়ে গেল। বাইরে এসে সুখেন

যেন কিছুটা প্রকৃতস্থ হল। কৃষ্ণাকে কল্পনার কাছে যেতে বলে ধীরে ধীরে চলে গেল হাসপাতাল ছেড়ে।

গেটের বাইরে গিয়ে চুপ করে দাঁড়াল সুখেন! এতক্ষণে সে ফিরে পেয়েছে বোধশক্তি। বুঝল জীবনে আর কোন দিন সে কল্পনার সামনে যেতে পারবে না, কল্পনা পারবে না তার উপস্থিতি সহ্য করতে। আর বুঝল কল্পনা পারবে না তাকে ক্ষমা করতে—না, কোন দিনই সে ক্ষমা করবে না তার স্বামী হন্তাকে। একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস বেড়িয়ে এল তার বুক থেকে। সুখেন দেখল গেটের বাইরে অনেকগুলো কুকুর ভেতরে যেতে চাইছে, কিন্তু বার বার তাড়া খেয়ে দৌড়ে পালাচ্ছে। দেখেই সুখেনের মনে হয় সেও ঐ রকম তাড়া খেয়ে চলে এসেছে কল্পনার কাছ থেকে। তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে ডাক্তার, নার্সরা।

দীনেশবাবুরা কল্পনাকে দেখতে আসছিলেন। গেটের কাছে সুখেনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তারা একটু অবাক হয়ে যান। দীনেশবাবু তার কাছে এসে বলেন—কি ব্যাপার? তুই এ ভাবে এখানে দাঁড়িয়ে? চল, ভিতরে চল।

তাঁর কথা শুনে সুখেন ফিরে তাকাল। দেখতে পেল কুমুদদেবী তার দিকে একবার তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিলেন আর শৈলেশবাবু উল্টো দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে যেন তাকে দেখতেই পাননি এ ভাব দেখাচ্ছেন। বুঝতে পারল তাকে তাঁরাও ক্ষমা করবেন না, তাঁদের একমাত্র মেয়ের জীবন যে ব্যর্থ করে হ তাকে ঘৃণা করেন তাঁরা।

দীনেশবাবু তাই আবার যখন তাকে ভিতরে যাবার কথা বললেন তখন সুখেন আর্ত্তকণ্ঠে বলে উঠল—'না, না, আমি যাব না, আমি যেতে পারব না।' বলেই তাড়াতাড়ি পা বাড়াল বাড়ীর দিকে।

সারা পথ বিবেকের সঙ্গে যুদ্ধ করে সুখেন। সে যা করেছে তা গরীবের পক্ষ থেকে তাদেরকে অত্যাচার মুক্ত করবার জন্য করেছে। অন্যায় করলে তার শাস্তি পেতেই হবে। কেন দেবেন্দ্রনাথ ঐ রকম উচ্ছৃঙ্খল ছিল? কেন সে খুন করল একজন গরীব প্রজাকে তার নিজের জিদ আর প্রতিপত্তি বজায় রাখতে? কি করেছিল ঐ সামান্য

লোকটা তার কাছে যে তাকে একেবারে খুন করে ফেলতে হবে? সুখেন আইনের চোখে যা ভাল বুঝেছে, যে শাস্তি সেখানে লিখিত আছে সে ত সেই শাস্তি দিয়েছে তাকে। কোন আক্রোশ নয়, প্রতিহিংসা নয়। না, সে ঠিক করেছে ফাঁসী দিয়ে। নিরপরাধ লোকদের স্বপক্ষে তাকে দাঁড়াতেই হবে, বিচার করতে বসে ন্যায় বিচার করা বিচারকের কর্তব্য। বিচারের প্রহসন করা ন্যায়তঃ অপরাধ। নিজের লোক মনে করে যদি দোষীকে শাস্তি দিতে না পারে তাহলে কোথায় তার ন্যায় বিচারের অধিকার? আজ কল্পনার জীবন যেমন বিপর্যস্ত ঠিক তেমনি বিপর্যস্ত ঐ গরীব লোকটার সংসার। তা' হলে কোথায় তার অপরাধ? কি দোষ সে করেছে কল্পনার কাছে? বিচারকের কাছে তুচ্ছ হৃদয় বৃত্তির কোন স্থান নেই।

কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে হয়—না, বিচারক হিসাবে সে গর্ব করতে পারে ঠিক কিন্তু তার বাইরেও একটা জীবন আছে। আর সেখানে সে দোষী। সে অপরাধী জীবনের বিনিময়ে জীবন নেবার প্রথার কাছে। তার জন্যই আজ কল্পনা বিধবা—আজীবন বেঁচে থাকবে শুধু নিরাশা নিয়ে। তার জন্যই কল্পনা হারাল তার সন্তান—নারী জীবনের শ্রেষ্ঠ গৌরব চিহ্ন। না, সে হত্যা করল তার ভবিষ্যতকে, তার সন্তানকে, তার স্বামীকে। সে অপরাধের শাস্তি তাকে পেতেই হবে। সে অভিযুক্ত জীবনের আদালতে, আর সর্বশক্তিমান বিচারক নিশ্চয়ই দেবেন তার এই পাপের শাস্তি, হোক্ না কেন অজান্তে অনিচ্ছায় তবু অন্যায় তো সে করেছে। সে শাস্তির স্বরূপ কি সে নিজে বিচারক হয়ে বুঝতে পারছে না?

কিন্তু উপায়? কোন উপায়ে, কি ভাবে পাবে মুক্তি, পরিত্রাণ! হ্যাঁ, এতক্ষণে পেয়েছে মনমত উপায়ের সন্ধান। সব যন্ত্রনার সব জ্বালার পরিসমাপ্তি হবে, পাবে মুক্তির চরম স্বাদ। কিন্তু, দ্বিধা জাগে মনে। ঠিক করছে কি সে? অপেক্ষা করলে হয় না? হয়ত পাবে কল্পনার ক্ষমা দীর্ঘদিন পরে। কিন্তু না, সে পরিশ্রান্ত, আর পারে না প্রতিনিয়ত বিবেকের দংশন সহ্য করতে। এবার তাকে বিশ্রাম নিতেই হবে—কর্মক্লান্ত জীবনে প্রয়োজন বিশ্রামের।

॥ ১৪ ॥

সুখেন চলে যাবার পর কৃষ্ণা কল্পনার কাছে যায়। ডাক্তার ও নার্সদের চেষ্টায় সে তখন কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠেছে। কৃষ্ণাকে কল্পনার দিকে লক্ষ্য রাখতে বলে ডাক্তাররা চলে যান।

কৃষ্ণা আহত হয়েছে কল্পনার ব্যবহারে। সে দেখেছে সুখেনকে অনুশোচনার জ্বালায় দগ্ধ হতে, অস্বাভাবিক যন্ত্রনায় ছটফট করতে। দেখেছে কল্পনার প্রতি তার স্নেহ, ভালবাসা। তাই কল্পনার আক্রমনকে ক্ষমা করতে পারে না কৃষ্ণা। প্রিয়জনের অপমান তাকে ব্যথিত করে।

কল্পনাও হয়ত বুঝতে পেরেছে কৃষ্ণার মনের কথা। তাই কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে উঠতেই সে কৃষ্ণাকে ডাকে তার কাছে। কৃষ্ণা কাছে এসে বসতেই তার দিকে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে কল্পনা। তারপর আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করে—সুখেনদা চলে গেছে ?

কৃষ্ণা একটু ক্ষোভের সঙ্গে বলে—হ্যাঁ, চলে গেছেন। কিন্তু তুমি তাকে এভাবে তাড়িয়ে দিলে কেন ? তোমার জন্য যে প্রায় পাগলের মত হয়ে গেছে তাকে এতটা আঘাত না দিলেও পারতে। তাকে যদি ক্ষমা করতে না পেরে থাক তাহলে তাকে কটু কথা না বলে অন্ততঃ চুপ করে থাকলেও পারতে। কী প্রয়োজন ছিল সকলের সামনে তাকে এভাবে অভিশাপ দেবার ? কোন্ অধিকারে তুমি তাকে দাদা বলে ডেকেও তার সর্বনাশ কামনা করছ ?

কল্পনা বোঝে কৃষ্ণার দুঃখ, তার আঘাতের পরিমান। কল্পনার দু'চোখ বেয়ে জল বার হয়ে আসে, কোন বাধা মানে না। আস্তে আস্তে বলে—আমায় ক্ষমা কর বোন। কী জানি তখন আমি কি রকম হয়ে

গেলাম। কী যে বলেছি ভাল করে মনেও নেই। কিন্তু বিশ্বাস কর এ আমার অন্তরের কথা নয়। মুখের কথাটা যদি অন্তরের কথা বলে মনে কর তাহলে আমাকে ভুল বুঝবে। আমি কি পারি সুখেনদাকে অভিশাপ দিতে? তাকে আমার কাছ থেকে দূর করে দিতে? যা বলে'ছ তা ভুল, সম্পুর্ণ ভুল।

কৃষ্ণা সাগ্রহে বলে—তা হলে তুমি ক্ষমা করলে সুখেনদাকে? বল, সত্যিই কি ক্ষমা করেছ তাকে?

কল্পনা জলভরা চোখে উত্তর দেয়—ক্ষমা? আমি ক্ষমা কববার কে? কিসের জন্যই বা তিনি ক্ষমা চাইবেন? আমার স্বামীকে ফাঁসী দিয়েছেন, বিচার কবেছেন এই অপরাধে কি তিনি ক্ষমা চাইবেন আমাব কাছে? কিন্তু তিনি তো অপরাধী নন। মানুষের কল্যাণে যে শক্তি নিয়োজিত তাকে কেমন করে আমি অপবাধ বলব? হ্যাঁ, আমি স্বামীকে হারিয়েছি। হয়ত এ জীবনের অনেক কিছুই আমি হারালাম। কিন্তু তার জন্য, সামান্য একটা নারীব জন্য কেন অপরাধী হবে মানুষের কল্যাণকামী মুক্তি যোদ্ধা? নিজের স্বার্থে আঘাত লাগায় ক্ষণেকের জন্য তাঁকে হয়ত দোষী বলেছি, অবিবেচক বলেছি। কিন্তু তাই বলে কি মুখের কথাটাই হবে সত্যি? অন্তরের আকুতির, ভক্তির কোন দাম নেই? কৃষ্ণা, তুমি ডেকে নিয়ে এস সুখেনদাকে আমার কাছে। বল গিয়ে তাকে দাদার সত্য রক্ষার গর্বে গর্বিত বোন তাকে প্রণাম করবাব ইচ্ছায় ডেকেছে। তার জীবনের বিজয় গৌরবে তুচ্ছ স্বার্থের মোহে পিছিয়ে থাকবে না তার বোন। বল গিয়ে তাঁকে মিথ্যা অভিমান করে ভুল বুঝে দূরে সবে থাকলেই কি দূবে থাকা হয়? ক্ষমা চাইবার মত কোন অপরাধ তিনি করেন নি। কিন্তু তবু যদি ক্ষমা চাইতে হয়, ক্ষমা কবেছি শুনলেই যদি তিনি তৃপ্ত হন তবে বল গিয়ে তাঁকে ক্ষমার মূলমন্ত্র যে তাঁর কাছেই শিখেছি আমি। দাদার জয় গৌরবের উজ্জ্বল পতাকা নিয়ে আমিই তাঁকে জানাব আমার অন্তরের শ্রদ্ধার্ঘ।

আনন্দে তৃপ্তিতে কৃষ্ণা জড়িয়ে ধরে তাকে। বলে—আমি এক্ষুনি

ডেকে আনছি তাকে। বলব—এসো, বোনের জয়টিকা পড়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াও—দূর কর অনাচার আর অত্যাচার।

দীনেশবাবুও খুশী হন কল্পনার কথায়। নিজের আনন্দ আর চেপে রাখতে না পেরে উচ্ছ্বাসে বলে উঠেন—তুমি তাকে ক্ষমা করলে শুনে কি আনন্দই না হচ্ছে। সত্যিই মা, সেদিন থেকে ওর মুখের দিকে তাকাতে পারিনি। ভুল মানুষ মাত্রেই করে। ও জানত না দেবেন্দ্রনাথ তোমার স্বামী। তাই যেদিন জানল সেকথা সেদিন থেকেই সুখেন অনুতপ্ত। তোমার ক্ষমা পেয়ে সুখেন আবার সুস্থ হয়ে উঠবে।

কৃষ্ণা বলে—যাই আমি সুখেনদাকে ডেকে নিয়ে আসি। বোধহয় বাড়ী চলে গেছেন।

দীনেশবাবু বললেন—আসবার সময় দেখলাম ও গেটের কাছে দাঁড়িয়ে আছে পাগলের মত। এখানে আসবার কথা বলতেই ছুটে চলে গেল।

কৃষ্ণা বলল—বুঝেছি। যাই আমি তাঁকে খবর দিয়ে বলি কল্পনাদি তোমাকে ডাকছেন! তোমায় প্রণাম করতে চান কল্পনাদি—তোমার বোন।

তাড়াতাড়ি বাড়ীর দিকে চলে কৃষ্ণা। আনন্দে, খুশীতে সে যেন ছুটে যেতে চায়। নিজের প্রিয়তমের গৌরবে, বিজয়গর্বে গর্বিতা নারী যায় তার আপন জনকে খবর দিতে।

বাড়ী আসতেই চাকরের সঙ্গে দেখা, তাকে জিজ্ঞাসা করতে সে বলে—দাদাবাবু তো অনেকক্ষণ এসেছেন। এসেই নিজের ঘরে গিয়ে কি যেন লিখতে লাগলেন। আমি খাবার কথা বলতেই বললেন এখন খাবেন না।

আনন্দের খবর দিয়ে চমকে দেবার জন্য আস্তে আস্তে সুখেনের ঘরের দিকে যায় কৃষ্ণা। দরজার আড়াল থেকে দেখে বিছানায় শুয়ে আছে সুখেন। ঘুমন্ত সুখেনকে দেখে মায়া হয় তার, কিন্তু ডেকে খবর দিতেই হবে তাকে। কল্পনাদির ক্ষমা সুখেনকে দেবে তৃপ্তি, সম্মান আর

দৃঢ়তা। আস্তে আস্তে এগিয়ে যায় কৃষ্ণা সুখেনের কাছে। ডাকতে গিয়েই দেখে একটা চিঠি সুখেনের হাতের কাছে। নিতান্তই কৌতুহলে তুলে নেয় চিঠিটা, দেখে তাকেই লেখা চিঠি। সুখেন লিখেছে তাকে। তাড়াতাড়ি পড়ে কৃষ্ণা সুখেন লিখেছে—

কৃষ্ণা,

আমার জীবনের সাধ ছিল মানুষ হবার, মহৎ হবার। জীবনের কয়েকটা মাত্র ব্রত উদ্‌যাপন করে, কয়েকটা মাত্র আদর্শ দৃষ্টান্তের মাঝে শুধু আত্মসুখ নয়, জীবনের শেষে মৃত্যুতেও মানুষের স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে থাকবার ইচ্ছাই ছিল আমার সাধনা। তাই নিজেকে সে ভাবে গড়ে তুলতে, সেই পরিবেশ সৃষ্টিতে, মনের উদারতা আর পবিত্রতায় জীবনের মাঠে মানুষের কল্যাণ ও শান্তির ফসল ফলাবার চেষ্টায় অগ্নিশুদ্ধ হবার দীক্ষা নিতে চেয়েছিলাম। দর্পণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হলেই তাতে পরিস্ফুট প্রতিবিম্ব দেখা সম্ভব। তাই মনের দর্পণের মাঝে কোন সংকীর্ণতা, কোন পঙ্কিলতার স্থান যাতে না পায় সেই ছিল আমার জীবনের লক্ষ্য; কারণ মানুষের জীবনের দুঃখ কষ্ট, অভাব-অভিযোগের পরিপূর্ণরূপ যদি আমার মনের দর্পণে ভেসে উঠে তবেই জানতে পারব সেই দুঃখের, যন্ত্রণার প্রকৃত স্বরূপ। আর সেই স্বরূপটা যদি চিনতে পারি, সত্যিই জানতে পারি তাহলে দুঃখ দূর করবার, জীবনকে পূণ্য স্বচ্ছ করে তুলবার পথটাও নিশ্চয়ই খুঁজে পাব—এই ছিল আমার সকল কর্মের মূল প্রেরণা বা আত্মশক্তি।

ধনের প্রাচূর্যে আত্মসুখী ধনপতিবা নিজের স্বার্থে নিজের ভোগ-বিলাসের তৃপ্তিতে ভুলে যায় মানুষের সংজ্ঞা। টাকার স্ফীত অঙ্ক বিহীন মানুষ বাঁচবার অধিকার বর্জিত আর যদিও বা সে অধিকার তাদের থাকে তাহলে তারা বাঁচবে শুধু ধনীর পদলেহনের জন্য, ধনীর বিলাস জীবনের উপকরণ হিসাবে তাদের একান্ত অনুগত ভৃত্যের মত—এই হচ্ছে তাদের ধারণা। সততা, নিষ্ঠা, পবিত্রতার কোন দাম নেই তাদের কাছে। যারা গরীব তারা ঘৃণ্য, তারা সমাজের দুর্গন্ধময় আবর্জনা—

এই চিন্তায় তারা মানুষকে করে অবজ্ঞা, অপমান। তাদের সে উদ্ধত ধারণার প্রতিরোধে নিজেকে দৃঢ় করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আজ বুঝছি আমি বিফল হয়েছি, আমার ব্রত ভঙ্গ হয়েছে। হাল যদি ভাঙ্গা হয়, শস্য বপনের বীজেই যদি ধরে থাকে ঘুণ, দপর্ণের মাঝেই যদি থেকে থাকে কালো দাগ তাহলে চষা যায় না মাঠ, ফসল ফলে না পুষ্ট হয়ে আর বিম্বও হয়না পরিপূর্ণ। আমার সারা জীবনের সাধনা ব্যথ, জীবনের সব অঙ্কগুলো ভুল।

আমি কৃতি ছাত্র হিসাবে গর্ব করতে পারি, পেতে পারি সাধারণের শ্রদ্ধা. কিন্তু পাব কি সকলের ভালবাসা ? না, ভালবাসা পেতে হলে আগে নিজে অপরকে ভালবাসতে হয়। ভালবাসার স্থান অন্তরের মধ্যে। সেই ভালবাসার কাঙ্গাল ছিলাম আমি। কিন্তু তাও পেলাম না, সেখানেও হার স্বীকার করতে হল। বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা ছাত্র জীবনের পাঠে পাশ নম্বরও পেল না।

আমি সার্থক বা ন্যায়পরায়ণ বিচারক হতে পারি, কিন্তু পারিনি স্নেহময় ভাই হতে। অন্যায়ের বিচার করতে বসে আইনের কঠোর ধারা প্রয়োগ করতে বিন্দুমাত্র ভয় পাইনি, কিন্তু ভাইয়ের স্নেহধারায় ভগিনীকে সিঞ্চিত করতে আমি অক্ষমতার পরিচয় দিয়েছি। আইনের বেদিতলে শোষিত জনগণের স্বার্থে আমি কঠোর মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে গর্ব অনুভব করতে পারি কিন্তু স্নেহের বিচারে আমি অপরাধী।

মন আর বিবেকের দ্বন্দ্বে অ মি জর্জরিত। বিবেকের নিয়ত কশাঘাত আমার সহ্যশক্তি অতিক্রম করেছে। যে সত্যের পূজারী হবার অদম্য ইচ্ছায় নিজেকে প্রস্তুত করেছি সেই সত্যভঙ্গের দৃষ্টান্তে আমি অবিশ্বাসী। সত্যরক্ষায় আমি সফল হলেও সেই সত্যের শাসন আমি লঙ্ঘন করেছি। তা না হলে আমি য' করেছি তা যথার্থ হলেও কেন আজ আমার এই সংশয়, এই আত্ম-ধিক্কার ? যথার্থ বলছি কেন জান ? আইনের যথার্থ বিচারে আমি দোষীকে উপযুক্ত শাস্তি দিয়েছি বলে, তার প্রাপ্য দণ্ড সে পেয়েছে বলে। কিন্তু প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ—এ কেমন বিচার কেমন আইন ? তাই আইনের প্রতি আজ আমার

সংশয়, আমার দ্বিধা। বিশ্বাস হারিয়েছি আইনের যথার্থতায়। সে হিসাবেও আমি অপরাধী, আমি ভ্রষ্ট।

কৈশোর জীবনের সাথী হিসাবে, প্রেরণাদাত্রী হিসাবে কল্পনার স্থান আমার জীবনে অনেক উঁচুতে। সেই স্নেহময়ী ভগিনীর জীবন আমার দম্ভে ব্যর্থ। আমি তার স্বামী, তার সন্তান, তার সংসার সব ধ্বংস করে দেখিয়েছি নিজের শক্তি। তাই কল্পনা যদি আমাকে অপরাধী করে, যদি আমাকে ক্ষমা করতে না পারে তা হলে কেমন করে তাকে দোষ দেব? সে পারে না, পারবে না, আমাকে ক্ষমা করতে—তা সম্ভব নয় কোনমতেই। কিন্তু এ যে আমার পক্ষে কত বড় লজ্জা, কল্পনার ঘৃণা যে আমার কতবড় শাস্তি তা হয়ত তুমি বুঝবে। তাই সে ঘৃণা সহ্য করতে না পেরে আমি বিদায় নিচ্ছি তোমাদের কাছ হতে। কল্পনাকে বলে দিও আমি স্বেচ্ছায় মুক্তি নিলাম, আমার অপরাধের শাস্তি আমি নিজের হাতে নিলাম। আমার মৃত্যুর জন্য সে যেন দুঃখ না করে।

কৃষ্ণা, বিদায় নিচ্ছি তোমার কাছে। আমাকে মনে রেখে অকারণ দুঃখভোগ করতে যেও না—ভুলে যেও, মুছে দিও আমার নাম তোমাদের স্মৃতির পাতা থেকে। শুধু একটা অনুরোধ তোমাকে করে যাচ্ছি, আমার বাবাকে তুমি একটু দেখো—দেখো যেন এ আঘাত তাঁকে বেশী না লাগে। তাঁকে বোলো—আমার এই স্বেচ্ছামৃত্যুর জন্য দায়ী আমার নিজেরই কর্মফল। ইতি—সুখেন

চিঠিটা পড়ে আছড়ে পড়লো কৃষ্ণা সুখেনের বুকের উপর। বার বার শুধু বলতে লাগল—এ তুমি কি করলে? তোমাকে যে আমি ডাকতে এসেছিলাম, শোনাতে এসেছিলাম কল্পনাদির ক্ষমার কথা? কেন, কেন তুমি আর একটু অপেক্ষা করলে না? কেন আমাকে প্রতীক্ষা করতে হবে আগামী সূর্যের আশায়?